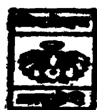


PATHIKRIT RAMENDRASUNDAR *Rs. 6·00* Dr. Buddhadev Bhattacharjee

Vidyodaya Library Private Limited

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য



বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

মে ১৯৬৬

প্রচ্ছদ

বিভূতি সেনগুপ্ত

মূল্য

আট টাকা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আলোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ॥

উৎসর্গ

অগ্রজ শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

ও

দিদিমণি শ্রীমতী বাণী ভট্টাচার্য

শ্রীচরণেষু

নিবেদন

বাংলার সাহিত্য-ভুবনের এক জ্যোতির্ময় নক্ষত্র আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বহু-বিচিত্র মননশীল রচনায় মাতৃভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। অথচ বিস্ময়ের কথা, এই মনস্বী সাহিত্য-সাধকের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা-গ্রন্থ আজও অবধি প্রকাশিত হয় নি। আচার্য ত্রিবেদীর কয়েকটি জীবন-চরিত প্রকাশিত হয়েছে বটে, তাঁর সাহিত্য-সাধনারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে কোনো কোনো গ্রন্থে। কিন্তু জীবন ও সাহিত্য—এই উভয় দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ আজও অবধি লেখা হয় নি। এই অভাব দূর করবার উদ্দেশ্যেই 'পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর' রচনায় হাত দিয়েছি। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবন ও সাহিত্যের একটি সর্বাত্মক পরিচয় উপস্থাপিত করাই এই গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য।

আলোচনার সুবিধের জন্য সমগ্র গ্রন্থটিকে দু'টো পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। 'সাহিত্য-কথা' পর্বে আলোচিত হয়েছে আচার্য ত্রিবেদীর সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক। আর 'জীবন-কাহিনী' পর্বের আলোচ্য বিষয় হল রামেন্দ্রসুন্দরের ঘটনাবহুল জীবন। রামেন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অভাব আছে, এই কথা চিন্তা করে 'সাহিত্য-কথা'র ওপরেই এখানে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আচার্য ত্রিবেদীর সাহিত্য-চিন্তার বিভিন্ন দিক—বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, স্বদেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান—এই সব কিছু নিয়েই যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রামেন্দ্র-সুন্দরের সাহিত্য-সাধনার বিশিষ্টতার কথা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত। পরবর্তী অধ্যায় 'রামেন্দ্র-সাহিত্য-পাঠের ভূমিকা' হল 'সাহিত্য-কথা' পর্যায়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের সার-সংকলন। আচার্য ত্রিবেদীর সাহিত্য-চর্চা সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাঁরা একটি সংহত ও সামগ্রিক পরিচয় পেতে চান, এই অধ্যায়টি তাঁদের কাজে লাগবে। 'সাহিত্য-কথা' পর্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে রামেন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 'জীবন-কাহিনী' পর্বে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম ও বংশ-পরিচয় থেকে সুরু করে তাঁর শৈশব, ছাত্রজীবন, কর্মজীবন ও চরিত্র—এই সব কিছুর ওপরেই সাধ্যমত আলোকপাত করা হয়েছে। তবে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্রসুন্দরের স্বরূপ-বিশ্লেষণে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক-নির্ণয়ে। 'নির্দেশিকা'টি এমনভাবে পরিকল্পিত যা'তে করে রামেন্দ্রসুন্দরের রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধের হদিস তা' থেকে মেলে। দু'তিনটি রচনা ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধকে এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থ-রচনায় আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সাহিত্য সাধক ডঃ সুশীল রায়,

অধ্যাপক ডঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী এবং কবিবন্ধু শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর দুই সাহিত্যানুরাগী পরিচালক শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠিত বিদ্যোৎসাহ ও অসাধারণ কর্মনিষ্ঠার কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এঁদের সহযোগিতা না পেলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা কোনোমতেই সম্ভবপর হ'ত না।

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দরের নির্দেশিকা-রচনায় সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য। তাঁর সহযোগিতা না পেলে এই গ্রন্থের প্রুফ্-সংশোধনে অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে যেত।

২৮. ৪. ৬৬

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

সাহিত্য-কথা

প্রথম অধ্যায়

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর

কাব্যে যেমন মধুসূদন, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, কবিতা ও গানে যেমন রবীন্দ্রনাথ, বাংলার মননশীল প্রবন্ধ-সাহিত্যে তেমনি রামেন্দ্রসুন্দর নূতন পথের দিশারী। রামেন্দ্রসুন্দর গতানুগতিক প্রবন্ধ লেখেন নি; চটকদার, সস্তা রম্য-আলোচনায় পাঠকদের মন ভোলাবার চেষ্টা করেন নি। যখন যা করেছেন, অন্তরের তাগিদেই করেছেন; যখন যা লিখেছেন, আদর্শের খাতিরেই লিখেছেন; যখন যা ভেবেছেন, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণের দিকে তাকিয়েই ভেবেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের কর্মসাধনা তাই আন্তরিকতায় প্রোজ্জ্বল, সাহিত্য-কর্ম আদর্শ-নিষ্ঠায় ভাস্বর, ভাবনাদর্শ দেশপ্রেমে দেদীপ্যমান। সাহিত্য-চর্চায় নেমে রামেন্দ্রসুন্দর ধরা-বাঁধা পথে গেলেন না। উচ্চাঙ্গের মননশীল সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হলেন। বিজ্ঞানের সুচিন্তিত আলোচনা এবং ধর্ম ও দর্শনের চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ-রচনাই তাঁর জীবনের ব্রত হল।

বিজ্ঞান নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের আগেও অনেকে লিখেছেন। ধর্ম ও দর্শন নিয়েও বলেছেন অনেকে অনেক কিছু। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিনবত্ব তবে কোথায়? অভিনবত্ব তাঁর ভাষায়, প্রকাশরীতিতে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে—সর্বত্রই। দুরূহ ও জটিল বিষয়কে প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যে বিপুল ক্ষমতা আছে, তা রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম প্রমাণ করলেন। তাঁর ভাষা বলিষ্ঠ, অথচ কঠিন নয়; তাঁর শব্দচয়নে দৃঢ়তা অসাধারণ, অথচ দুর্বোধ্য শব্দ তিনি নির্বাচন করেন নি। বরং দুরূহ ভাবের প্রকাশ করতে গিয়ে সহজ অথচ শক্তিশালী শব্দের সাহায্যই তিনি নিয়েছেন। প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। দর্শন-শাস্ত্রের জটিল সূত্র নিয়ে আলোচনার কালেও তাঁর রচনার প্রসাদগুণ কোথাও নষ্ট হয় নি। জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়ও সাহিত্যিক মেজাজ তাঁর অটুট ছিল। ধর্ম ও দর্শনের সুদুর্গম প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা-ভঙ্গীর সরসতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। কি তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনায়, কি দার্শনিক প্রবন্ধে, সর্বত্রই রসের এক আনন্দধারা প্রবহমান। তাঁর রচনা সর্বত্রই এক দুর্লভ সাহিত্য-গৌরবে অভিষিক্ত। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্ব না থাকলে মননশীল সাহিত্য-সংসারে এরূপ অক্ষয় গৌরব লাভ করা সম্ভব নয়। রামেন্দ্রসুন্দর নূতন বিষয় নিয়ে লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যে অনালোচিত বিষয়কে আলোচনার জন্যে বেছে নিয়েছেন। তিনি উত্তাপ নিয়ে লেখেন নি, 'উত্তাপের অপচয়' কেন হয়, তা নিয়ে লিখেছেন, বিজ্ঞানসূত্রের গতানুগতিক ব্যাখ্যা করেন নি, বিজ্ঞানের গলদ কোথায়, তা

নিয়ে আলোচনা করেছেন, ডারউইন বা লামার্কের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেন নি; মহত্তর জীবনসত্য ও বৃহত্তর জগৎরহস্যের সন্ধানে বেরিয়ে আপন বক্তব্যকে প্রকাশের ক্ষেত্রে ঐ সব বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছেন মাত্র। বাংলা সাহিত্যজগতে রামেন্দ্রসুন্দর তাই নূতন পথের পথিক। মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চার তিনি পথিকৃৎ।

অন্য কারণেও তিনি পথিকৃৎ। বিজ্ঞানের রচনা যে শুধুমাত্র তথ্যের মিছিল নয়, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেও যে হাস্যরসের স্থান আছে, রামেন্দ্রসুন্দরই তা প্রথম প্রমাণ করলেন। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় হাস্যরসের স্থান নেই বললেই চলে। মনে হয়, সকলেই যেন বিজ্ঞানকে কতকগুলো তত্ত্ব ও তথ্যের আকর হিসেবে দেখেছেন। ফলে, তাঁদের রচনায় বিজ্ঞানবিদ্যার জগৎটা জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যে বিজ্ঞান জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জীবনের বিচিত্র রূপ-রস, বর্ণ-গন্ধ, সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতির সঙ্গে বিজ্ঞানবিদ্যার সেখানে নিগূঢ় যোগ। বিজ্ঞান সেখানে একটি উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রের মতো জীবন্ত। দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ, ক্ষমতা-অক্ষমতা নিয়ে বিজ্ঞানবিদ্যা সেখানে হাজির। তাই রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে আমরা আত্মীয়তা অনুভব করি। তত্ত্বের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছি, এ কথা মনে করে গম্ভীর হই না। আমাদেরই অতি কাছের অথচ একেবারে অপরিচিত এক নতুন জগতে পরিভ্রমণ করছি, একথা স্মরণ করে বরং আনন্দিত হই। ভাষার স্নিগ্ধতা যদি না থাকত, হাস্যরস যদি জায়গায় জায়গায় বিজ্ঞানবিদ্যার জগৎকে মাধুর্যময় না করত, তবে এ আনন্দের অংশীদার আমরা হতাম না।

এ ছাড়া আমাদের সাহিত্য আরও নানা কারণে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে ঋণী। তিনি স্বল্প-পরিসরে অনেক কথা বলেছেন। অনেক বিষয় জেনে, বুঝে, জারিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিজস্ব চিন্তার আলোতে বিচার করেছেন। এমন বিচার বাংলা সাহিত্যে আর কেউ করেন নি। সবাই বিজ্ঞানবিদ্যার গৌরবটুকুই বর্ণনা করেছেন। বিজ্ঞানের দোষ-ত্রুটি ও গলদ নিয়ে মাথা ঘামান নি কেউ। 'জ্ঞানের সীমানা'য় দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান-বিদ্যার সত্যি-মিথ্যে যাচাই করেন নি আর কোনো লেখক। বিজ্ঞানকে আসামীর কাঠ-গড়ায় টেনে আনতে আর কেউ সাহস করেন নি। রামেন্দ্রসুন্দর তাই দুঃসাহসীও বটে।

কিন্তু মনে যেন রাখি, এই দুঃসাহস অসারের তর্জন-গর্জন নয়। দুর্বলের বৃথা আস্ফালনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল বলেই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিলেন। তাই 'প্রকৃতি' (১৮৯৬)-পর্বের বিজ্ঞান-ভিক্ষু রামেন্দ্রসুন্দর 'জিজ্ঞাসা'য় (১৯০৪) বিজ্ঞান-দর্শনের কুয়াসাচ্ছন্ন রহস্যময় পথে যাত্রা করেছিলেন এবং 'বিচিত্র জগৎ'এ (১৯২০) অভিসারে বেরিয়েছিলেন,—জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে। এমন বিশ্বযাত্রী সাহিত্য-সংসারে বিরল। বিজ্ঞানের রাজপথে দর্শনকে পাথেয় করে এমন অভিসারও বড় একটা দেখা যায় না। বিজ্ঞান যে কতকগুলো মনগড়া পদার্থ নিয়ে কাজকারবার করছে, আসলে ওদের যে কোনো অস্তিত্ব নেই, রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা 'বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা' ও 'মায়াপুরী' পড়বার আগে বাঙ্গালী পাঠকরা তা জানত না। 'বৈজ্ঞানিকের

জগৎ' সে এক কৃত্রিম ও মন-গড়া জগৎ, বাস্তবে সে জগৎকে যে কোনোদিন কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, বাংলা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম সে কথা বললেন। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও যশস্বী অধ্যাপক না হলে, এবং বিজ্ঞান-বিদ্যায় সত্যিকারের পাণ্ডিত্য না থাকলে এমন রচনা সম্ভব নয়। আবার শুধুমাত্র বিজ্ঞানবুদ্ধি থাকলেও এমন রচনা লেখা যায় না। বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের মণিকাঞ্চন যোগ না ঘটলে, বিজ্ঞানকে এমন করে দর্শন করা যায় না ; দর্শনের এমন বৈজ্ঞানিক বিচার করা যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর যে বিজ্ঞানবিদ্যাকে দর্শন করেছিলেন, তার মূলে ছিল তাঁর গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি।

এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলেই বাংলার দর্শন-সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায়ও রামেন্দ্রসুন্দর নূতন পথনির্দেশে সক্ষম হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ ও সংস্কারবিমুক্ত দৃষ্টির সাহায্যেই তিনি আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের ধর্ম-উপাসনা ও দর্শনচিন্তার অপক্ষপাত আলোচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। 'কর্ম-কথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪) ও 'যজ্ঞ-কথা'য় (১৯২০) ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার, রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র সাহিত্য-সাধনা মাতৃ-ভাষাপ্রীতি ও দেশপ্রেম থেকে উৎসারিত। তাই দেখি, রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা 'চরিত-কথা'য় (১৯১৩) আছে দেশের বরেণ্য মনীষীদের প্রসঙ্গ, 'নানা কথা'য় (১৯২৪) আছে স্বদেশের বহু বিচিত্র সমস্যা ও তাদের সমাধানের পন্থা, আর 'শব্দ-কথা'য় (১৯১৭) স্থান পেয়েছে বাংলা ব্যাকরণ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ।

বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়েও এমন গভীর ও সুচিন্তিত আলোচনা বাংলা সাহিত্যে আর কেউ করেন নি। বাংলায় বিজ্ঞানের স্থায়ী পরিভাষা গড়ার স্বপ্ন এমন করে দেখেন নি আর কেউ। রামেন্দ্রসুন্দর শুধু বিজ্ঞানের সাহিত্য রচনা করেন নি ; সে সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী ভাষাও গড়তে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তবু বলব, রামেন্দ্রসুন্দরের শ্রেষ্ঠত্বের আসল পরিচয় এখানে মিলবে না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট এটিচিউড্-এর (attitude) মধ্যেই মিলবে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয়। কোথায় দাঁড়িয়ে কিভাবে দেখলে, দেখবার সুবিধা হয়, কিভাবে বললে বোঝান সহজ হয়, সে সম্বন্ধে আশ্চর্য এক বিশিষ্টতা ছিল তাঁর।

বাংলার জ্ঞানাত্মক সাহিত্যজগতে এমন বিশিষ্ট সাহিত্যসাধক খুব অল্পই আছেন। উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় মাতৃভাষাকে উন্নত করবার মানসে এই পথিকৃতের চলা পথের দিকে তাকাতে অনুরোধ করি বাংলার বিজ্ঞানরসিক ও সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণকে ; এবং সেই সঙ্গে বলে রাখি, উচ্চাঙ্গের জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষাকে যদি ব্যবহার করতে পারি, প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও কর্মাদর্শের প্রতি দেশবাসীর হারান শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, কর্মে ও কথায় আমরা যদি সত্যিকারের ভারতীয় হতে পারি, তবেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রতি সত্যিকারের সম্মান দেখান হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামেন্দ্র-সাহিত্য-পাঠের ভূমিকা

বাংলার মননশীল সাহিত্য-জগতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। একদিকে বিজ্ঞান ও দর্শন এবং অপরদিকে বেদপন্থীর ধর্ম-কর্ম ও আচার-আচরণ, স্বদেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য, মনস্বিদের চরিত-কথা ও ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে সুচিন্তিত ও মনোরম আলোচনা করে তিনি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের দিগন্তকে অনেক দূর অবধি সম্প্রসারিত করে গেছেন। তবে বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার মধ্যেই রামেন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্টতার পরিচয় সবচেয়ে বেশি। এই কথা স্মরণে রেখে রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা করা যেতে পারে।

১

বিজ্ঞানের রাজদরবারে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ওই রাজ্যের সিংহদ্বারে অনুক্ষণ নোটিশ ঝুলছে—ট্রেস্‌পাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড্‌। ওখানে অনধিকার প্রবেশ করলে শাস্তি পেতে হবে। প্রবেশের যোগ্যতাটা তবে কি? দক্ষিণা, উপযুক্ত সেলামী। গণিত ও ফরমূলা, টেক্‌নিক্যাল বুদ্ধি ও সাঙ্কেতিক বোধের উপযুক্ত সেলামী দিয়ে তবে ওখানে যেতে হয়, তবে সিংহদ্বারের প্রহরীর কাছ থেকে রাজদরবারে প্রবেশের অনুমতি মেলে। কিন্তু সেলামী দেবার ক্ষমতা নেই যাদের, টেক্‌নিক্যাল বুদ্ধি ও গণিত-জ্ঞান যাদের ভোঁতা, অথচ যাদের বিজ্ঞান-জগতের খবর নেবার ষোল আনা কৌতূহল আছে, তাদের দশা তাহলে কি হবে? বিজ্ঞান-মহলের ভাগ্যবানেরা বাইরে এলে চেয়ে-চিন্তে খবর নেওয়া ছাড়া তাদের বুঝি আর উপায় নেই! কিন্তু যদি কোন বিজ্ঞানসেবী না চাইতেই বিজ্ঞান-জগতের খবরগুলি সহজ ও সরল করে তাদের কাছে তুলে ধরেন, তবে আর ভাবনা থাকে না। তবে সেলামী-সংগ্রহের পরিশ্রমটুকু বেঁচে যায়, আবার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলও হয় চরিতার্থ। কিন্তু অভাজনদের কাছে কে পৌঁছে দেবেন সেই খবর? বিজ্ঞানের রাজদরবারে ঢুকে গুপ্তচরের কাজ করবেন কে? করবেন শুধু তিনিই, যাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি ও সাহিত্যিক-বোধের সমন্বয় ঘটেছে। এক দিকে বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং অপর দিকে সাহিত্যিক ভাবনা আছে যাঁর। এই হিসাবে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গুপ্তচর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিজ্ঞানরাজ্যের আশ্চর্য সব খবর সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। বিজ্ঞান-মহলে ঢোকবার ছাড়পত্র পায় নি যারা, তাদের কাছেও তিনি জগতের অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন।

তথ্য-পরিবেশনের ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। কখনও সাহিত্যিক সেজে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রস উপভোগ করছেন তিনি, কখনও আবার দার্শনিকের আসনে বসে বিজ্ঞানের বিচার করছেন—বিজ্ঞানবিদ্যার গলদ ও দোষত্রুটি অনুসন্ধান করছেন। আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে এমন করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে আর কেউ সাহস করেন নি বোধ হয়। দোষগুণ ও ক্ষমতা-অক্ষমতার এমন জবানবন্দী বিজ্ঞানের কাছ থেকে আর কেউ আদায় করতে পারেন নি। রামেন্দ্রসুন্দর যে পেরেছেন, তার মূলে তিনটি কারণ—সাহিত্যিকের হৃদয় ছিল তাঁর, দার্শনিকের মস্তিষ্ক ছিল, আর ছিল বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি।

তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বিশ্লেষণ করি আগে। তবে আগেই বলে রাখি, রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানী নন। পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা নতুন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেন নি তিনি। যা আবিষ্কৃত সত্য, তা নিয়েই তার সব কিছু লেখালেখি, যা কিছু বিচার-বিবেচনা। বিচার-বিবেচনার কোনোটাই আবার বৈজ্ঞানিকের লেবরেটরী-ঘেঁষা নয়। রামেন্দ্রসুন্দরের লেবরেটরী অন্য জাতের। সেখানে দর্শনবিদ্যার কয়েকটা কষ্টি-পাথর ছড়ানো আছে শুধু। ঐ পাথরগুলিতে ঘষে ঘষে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক সত্যের পরীক্ষা করছেন এবং পরীক্ষার যে ডেটা (data) নোট করছেন, তাতে বৈজ্ঞানিক টেক্‌নিক্যালিটির নামগন্ধও নেই—তা একেবারে খাঁটি সাহিত্য। সে নোট বইয়ের উপরে স্ট্যাম্প আছে বটে বিজ্ঞানের, কিন্তু ভিতরে যা আছে, তার আগাগোড়া সাহিত্য-জগতের একচেটিয়া সম্পদ। তা হলো বিজ্ঞানের সাহিত্য। তা পড়ে বিজ্ঞান শেখা যায় না, দেখা যায়। কারণ, রামেন্দ্রসুন্দর তো বিজ্ঞান শেখাতে চান নি, দেখাতে চেয়েছেন। নিজে বিজ্ঞান-দর্শন করেছেন এবং অপরকেও করিয়েছেন। সে দর্শন কেমন? না, সাহিত্যিকের যেমন জীবনদর্শন ঠিক তেমন। সাহিত্যিক যেমন জীবন থেকে রস সংগ্রহ করেন, রামেন্দ্রসুন্দর তেমনি রস আহরণ করেছেন বিজ্ঞান থেকে। রামেন্দ্র-সাহিত্যে বিজ্ঞান একটা সজীব পদার্থ। বিজ্ঞান সেখানে নড়ছে-চড়ছে, রসের যোগান দিচ্ছে, জগতের সুখ-দুঃখ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ফিরিস্তি দিচ্ছে। এমন জীবন-ঘেঁষা বিজ্ঞানদর্শন, এমন প্রাণস্পর্শী বিজ্ঞান-অভিব্যক্তি বাংলা সাহিত্যে আর কারও রচনায় নেই।

বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে লিখেছেন অনেকেই। কিন্তু ভেবেছেন ক-জন? ক-জনের লেখায় বিজ্ঞান-ভাবনার পরিচয় আছে? কেরী-মার্শম্যানের আমলে বিজ্ঞান নিয়ে ইউরোপীয়েরা লিখেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান তো সেখানে একটা নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ। তার না আছে কোনো রস, না আছে কোনো প্রাণ। ওই জিনিস পড়ে জ্ঞানের ক্ষুধা মেটে না, আবার প্রাণের তৃষ্ণাও জুড়ায় না। তাছাড়া আজকের দিনে ওগুলি ইতিহাসের কয়েকটা ভাঙ্গা মাইল-স্টোন ছাড়া কিছু নয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও তাঁর সময়কার বিজ্ঞান-লেখকদের রচনার দশাও প্রায়ই একই রকম। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের শৈশব যুগের কয়েকটা পোকায় কাটা ফটোগ্রাফ ছাড়া সে রচনাগুলির আজ আর কোনো পরিচয় নেই। ওদের দেখিয়ে রস ও রুচির দেশে

আজ আর পাসপোর্ট মিলবে না। কারণ, বয়স হলে যেমন চেহারা পাল্টায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের চেহারাও তেমনি পাল্টে গেছে। তবে শুধু বাংলা বলি কেন, আর শুধুমাত্র কেরী-মার্শম্যান বা অক্ষয়কুমারকেই দায়ী করি কেন, সকল ভাষার প্রায় সকল বিজ্ঞান-সাহিত্যেরই বুঝি এই দশা হয়। কারণ, সময় যেমন এগোয়, বিজ্ঞানও তেমনি এগিয়ে চলে। নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়। সে যুগে যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল, প্রায়ই দেখা যায়, এযুগে তা অচল। তাকে আজ সচল করতে হলে, আজকের দিনের বিজ্ঞানের কথা থাকতে হবে ওর মধ্যে। পুরনো দিনের মালমশলা কাটছাট করে নতুন যুগের রসদ ঢোকাতে হবে। অর্থাৎ সেকালের বিষয়বস্তু একালে অচল বলে আবার নতুন করে লিখতে হবে প্রবন্ধ। তাই অনেককেই বলতে শুনি, বিজ্ঞানের সাহিত্যে চিরন্তনত্বের লেবেল আঁটা যায় না। বিজ্ঞান নিয়ে চিরকালের সাহিত্য রচনা অসম্ভব।

এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বিজ্ঞান নিয়ে তিনি যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তা চিরকালের। রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি' বা 'জিজ্ঞাসা'র বিষয়বস্তু পূর্বে চলতো, এখন অচল, অথবা এখন চলছে, পরে চলবে না, এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। তাঁর 'বিচিত্র-জগৎ'-কেও নিশ্চয়ই কেউ সাময়িক সাহিত্যের আবর্জনায় ফেলতে সাহস করবেন না। তার কারণ, 'প্রকৃতি'তে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের দোদুল্যমান রহস্য-যবনিকার সামনে দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধ রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান-জগতের কয়েকটা টুকরা খবর সরবরাহ করেন নি শুধু, প্রকৃতির রহস্য-যবনিকা উন্মোচন-মানসে বিজ্ঞানীদের সামগ্রিক সাধনার চিত্রই তিনি ওখানে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির অজ্ঞানান্ধকার কেমন করে ক্রমে ক্রমে কেটে যাচ্ছে, কেমন করে বিশ্ব-রহস্য ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে এবং কোথায় বিশ্বজগৎ চিরকালের মত অধরা থেকে যাচ্ছে, তারই একটা পরিপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরবার প্রচেষ্টা আছে ওখানে। বিশেষ একটা দৃষ্টিকোণ থেকে একসঙ্গে সমগ্র বৈজ্ঞানিক-সাধনার স্বরূপ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের এমন প্রয়াস রামেন্দ্র-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে আর হয় নি। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া পূর্বেকার লেখকদের প্রায় সকলেই বিজ্ঞানকে টুকরো করে দেখেছেন, বিজ্ঞানের খণ্ডাংশ নিয়ে পরিতুষ্ট থেকেছেন প্রায় সবাই। বিজ্ঞান-সাধনার অখণ্ড অবয়বটিকে কেউ দেখেন নি। কেউই বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে জগৎ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ এমন করে দেখান নি। 'বিজ্ঞানরহস্যে' বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছিলেন, জগদীশ-চন্দ্রের 'অব্যক্তে'ও হয়তো সে প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু দর্শনের সোনার কাঠির স্পর্শে রামেন্দ্র-সাহিত্য জগতে বিজ্ঞান-রাজপুরুষের সঙ্গে সাহিত্য-রাজকন্যার যে পরিণয় ঘটেছে, ঠিক তেমনটি আর কোথাও ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয়ে ঘটতে পারতো, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মত বিজ্ঞানবিদ্যার রাজদরবারে যেতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ; সিংহদ্বার থেকে বিজ্ঞানবিদ্যার জলসা শুনেছেন। তাই বিশ্বপরিচয়ে বিজ্ঞানকে দেখি বাইরে থেকে। আর রামেন্দ্র-সাহিত্য আমাদের নিয়ে যায় বিজ্ঞানের অন্দর-মহলে। ওখানে বিজ্ঞানকে ভিতর থেকে দেখি আমরা; বিজ্ঞান-রাজপুরীর সিংহদ্বারে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সাধনার সেলামী না দিয়েই রাজদরবারে ঢুকে পড়ি। 'জিজ্ঞাসার' রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে সুর

মিলিয়ে প্রশ্ন করি, বর্ণবৈচিত্র্য কেন হয়, মাধ্যাকর্ষণ হয় কেন? কেনই বা জগৎ জুড়ে উত্তাপের অপচয় ঘটছে? জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হয়। উত্তর মেলে না বিজ্ঞানের কাছ থেকে। তখন সবকিছুই কেমন যেন খাপছাড়া, উদ্দেশ্যহীন ঠেকে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবনায় ভাবি, সবই বুঝি ফাঁকি! জড়জগতের অস্তিত্বই বুঝি কল্পনা! বুঝি এক প্রকাণ্ড 'মায়াপুরী'তে ভিত্তিহীন কতকগুলি ধারণাকে নিয়ে বেঁচে আছি আমরা। তবে তো বিজ্ঞানবিদ্যার কারবার কতকগুলি কাল্পনিক বস্তু নিয়ে! বিজ্ঞানবিদ্যার তবে তো গোড়ায় গলদ! 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' চলছে তবে। এই 'বিচিত্র জগৎ'টা তবে কি? জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে অভিসার হয়তো। হয়তো আরও কোনো চরম উদ্দেশ্য আছে এর পিছনে। সে উদ্দেশ্য যে কি, হয়তো তারও কিছু পরিচয় রামেন্দ্রসুন্দরের কাছ থেকে পেতাম আমরা। কিন্তু 'বিচিত্র-জগৎ'-এর পরিচয় সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দর চিরান্ধকার কোন্ এক বিচিত্রতর অদৃশ্য জগতে মহাপ্রস্থান করলেন। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যকে ঐশ্বর্যের রাজবেশ পরিয়ে দিয়ে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির দূরদূরান্তরে কোন্ এক চিরজিজ্ঞাসার নাম-না-জানা দেশে চলে গেলেন!

২

রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানের আলোকোদ্ভাসিত রাজপথ ধরে। কিন্তু খানিকদূর এগিয়েই দেখলেন, রাজপথের হদিস মিলছে না আর। বিজ্ঞানবিদ্যার পথ ধরে আর এগোন চলছে না। জগৎরহস্যের অন্দর-মহলে পৌঁছুবার আশায় তাই এবার তিনি অন্য পথ ধরলেন। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে মেলালেন দার্শনিক বোধকে। যাত্রা করলেন অজানা বিশ্বরহস্যের অন্ধকারময় বন্ধুর পথে। এ যাত্রাই রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বযাত্রা। এ পথ ধরে এগোলেন বলেই তিনি জগৎপথিক। কিন্তু জগৎপথের যাত্রী হবার মুহূর্তে এক একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বেদ-ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদের ভারতবর্ষের দিকে আপন দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছেন।

৩

ফলে দর্শন ও বিজ্ঞান-সাহিত্যকেই তিনি রাজবেশ পরান নি শুধু, পরিয়েছেন বাংলা জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের আরও কয়েকটি শাখাকে। এর কারণ, এই বিজ্ঞানসেবী বিজ্ঞানকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, মানবতত্ত্ব, ইতিহাস-চর্চা এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অন্তর্গত। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' (ভারতী, বৈশাখ ১৩১২) শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন,

> বিজ্ঞান—বিজ্ঞান—আমরা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিব। যেন পদার্থবিদ্যা, আর রসায়ন-শাস্ত্র আর দেহতত্ত্ব লইয়াই বিজ্ঞান! যেন কলের গাড়ীতে, আর টিনের কানিস্তারেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ! মানবতত্ত্ব যেন বিজ্ঞানের পরিধির বাহিরে—ইতিহাসালোচনা যেন বিজ্ঞানের সীমার বহির্গত!
>
> বিজ্ঞান—বিশেষ জ্ঞান। যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়, তাহা বিজ্ঞানের বিষয়—আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত।

বিজ্ঞানকে এইরূপ একটা বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন বলেই ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ভাষা-তত্ত্ব—সকল প্রকার আলোচনাতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করতে পেরেছিলেন তিনি। বিচার ও চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে স্বদেশ ও সমাজের ইতিহাস ও ধ্যান-ধারণার একটি বিশ্বস্ত চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম' (১৩০৪) নামক গ্রন্থটির মুখবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের মন্তব্য,

> জ্ঞানের আহরণে লাভ আছে, কিন্তু জ্ঞানাহরণের প্রকৃষ্ট পন্থা দেখাইতে পারিলে ও সেই পন্থায় চলিতে পারিলে আরও লাভ। জ্ঞান আহরণ অনেকেই করিতে পারেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সকলে চলিতে পারেন না; আপনার সমগ্র চিন্তাপ্রণালীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহিত সঙ্গত করিয়া তোলা সকলের সাধ্য নহে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রন্থকারের আয়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থমধ্যেও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্রকায় একটি গ্রন্থের বিশিষ্টতা বোঝাতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে মন্তব্য করেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের বিরাট ও বিপুল মননশীল সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে আমরা সেই মন্তব্য করতে পারি; বলতে পারি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রন্থকারের আয়ত্ত ছিল। আয়ত্ত যে ছিল, সে পরিচয় আমরা বহু-বিচিত্র মননশীল রামেন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্রই পাই। রামেন্দ্রসুন্দর বেদ-ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করেছেন যেখানে, যেখানে প্রাচীন ভারতের মহত্তর কল্যাণ-ধর্ম ও সত্য-শান্তিকে বর্ণনা করেছেন, বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালীর পরিচয় সেখানেও পাই। আর পাই মহত্তর সত্য-সাধনা ও কল্যাণ-ধর্মের ভাষ্য। বিজ্ঞানের বেলায় যেমন, বেদপন্থীদের ক্রিয়া-কর্ম ও যাগ-যজ্ঞ নিয়ে আলোচনাতেও তেমনি সত্য ও সুন্দরের ভাষ্য রচনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

তবে সাপেক্ষ বা খণ্ডিত সত্য নয়, নিরপেক্ষ ও অখণ্ড সত্যকেই চিরদিন খুঁজে বেরিয়েছেন তিনি। এই অখণ্ড সত্যের সন্ধান বিজ্ঞানবিদ্যার মধ্যে তিনি পান নি। বিজ্ঞানের চরম ক্ষমতা সম্বন্ধে বরাবরই তাঁর মনে একটা সংশয় ছিল। তবে সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বে এ সংশয়কে তিনি বারবার অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছেন। জগৎ-রহস্যের উত্তর খুঁজেছেন দর্শনশাস্ত্রের কাছে। কিন্তু দর্শনের উত্তরও যে তাঁকে খুশী করতে পারে নি, তার প্রমাণ পাই 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গোড়ার দিককার রচনাগুলো পড়লে। সেখানে দেখি, দর্শন ও বিজ্ঞান উভয় বিদ্যাতেই রামেন্দ্রসুন্দরের সংশয় রয়েছে বটে; তবে এ পর্বে বিজ্ঞানই যেন তাঁকে পথ দেখাচ্ছে। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬) সম্বন্ধে। এখানে তিনি বিজ্ঞানভিক্ষু জগৎপথিক। বিজ্ঞানবিদ্যাকে সহায় করেই এখানে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতির স্বরূপ-অন্বেষণে বেরিয়েছেন। কিন্তু জগৎ-রহস্য সম্বন্ধে তাঁর অদম্য কৌতূহল বিজ্ঞানবিদ্যা চরিতার্থ করতে পারল না। পারল যে না, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাই এই গ্রন্থের 'জ্ঞানের সীমানা' নামক প্রবন্ধে। দেখি, বিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষমতা সম্বন্ধে

রামেন্দ্রসুন্দরের মনে সন্দেহ জেগেছে। এই সন্দেহ ও সংশয় থেকেই পরবর্তী গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা'র (১৯০৪) পরিকল্পনা। 'জিজ্ঞাসা'র 'মায়াপুরী' ও 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজায়' বিজ্ঞানবিদ্যার অক্ষমতার কথা প্রকটভাবে চিত্রিত। এইভাবে একদিকে বিজ্ঞানবিদ্যার অসম্পূর্ণতা এবং অপরদিকে স্বদেশপ্রেম রামেন্দ্রসুন্দরকে বেদ-চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে।

বিজ্ঞানবিদ্যার অসম্পূর্ণতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। স্বদেশপ্রেমের কথা বলা যাক এবার। শৈশবকাল থেকেই দেশকে ভালবাসতেন রামেন্দ্রসুন্দর। স্বদেশের ধ্যান-ধারণাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। স্বজাতিপ্রীতির বশেই ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত নিয়ে 'পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা' (১৩০৭) লিখেছিলেন তিনি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৩১২)। অতএব দেখি, ঠিক একই যুগে রামেন্দ্রসুন্দর একদিকে যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে নিয়ে ভাবছেন, অপরদিকে তেমনি ভাবছেন স্বদেশ ও স্বজাতিকে নিয়ে। কিন্তু তখনও এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে নি। সে পরিচয় লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগল দীঘাপতিয়া রাজবংশের শরৎকুমার রায়ের সংস্পর্শে এসে। এই প্রথম রামেন্দ্রসুন্দরের মনে হল, আমাদের দেশের প্রাচীন কথা যে আমরা জানি না, বা জানবার চেষ্টা করি না, এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আমাদের কাছে আর কিছুই হতে পারে না। তাই তখন থেকেই আমাদের জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতা ও মূল ভিত্তির পরিচয় সংগ্রহের জন্যে আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি। সে সময়েই প্রথম আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্রাদির বাংলা অনুবাদ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

শরৎকুমার রায়ের প্রচেষ্টায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের কাজ অচিরেই শুরু হল। অনুবাদের দায়িত্ব শেষ অবধি এসে পড়ল রামেন্দ্রসুন্দরের উপর। আট বছরের (১৩১০-১৩১৮) ঐকান্তিক চেষ্টায় অনুবাদের কাজ শেষ হল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনুবাদকে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশী-বিদেশী বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুকে সহজ ও সরল করে বোঝাবার জন্যে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা বিস্ময়কর। অনুবাদের বিষয়কে সুপরিস্ফুট করবার জন্যে কোথাও বা টীকার সাহায্যে দুরূহ ও সাংকেতিক প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, কোথাও মূল-গ্রন্থের সূত্র-নির্দেশ করেছেন, কোথাও আবার পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই অনুবাদ পাঠ করলে মনে হয়, যাগ-যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও সকল শ্রেণীর ঋত্বিকের কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নেই বটে, তবে এ থেকে বৈদিক যজ্ঞের বিপুল ঐশ্বর্য-আড়ম্বর ও সুমহান আদর্শ-চেতনার একটি সুস্পষ্ট আভাস পাই আমরা। বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকদেরও এ গ্রন্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। এ জন্যে অনুবাদক ও টীকাকার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কৃতিত্ব বড় কম নয়। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী অনুবাদ করেছেন তিনি। অথচ অনুবাদ কোথাও হাল্কা বা লঘু হয়ে পড়ে নি। আলোচ্য বিষয়ের গাম্ভীর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বত্রই সুনির্বাচিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্য-

যোজনা করা হয়েছে বেদ-ব্রাহ্মণের পবিত্রতা ও আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে। এক কথায় আদর্শদীপ্ত ও সংযত বাগ্‌ভঙ্গী এই অনুবাদকে এক বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তাই অসংকোচে বলা চলে, বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বিশেষ স্থান আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দেড় বছর পরে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তী গ্রন্থ 'কর্ম্ম-কথা' (১৩২০) প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি হল ১৩০১ থেকে ১৩১৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্যদেবের ১১টি প্রবন্ধের সংকলন। কর্ম-কথার প্রবন্ধগুলো পাঠ করলে হিন্দু-ধর্ম ও প্রাচ্য-দর্শনের পথযাত্রী রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারার পরিচয় মিলবে। আর মিলবে বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয়।

কর্মকে পরিহার করতে পারে না মানুষ। কর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না,—এ গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর তা' বোঝাতে চেয়েছেন। ঐহিক ও পারত্রিক স্বার্থপরতা-প্রসূত বৈরাগ্য নয়, নিষ্কাম কর্মপরতার উপরেই যে মহত্তর জীবনাদর্শের ভিত্তি, তারই ব্যাখ্যা আছে এ গ্রন্থে। সত্য ও কল্যাণদৃষ্টির আলোকে বেদপন্থী হিন্দুসমাজের জীবনবেদের বিশ্লেষণ আছে এখানে। কামনাশূন্য কর্ম ও স্বধর্মের জয়গান আছে। বেদপন্থীর আচার-অনুষ্ঠান ও যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে ধর্মের বিজয় ঘোষণা করেছেন। জীবন ও ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করে ধর্মের প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন এবং ত্যাগাত্মক ও নিষ্কাম কর্মই যে ধর্ম তা' প্রমাণ করতে গিয়ে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অকৃত্রিম দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃই 'কর্ম-কথা' রামেন্দ্র-মনীষার এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

বিস্ময়ের উপকরণ ছড়িয়ে আছে বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তী রচনা 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'ও (প্রথম পর্যায়, ভাদ্র ১৩২১)। জগৎ ও জীবন-রহস্যের যে গভীরে তিনি এখানে অনুপ্রবেশ করেছেন, ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে যে গভীর অন্ত-র্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, এ যুগের ভারতীয় মনীষার তা' এক বিশিষ্ট নিদর্শন। বেদপন্থীর সত্যনিষ্ঠ ও উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি, যুক্তি ও প্রমাণ-সহযোগে নিজস্ব প্রত্যয়কে উপস্থাপিত করেছেন মাত্র। কোনো গোঁড়ামির পরিচয় বা আপন মতবাদকে জোর করে চাপাবার কোনো প্রচেষ্টা এখানে নেই, ইতিহাস ও সমাজ-বিবর্তনের পথ ধরে ধর্মরহস্যের সমাধান-কল্পে তাঁর কয়েকটি ধারণার কথাই এখানে লিপিবদ্ধ আছে। ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে বেদপন্থীর ভুল ধারণা দূর করে, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের সম্পর্ক-নির্ণয়ের চেষ্টা আছে এখানে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় 'যজ্ঞ-কথা'য়ও (১৯২০) সুস্পষ্ট। বেদ-পন্থীর ক্রিয়া-কর্ম ও যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আচার্য ত্রিবেদীর সবচেয়ে পরিণত চিন্তার

পরিচয় এ গ্রন্থে খুঁজে পাই। বৈদিক যজ্ঞের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় রামেন্দ্রসুন্দর এখানে অসাধারণ নিষ্ঠা ও অনন্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। 'যজ্ঞ-কথা'র পাঁচটি প্রবন্ধ যজ্ঞ-অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, সোমযাগ, খ্রীষ্টযাগ ও পুরুষযজ্ঞ প্রথমে লেখা হয়েছিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকা হিসাবে।

'যজ্ঞ-কথা'র প্রবন্ধগুলো আলোচনা করলে দেখি, চলিত অর্থে যে সমাজকে আমরা হিন্দু-সমাজ বলি, রামেন্দ্রসুন্দর তাকেই বলেছেন বেদপন্থী সমাজ। এই সমাজ বেদের শাসন মেনে থাকে এবং এই সমাজের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান হল যজ্ঞ। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য না বুঝলে বেদপন্থী সমাজের বৈশিষ্ট্যকে জানা যায় না। এ কারণেই যজ্ঞ-কথার প্রথম প্রবন্ধে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। দ্বিতীয় প্রবন্ধে দু' শ্রেণীর শ্রৌত যজ্ঞ 'ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ' নিয়ে গভীর ও তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী প্রবন্ধ 'সোমযাগে' আর্যদের অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান সোমযাগের অংশবিশেষ, একদিনে সম্পাদ্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অন্তর্গত অগ্নিষ্টোম নিয়ে আলোচনা আছে। 'খ্রীষ্ট-যজ্ঞে' ও 'পুরুষ-যজ্ঞে' খ্রীষ্টানদের Encharist-ভক্ষণের এবং খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদপন্থী ও খ্রীষ্টীয় সমাজের সাদৃশ্য বের করতে ইচ্ছুক বলেই রামেন্দ্রসুন্দর এই আলোচনায় অনুপ্রবেশ করেছেন। বেদপন্থীদের পুরোডাশ ভক্ষণের তাৎপর্য কী এবং খ্রীষ্টানদের Encharist-ভক্ষণের সঙ্গে এর কোনো মিল আছে কী না, তা' দেখাতে গিয়ে আচার্য ত্রিবেদী এখানে খ্রীষ্টীয় ও বৈদিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন, খ্রীষ্টানের ও বেদপন্থীর মধ্যে বহু জায়গায় অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে।

বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের সত্যদৃষ্টি ও স্বদেশানুরাগের পরিচয় 'বেদ-কথা'য়ও রয়েছে। তবে যজ্ঞ-কথায় প্রাধান্য পেয়েছে যজ্ঞের তাত্ত্বিক অংশ; আর এখানে বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া-কর্ম-বিষয়ক আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অতএব অনেক নূতন কথার সন্ধান মিলবে এখানে। যজ্ঞ-কথা ও বেদ-কথার প্রবন্ধগুলোকে পড়ে নিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ পড়লে অনুবাদ বুঝার সুবিধা হবে।

৪

এতক্ষণ বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনায় দেখা গেল, বৈদিক ধ্যান-ধারণা ও ধর্ম-কর্ম নিয়ে আলোচনার মূলে ছিল তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ। এই স্বদেশানুরাগই তাঁকে সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আরও বহু প্রবন্ধ-রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সুতীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালী, সুগভীর ঐতিহাসিক জ্ঞান ও ঐকান্তিক স্বজাতিপ্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের এই শ্রেণীর রচনার বৈশিষ্ট্য। স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাগুলোকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। কোথাও বৃহত্তর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের মূলগত

পার্থক্য নির্ণয় করে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'নানা কথা'র 'আনি বেসান্ট', 'পরাধীনতা,' 'রাষ্ট্র ও নেশন' 'বর্ণাশ্রমধর্ম' ও 'ব্রাহ্মণ কি পৃষ্ট,' ইত্যাদি প্রবন্ধ। এ ছাড়া বৃহত্তর জীবন-ধর্ম নিয়ে লেখা এবং সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপোষক কোনো কোনো প্রসঙ্গেও রামেন্দ্র-সুন্দর ভারতের জীবনসাধনা ও সমাজ-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'নানা কথা'র 'আমিষ ভোজন' শীর্ষক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ ছাড়া কোনো কোনো রচনায় স্বদেশ ও স্বজাতির খুঁটিনাটি ইতিহাস-রচনার প্রবণতা দেখা যায়। স্বদেশের ইতিহাস-রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে কোথাও। কোথাও আবার দেশীয় কোনো কোনো দেবদেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। দেদীপ্যমান স্বদেশপ্রেম বহু রচনার মূল সুর। এই পর্যায়ের কোনো কোনো রচনায় সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রতিকারের পথ-নির্দেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এ ছাড়া সমাজবিজ্ঞান ব্যাখ্যায় জীববিদ্যার প্রয়োগ এই শ্রেণীর বহু রচনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো 'নানা কথা'য় (১৯২৪) সংকলিত হয়েছে। তবে 'পুণ্ডরীককুলকীর্তিপঞ্জিকা' (১৩০৭), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৩১২) ও 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'—২য় পর্যায়ও (১৩৩৪) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে, সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে এবং অপরের রচিত গ্রন্থের ভূমিকায় স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আচার্য ত্রিবেদীর মনোভাব জানা যায়। তবে সাহিত্যিক মূল্য ও বক্তব্যের গভীরতার দিক থেকে 'নানা কথা'র প্রবন্ধগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর দেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দরকে যাঁরা জানতে চান, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ করতে অনুরোধ করি তাদের। কী ভাষার প্রসাদগুণ, কী উদাত্ত ভাব, কী একনিষ্ঠ স্বাদেশিকতা, সব দিক দিয়েই এ রচনাটি রামেন্দ্র-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। আর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' —২য় পর্যায়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, একদিকে সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব এবং অপর দিকে রাষ্ট্রতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ও ইতিহাসে যে পাণ্ডিত্য ও সুস্থ জীবন-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলার মননধর্মী সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসের তা এক স্মরণীয় সম্পদ।

৫

বিজ্ঞানে-দর্শনে, বেদে-ব্রাহ্মণে দেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দরের এই অনুরাগের কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, তিনি ছিলেন এক আদর্শ শিক্ষাব্রতী। সুদীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনা করেছেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রিপণ কলেজে পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন তিনি। অল্পদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর যশস্বী অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেন। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি ছাত্রদের মুখে মুখে ছড়িয়ে

পড়ল। রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রতি ছাত্রদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করতেন তিনি। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিতেন। অঙ্কের সাহায্য ছাড়াই জটিল পদার্থবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতেন মাতৃভাষায়। এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। তাঁর পদোন্নতিও ঘটল খুব তাড়াতাড়ি। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপণ কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হলেন।

এ যুগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের রামেন্দ্রসুন্দরের দিকে তাকাতে অনুরোধ করি একবার। তাকালে দেখবেন, সদানন্দময় দরদী এক আদর্শ শিক্ষাবিদ্‌কে। ছাত্রদের সঙ্গে অতি সহজেই মিশছেন তিনি। হাসছেন, গল্প করছেন, ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের খবর নিচ্ছেন। এই অধ্যক্ষের কাছে অফিস মারফৎ ছাত্ররা আবেদন-পত্র পাঠাচ্ছে না। সবাই তাঁর সঙ্গে সরাসরি দেখা করার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি নিজের টাকা দিয়ে বই কিনে দিচ্ছেন মেধাবী ছাত্রদের। আর এ কোথায় বসে আছেন তিনি! অধ্যক্ষের খাসকামরায় নয়, বসে আছেন অধ্যাপকদের ঘরে, সহকর্মিদের একেবারে মাঝখানে। এ অধ্যক্ষের আলাদা কোনো বসবার ঘর নেই। অধ্যাপকদের ঘরই তাঁর ঘর। সহকর্মিদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য রচনায় এ অধ্যক্ষ বিশ্বাস করেন না। অধ্যাপকদের মধ্যে বসে, অধ্যাপকদের আলাপ-আলোচনায় যোগ দিয়ে আনন্দময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিমণ্ডল রচনাতেই তিনি বিশ্বাসী। এ অধ্যক্ষ তরুণ অধ্যাপকদের লেখায় অনুপ্রাণিত করেন, শেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। চিঠিপত্র, ফাইল-রিপোর্টও কমিটি মিটিং-এর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে নিয়মিত বিদ্যাচর্চা করেন এবং এ কাজে অপরকেও অনুপ্রাণিত করেন। প্রতিটি অধ্যাপককে বুঝতে চেষ্টা করেন এ অধ্যক্ষ। অধ্যাপকের বিদ্যাবত্তা, সহৃদয়তা ও গুণের পরিচয় লাভের চেষ্টা করেন।

বরাবরই উদারপন্থী ছিলেন তিনি। স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির দিকে তাকিয়ে চিরকাল তিনি তাঁর স্বাধীন মতবাদকে অকপটে প্রকাশ করেছেন। তাই দেখি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারকল্পে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন স্যাণ্ডলার কমিশন গঠিত হ'ল এবং এই কমিশন যখন সংস্কারসম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত জানতে চাইলেন, রামেন্দ্রসুন্দর তখন অসংকোচে শিক্ষা সম্বন্ধে আপন অভিমত ব্যক্ত করে লিখছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা, আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, তা' ঠিক। এ শিক্ষা থেকে আমরা উপকৃতও হয়েছি প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু এ উপকারের মূল্য দিতে হয়েছে আমাদের। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। আত্মমর্যাদাবোধ ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের জীবনে কমে গেছে। জীবনের মহত্ত্ব ও সম্ভ্রমবোধের মূল্য দিয়েই এ শিক্ষাকে গ্রহণ করেছি আমরা। তাই মনে হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাবের মিলনেই আমাদের শিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষাদর্শ নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, ছকে বাঁধা যান্ত্রিক শিক্ষা কোনোদিনই তাঁকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। যে শিক্ষা সত্যিকারের মানুষ তৈরি করে, জাতীয় জীবনের কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্ধকার দূর ক'রে

জাতিকে নূতন আলোর সন্ধান দেয়, তিনি ছিলেন সেই শিক্ষার পক্ষপাতী। ইংরেজী শিক্ষার অসম্পূর্ণতার চিত্র বারবার তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আদর্শ শিক্ষা কী এবং কী ভাবে তা' বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তা' নিয়ে অনেক প্রবন্ধেই তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার দোষ-ত্রুটি কোথায় এবং সে সব ত্রুটি দূর করবার উপায়ই বা কী, সমসাময়িক সমাজ-জীবন ও শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা' নিয়েও তিনি কয়েকটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ সকল প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি 'নানা কথা'য় সংকলিত হয়েছে। সাময়িক-পত্রে ছড়ান শিক্ষা-বিষয়ক অন্যান্য রচনাগুলো সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ঐ সকল প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করলে মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর চেয়েছিলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যন্ত্রের মতো প্রাণহীন না হয় যেন। সেখানে যেন থাকে প্রাণশক্তির পরিচয়। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শের প্রতি আচার্য ত্রিবেদীর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাই বলে শিক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ছিলেন না তিনি। বরং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি হল তাঁর শিক্ষাদর্শের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করে, সমাজ ও জাতির ইতিহাস, বিশিষ্টতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় ভাববিকাশের অনুকূল স্বাভাবিক ও কৃত্রিমতা-মুক্ত শিক্ষার প্রসারই তাঁর কাম্য ছিল।

৬

শুধু শিক্ষাচিন্তার কথাই বা বলি কেন, রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-ভাবনায়ও উচ্চাঙ্গের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তথ্য-সম্ভারে নয়, গভীর জীবনবোধ, সূক্ষ্ম রসদৃষ্টি এবং অনুপম বিশ্লেষণ-কুশলতার গুণে এই রচনাগুলো উজ্জ্বল। এই শ্রেণীর বহু রচনাই সমালোচনার ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি ; জীবন-রহস্যের-গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। জীবন, সমাজ ও সাহিত্যের ত্রিবেণীসঙ্গম রচিত হয়েছে 'নানা কথা'য় সংকলিত সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলোতে। স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-ভাবনার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য আচার্য ত্রিবেদীর কাছে শুধু আনন্দের সামগ্রী নয়, প্রয়োজনের বস্তুও বটে। জনসংযোগ এবং সমাজে উচ্চ-নীচের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সাহিত্যের উপযোগিতা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান-সংগ্রহের জন্য একটি সাহিত্য-তীর্থ প্রতিষ্ঠা করতে। এ জন্যেই দেখি, বিভিন্ন সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উপযোগিতার কথা ব্যাখ্যা করছেন, বিভিন্ন রচনা ও অভিভাষণে সাহিত্য-পরিষদের আদর্শের কথা তুলে ধরছেন। আর, সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্যে তিনি যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে পুঁথি-বিচার বিষয়ক রচনাগুলো থেকে। এ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দর বিভিন্ন গ্রন্থের যে সব ভূমিকা লিখেছিলেন, তা' থেকেও তাঁর সাহিত্য-চিন্তার বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৭

এইভাবে রামেন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, জ্ঞান-জগতের বহু-বিচিত্র আলোকে এ সাহিত্য ভাস্বর। রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষা ছিল বহুমুখী। বিজ্ঞানে-দর্শনে, বেদে-ব্রাহ্মণে, শিক্ষায়-সাহিত্যে সমান পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। আর সর্বোপরি ছিল স্বদেশ-প্রেম। এ কারণেই রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা থেকে এ জগতের বহু বরণীয় মনীষীর যাত্রা-পথের নিশানা মিলেছে। চরিত-কার হিসাবেও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। 'চরিত-কথা' (১৯১৩) রামেন্দ্র-প্রতিভার এক স্মরণীয় নিদর্শন। স্বদেশী-বিদেশী আটজন মনীষীর জীবন-কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য জীবনসমূহের মনীষা ও খ্যাতির ক্ষেত্র বহু-বিচিত্র। জগৎ ও জীবনকে বৃহত্তর এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বলেই মনীষীদের জীবনালেখ্য রচনায় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। খ্যাতিমানের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতির প্রবণতা থেকে নয়, অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম থেকেই এই শ্রেণীর অধিকাংশ রচনা উৎসারিত। এ কারণেই এখানে জগদ্বরেণ্য মনস্বীর কথা যেমন আছে, তেমনি আছে বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্য-সাধকের প্রসঙ্গ। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে চরিত-কথার রচনাগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে : (১) এ দেশের কয়েকজন স্মরণীয় মনীষীর পরিচয়, (২) অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত কয়েকজন স্বদেশী মনস্বীর কথা এবং (৩) বরণীয় বিদেশী প্রতিভার কাহিনী।

৮

এ ছাড়া ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে পড়ে ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। অপর অংশের আলোচ্য বিষয় হ'ল বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব এবং বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ সকল প্রবন্ধকে 'শব্দ-কথা' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। 'শব্দকথা'য় দু'শ্রেণীর রচনা আছে। এক শ্রেণীর রচনায় বাংলা শব্দের ধ্বনি, কারক, প্রত্যয় এবং বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অপর শ্রেণীর রচনার আলোচ্য প্রসঙ্গ বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা। 'রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা' শীর্ষক অধ্যায়ে আচার্য ত্রিবেদীর মতে ও পথে বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে 'ভাষাবিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দর' নামক অধ্যায়ে। বাংলা বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত হল,—সুবিধা, শ্রুতি-মধুরতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে, ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ ক'রে, সুনির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা অর্থে বিজ্ঞানের পরিভাষার ব্যবহার করতে হবে। আর ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্বকে তিনি বিচার করতে চেয়েছেন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য

রেখে। বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্ধারণ করে বাংলা ব্যাকরণ রচনার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশিয়ে বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রচেষ্টাকে তিনি কোনোদিন সমর্থন করতে পারেন নি। সে কারণেই দেখি, সংস্কৃত ভাষা থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর মূল আকর্ষণের চেষ্টা তিনি করেন নি। বাংলা ভাষার বিশিষ্টতার দিকে তাকিয়ে কারক-প্রকরণের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে, বাংলায় তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক।

এ ছাড়া খাঁটি বাংলা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি-বিচার সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত হল এই যে, অর্থ ও ব্যুৎপত্তি আলোচনার কালে কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলের উচ্চারণ ধরে বিচার করলে চলবে না। বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ একত্র মিলিয়ে মূল উচ্চারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হবে। এই মূল উচ্চারণ থেকেই নির্ণয় করতে হবে মূল প্রত্যয়।

আর বাংলা ব্যাকরণ রচনার আদর্শ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, বাংলা ও সংস্কৃতের তুলনা ক'রে উভয় ভাষার মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও বৈষম্যের সূত্রগুলি খুঁজে বের করতে হবে। কেবলমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি বাংলায় তর্জমা করে দিলে চলবে না। বাংলা ভাষার প্রত্যেকটি শব্দকে কেটে, বিশ্লিষ্ট করে পরীক্ষা করতে হবে। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষাগুলোকেও পরস্পর তুলনা করতে হবে। এমনকি অস্পৃশ্য সমাজের ভাষাকেও অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না।

এইভাবে রামেন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমায় বেরিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়, তা' হল এই যে, এই মনস্বী ও স্বজাতিবৎসল সাহিত্য-সাধক বহু-বিচিত্র রঙে-রসে বাংলার জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের কয়েকটি অনাদৃত শাখা-প্রশাখাকে সুন্দর ও সতেজ করে গেছেন। কেমন করে করেছেন, পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তৃত পরিচয় লাভের চেষ্টা করব। বিজ্ঞানকে নিয়েই রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-সাধনা শুরু করেছিলেন, এই যুক্তিতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক।

তৃতীয় অধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা

১

সাহিত্য রসের সামগ্রী। রসের আনন্দ-সাগরে ডুব না দিলে মন ভরে না সাহিত্যিকের। রঙে-রসে নিজে মাতাল হয়ে অপরকে মাতাল না করলে প্রাণ ভরে না। রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মাতাল করার ক্ষমতা বিজ্ঞানীরও আছে। বিজ্ঞানবিদ্যার রস দিয়েও অপরকে মাতান যায়। বিজ্ঞান যাঁর কাছে আনন্দের বস্তু, বিজ্ঞানকে কৌতূহলীর আনন্দঘন দৃষ্টিতে দেখেন যিনি, তিনি পারেন মাতাতে। বিজ্ঞান-সত্যের মধ্যে আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বিজ্ঞানবিদ্যার আলোকে নিজে আমোদিত হয়েছিলেন। তাই সেই আনন্দের ভাগ অপরকে দিয়ে গেছেন তিনি; সেই আনন্দের অংশীদার করেছেন সবাইকে। বিজ্ঞানরসের আনন্দে নিজে মাতাল হয়ে অপরকে মাতিয়েছেন। সাংকেতিকতার স্বর্গলোক থেকে বিজ্ঞান-ভাগীরথীকে নামিয়ে এনেছেন মর্ত্যলোকে। অসাধারণের একচেটিয়া সম্পত্তিকে করেছেন সাধারণের সম্পদ। অনধিকারীকে বিজ্ঞান-বিদ্যার রসাস্বাদনের অধিকার দিয়েছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে বিজ্ঞানের রস-পরিবেশন করেছেন জাতিবিচার না করে। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি উক্তির কথা মনে পড়ছে। জগদানন্দ রায়ের 'প্রকৃতি পরিচয়ে'র ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

> মাদক দ্রব্যের একটা সাধারণ লক্ষণ এই যে, অপরকে না বিলাইলে আনন্দের পূর্ণতা হয় না। বিজ্ঞানামোদীও অপরকে আনন্দের ভাগ দিতে চান;—না দিতে পারিলে তাঁহাদের আনন্দ পূর্ণ হয় না। অপরকে মাতাইতে প্রবৃত্ত হইলে তখন আর অধিকারী-অনধিকারী বিচার করা চলে না। ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া যায়, তখন জাতিবিচারের অবসর ঘটে না।

অপরের কথা জানি না, তবে রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যের ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই যে দ্বিজোত্তম হয়ে যায়, জাতিবিচারের অবসর সেখানে যে ঘটে না, তা' হলফ করে বলতে পারি। বিজ্ঞান নিয়ে যা' কিছু লিখেছেন তিনি, যা' কিছু ভেবেছেন, তার সবই সকলের জন্যে। বিজ্ঞানবিদ্যার রস সকলকে আস্বাদন করাতে হবে কেন, কেন অধিকারী-অনধিকারীর প্রশ্ন তুলে সেই রস থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা চলবে না, সে কৈফিয়তও রামেন্দ্রসুন্দর দিয়ে গেছেন।

১৩২০ সালের চৈত্র মাস। কলকাতার টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হচ্ছে। ঐ সম্মেলনের বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে আছেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। সভাপতির ‘অভিভাষণে’ তিনি বললেন,

> বিজ্ঞানমন্দিরে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। সাধনামন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে ঊর্দ্ধমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী এবং ফলভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম বস্তুতই নিষ্কামধর্ম্ম। কর্ম্মেই তাঁহাদের অধিকার; ফলে তাঁহাদের একেবারে অধিকার নাই। যাহা কিছু তাঁহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্ব্বাচন চলিবে না।

কালবিলম্ব না ক’রে, পরিভাষার দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে, পরিপূর্ণ উদ্যমে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা শুরু করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারে কী যে গভীর অনুরাগ ছিল তাঁর, মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান-সত্য-প্রকাশের বাহক হিসেবে দেখতে যে কতটা আন্তরিক আগ্রহ তাঁর ছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উপরোক্ত অভিভাষণটি পাঠ করলে তা’ জানা যায়। এখানে বাংলার বিজ্ঞানী-সম্প্রদায়কে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। পরিভাষার বাঁধাকে উপেক্ষা ক’রে জনসাধারণের জন্যে বিজ্ঞানের সাহিত্য-রচনার প্রার্থনা জানিয়েছেন। তা’ ছাড়া বাংলার জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও জীবজন্তু, পোকামাকড় ও গাছপালার জীবনধারণ-প্রণালী এবং বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত মাতৃভাষায় রচনা করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি-সাধনের জন্যে বাংলার বিজ্ঞানীসমাজকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই ঐকান্তিক অনুরোধ ও উদাত্ত আহ্বান একেবারে ব্যর্থ হয় নি। পরবর্তী কালে বাংলার জীবজন্তু, পশুপাখি, পোকামাকড় ও গাছপালা নিয়ে অনেকেই গ্রন্থ লিখছেন। কিন্তু সেই সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন রামেন্দ্রসুন্দরকে ভুলে না যাই। বাংলায় আদর্শ বিজ্ঞানসাহিত্যের পথিকৃৎ যিনি, তাঁর কথা যেন বিস্মৃত না হই। মনে যেন রাখি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য অনাদর ও অবজ্ঞার অন্ধকারে বিসর্জিত হতে চলেছিল, রামেন্দ্রসুন্দর তা’ থেকে ঐ সাহিত্যকে মুক্ত করে যথার্থ শ্রদ্ধা ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। সমসাময়িক কালের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার দীনতার দিকে তাকিয়ে ‘আকাশের গল্পের’ ভূমিকায় (১৩২৩) রামেন্দ্রসুন্দর জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করেছিলেন,

> পাঠশালার বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সমাদর একেবারে নাই কি? পঞ্চাশ বৎসর আগে যে আদরটুকু ছিল, এখন তাহাও নাই কি? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি

মনস্বীরা যাহার বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এমন নিষ্ফল হইল কেন?

এই জিজ্ঞাসার পিছনে যে হতাশা ও সংশয় ছিল, রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই তা' যথাসাধ্য দূর করবার চেষ্টা করেছেন। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন তিনি। কেমন করে করেছেন, আর কতটা করেছেন, রামেন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগের বিজ্ঞানসাহিত্যের পটভূমিকায় তা' নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

২

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয়েরা। কিন্তু ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষা ছিল কৃত্রিম ও জটিল। ভাষার কৃত্রিমতা দূর ক'রে এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় ক'রে তুললেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক যুগে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের যাঁরা সমৃদ্ধি সাধন করলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্যে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হোল।

পরবর্তী লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-কুশলতা ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া গেল, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে তা' একক ও অভিনব। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলোকে রামেন্দ্রসুন্দর যেরূপ সরল ও সহজ ক'রে সর্বসাধারণের কাছে পরিবেশন করেছেন, ইতিপূর্বেকার আর কোনো গ্রন্থকারই তা' করেন নি। রচনা জটিল হয়ে পড়বার ভয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের প্রায় সকলেই বিজ্ঞানের দুরূহ দিকগুলো এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকাংশই বিজ্ঞানের জটিল এবং রহস্যময় দিকগুলো নিয়ে। রচনা দুর্বোধ্য হয়ে পড়বার আশঙ্কায় বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলো কোনো সময়েই তিনি এড়িয়ে যান নি; বরং সেই তত্ত্বগুলো সহজ ও মনোজ্ঞ ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বকে উপেক্ষা না করার কারণ, তিনি নিজে সে সকল তত্ত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ড (১৮৪৫-১৮৭৯) সম্বন্ধে বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল যে মন্তব্য করেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্বন্ধে এখানে তা' প্রযোজ্য—

> "Clifford possessed an art of clarity such as belongs only to a very few great men—not the pseudo-clarity of the popularizer, which is achieved by ignoring or glozing over the difficult points, but the clarity that comes of profound and orderly understanding, by virtue of which principles become luminous."[১]......

১ The common sense of the exact sciences—W. K. Clifford. Edited by Karl Pearson (1945): Preface P. V.

উপলব্ধির গভীরতার বলেই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের দুরূহ তথ্যকে নিজস্ব চিন্তার আলোকে বিচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৩

বিজ্ঞানে রামেন্দ্রসুন্দরের পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। শৈশবকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষায় বিজ্ঞানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর-বৎসর পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে এম্. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। বৃত্তিলাভের পর কিছুকাল তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটরিতে বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজের পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা দিতেন তিনি। প্রাঞ্জল বাংলায় বিজ্ঞানের সব দুরূহ তত্ত্ব ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, "অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-সঙ্ঘমধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না।" পদার্থবিদ্যার দুরূহ বিষয়গুলো গণিতের সাহায্য ছাড়াই ছাত্রদের তিনি বুঝিয়ে দিতেন। পরবর্তিকালে রামেন্দ্রসুন্দর গণিতের সাহায্য না নিয়েই বিজ্ঞানের অতি জটিল তত্ত্বাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গণিতকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের স্বরূপ দর্শন করার স্পৃহা রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময় থেকেই তাঁর জীবনে সুপরিস্ফুট হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় গণিতের অভাব পূর্ণ করেছে দর্শন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, উভয় দর্শনেই তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। অবশ্য দর্শন-শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয় অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালে। রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি কঠোর অভিনিবেশ সহকারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন পাঠ করেন।

কিন্তু দর্শন বা বিজ্ঞানের চেয়েও রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে আরও বড় সত্য হোল সাহিত্য। তিনি যখন যা' লিখেছিলেন তা'ই সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যপ্রতিভার বীজ রামেন্দ্রসুন্দরের রক্তের মধ্যেই ছিল। তাঁর জন্ম হয় এক সাহিত্যসাধক পরিবারে। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী কবি ও কাব্যরসিক ছিলেন। ব্রজসুন্দর 'মাধব-সুলোচনা' নামে একখানি গদ্যপদ্যময় নাটক ও 'স্বর্ণসিন্দুর সিংহ বা গৌরলাল সিংহ' নামে একখানি প্রহসন লিখেছিলেন। তা' ছাড়া শাস্ত্র ও পুরাণেও তাঁর অগাধ অনুরাগ ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দর 'বঙ্গবালা' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটির ভূমিকা পয়ার ছন্দে লেখা। এ ছাড়া গোবিন্দসুন্দর 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে আর একটি ছোট নাটক লিখে অভিনয় করিয়ে-

ছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিতেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের খুল্লতাত উপেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংরেজী স্কুলে পড়বার সময় রামেন্দ্রসুন্দর নিজেও কবিতা লিখতেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পূর্বে তিনি লুকিয়ে বঙ্গদর্শন পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বরাবরই তাঁর প্রিয় ছিল।[২] অতএব পরবর্তী কালে যিনি 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা'[৩] বলে অভিহিত হয়েছিলেন তাঁর জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার প্রস্তুতি চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম রচনা 'মহাশক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়।[৪] এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত। নবজীবনে তাঁর আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'বিবর্ত্তন' (শ্রাবণ, ১২৯২), 'মহাতরঙ্গ' (অগ্রহায়ণ, ১২৯২), 'জড় জগতের বিকাশ' (আষাঢ়, ১২৯৩)। এই প্রবন্ধগুলো রামেন্দ্রসুন্দরের কোনো গ্রন্থে স্থান পায় নি। তবে বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্য সাহিত্যসাধনার আরম্ভ থেকেই তাঁর মন-প্রাণকে আলোড়িত করেছিল; তার ইঙ্গিত এই সকল রচনায় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলিতে ভাষার জাঁকজমক এবং কবিত্ব ও উচ্ছ্বাসের কিছুটা আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রথম জীবনে কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'গমগমে ভাষার প্রভাব'—একথা রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই স্বীকার করেছিলেন। এই জমকালো ভাষার মোহ অল্পকালের মধ্যেই তিনি কাটিয়ে উঠলেন। রামেন্দ্রসুন্দর লেখনী ধারণ করার পর থেকেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত। দর্শনের বেদীমূলে বিজ্ঞানকে বসিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর এই বিজ্ঞানদর্শন বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বিজ্ঞান রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে পরম আনন্দের সামগ্রী। কিন্তু বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দিক তাঁর কাছে কোনোদিনই বড় হয়ে ওঠে নি। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,—

> "বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আঁধারে আলোক আনিয়া, এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়া বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনামো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো, স্টীমশিপ আর এরোপ্লেন অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ।"

(জিজ্ঞাসা : মায়াপুরী)

দীর্ঘকাল ধরে রামেন্দ্রসুন্দর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধের

২ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর—অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ; পৃঃ ১৬—১৭।

৩ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত। পৃঃ ১৩ [সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিত প্রবন্ধ]।

৪ রামেন্দ্রসুন্দর—আশুতোষ বাজপেয়ী; পৃঃ ১৮২।

বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সেই সকল দিক—যে দিকগুলো জগৎ-তত্ত্বের মূল রহস্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত। বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দিক নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ নেই বললেই হয়।

রামেন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট এক অংশ জুড়ে আছে বিজ্ঞান। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে প্রাধান্য লাভ করে নি। বিজ্ঞানকে বাহন মাত্র ক'রে তিনি জগৎ-রহস্যের মূল অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন। বিজ্ঞান এখানে উপলক্ষ্য; লক্ষ্য জগৎ-রহস্যের মূল উদ্ঘাটন। তবে যুক্তি ও প্রমাণ ভিন্ন কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যকেই তিনি মেনে নেন নি। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,

"আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্দ্ধা রাখি না; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতা-জীবী বিজ্ঞান-ভিক্ষু। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ ব্যবহারিক বিদ্যায় আমার নিকট অগ্রাহ্য।"

(বিচিত্র জগৎ : প্রাণময় জগৎ)

প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই আস্থা ছিল বলেই বিজ্ঞান এক এক জায়গায় রামেন্দ্র-সুন্দরকে নিরাশ করেছে। বিজ্ঞানবিদ্যার গলদ তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেছে।

বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানবিদ্যায় কৃতী ছাত্র হলেও রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক নন। পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি নতুন কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে যুক্তি ও অনুভূতির মাপকাঠিতে তিনি দর্শন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানদর্শনের সাহায্যে যখনই তিনি জগৎতত্ত্বের মূল রহস্যের উত্তর খুঁজেছেন তখনই বিজ্ঞানবিদ্যার ফাঁকি তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। এই ফাঁকি প্রকট হয়ে উঠেছে যখন তিনি বেদান্তবাদী দার্শনিকের বিচারভূমিতে বসে বিশ্বজগতের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। 'জিজ্ঞাসার মায়াপুরী' নামক প্রবন্ধে এই মনোভাব সুস্পষ্ট :—

"এই কাল্পনিক জগৎ আমারই কিম্ভূতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং এই কাল্পনিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভূত; আমি কিন্তু ঠিক উল্টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া উহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি। এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এইখানে গোড়ায় গলদ।"

বিজ্ঞানবিদ্যার এই গোড়ায় গলদ স্বীকার ক'রে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর আলোচনায় এগিয়েছেন। তাই বহু ক্ষেত্রেই তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভিত্তিভূমি দর্শন।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁর দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব। কোথায় দাঁড়িয়ে, কি ভাবে দেখলে কোন জিনিসটি সহজে বিচারের সুবিধা, আশ্চর্য বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি তা' নির্ণয় করেছেন। তাঁর এই বিচারপ্রণালী থেকে জায়গায় জায়গায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বা attitude-এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, দর্শনের রাজ্যে তাঁর যাত্রা বিজ্ঞানের পথ বেয়ে।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'তে (১৮৯৬) বিজ্ঞানেরই কলধ্বনি। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল কয়েকটি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কেন্দ্র ক'রে। রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), হেলম্‌হোল্‌ৎজ (১৮২১-১৮৯৪), কেল্‌ভিন্ (১৮২৪-১৯০৭) ও টমাস হেন্‌রী হাক্স্‌লী (১৮২৫-১৮৯৫) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্যজাল একে একে উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে, এ সত্যটি রামেন্দ্রসুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত তথ্যাদিকে ভিত্তি ক'রে আলোচ্য গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্বপ্রকৃতির কয়েকটি দিকের রহস্যযবনিকা উত্তোলিত করবার চেষ্টা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে যাঁরা বিপ্লব এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য চার্লস্ রবার্ট ডারউইনের নাম। লামার্ক জানিয়েছিলেন, জৈবনিক পদার্থগুলো ক্রমবিবর্তনের পথে আভ্যন্তরিক শক্তির সাহায্যে, উত্তরাধিকারসূত্রে এবং পারিপার্শ্বিক থেকে প্রাপ্ত গুণগুলির সাহায্যে, প্রাণিদেহকে উন্নতিতে সাহায্য করছে। ডারউইন এই মতকে সমর্থন ক'রে একটি নতুন কথা বললেন,—জীবকোষগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। ডারউইনের মতে, প্রাণীর যে যে অংশ ও গুণ তার পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি কেবলমাত্র সেই সব অংশ ও গুণগুলিকে রক্ষা ক'রে থাকে। ফলে অধিক গুণসম্পন্ন প্রাণীরা অধিককাল জীবিত থাকে ও সন্তানসন্ততি রেখে যায়। আর যে ক্ষমতাহীন ও গুণহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে সে বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকেই ডারউইন বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection)।[৫] প্রধানতঃ এই দু'টি মতবাদকে ভিত্তি ক'রে প্রকৃতির 'মৃত্যু' শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর জীবতত্ত্ব ও জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, প্রকাশ-ভঙ্গীর স্বচ্ছতা ও চিন্তার গভীরতার দিক থেকে তা' অনন্য। সাধারণতঃ বার্ধক্যে উপনীত হলেই জীব ইহলোক পরিত্যাগ করে—এরই নাম মৃত্যু। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর যে বিজ্ঞাননির্ভর উপসংহারে পৌছেছেন তা' হোল এই—জীবের বীজদেহ অনশ্বর। তিনি বলতে চেয়েছেন, মৃত্যু বীজের ধর্ম নয়, আবরণ-শরীরের ধর্ম।

> "বীজ গৃহ ছাড়িয়া গৃহান্তরে যায় ; জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন পরিধান করে। পরিত্যক্ত গৃহ গৃহীর অমনোযোগে ভাঙ্গিয়া যায় ; জীর্ণ পরিধান কাল-ক্রমে ছিঁড়িয়া যায়।" (প্রকৃতি : মৃত্যু)

এর সঙ্গে গীতার শ্লোকের তুলনা করা যায়—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি

৫ On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the struggle for life (1859).

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী ॥

পরবর্তী কালে 'জিজ্ঞাসা' ও 'বিচিত্র জগৎ' পর্বেও গীতার এই বাণী রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে।

ডারউইনের চিন্তাধারার প্রভাব 'প্রকৃতির মূর্ত্তি' নামক প্রবন্ধেও সুস্পষ্ট। এই প্রবন্ধের শেষাংশে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বিভিন্ন জীবের কাছে প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে দেখা দেয় বটে, কিন্তু একই শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতি প্রায় একই রূপে প্রতিভাত হয়। এর মূলে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের কথা বলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক টমাস হেন্‌রী হাক্স্‌লীর মতবাদও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। প্রকৃতির 'পৃথিবীর বয়স' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হাক্স্‌লীর মতবাদকে সমর্থন না করলেও পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ লর্ড কেল্‌ভিনের সঙ্গে হাক্স্‌লীর মতবাদের বিরোধটি অতি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

আকাশতরঙ্গ সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌ওয়েল ও হার্ৎজের আবিষ্কার রামেন্দ্রসুন্দরকে আকৃষ্ট করেছিল। 'প্রকৃতি'র কয়েক জায়গাতেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'আকাশতরঙ্গ' প্রবন্ধে তরঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে প্রধানতঃ এঁদের আবিষ্কৃত তথ্যাদির উপর নির্ভর ক'রে। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০৯) সংযোজিত 'আলোকতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধেও ম্যাক্স্‌ওয়েল ও হার্ৎজের মতবাদের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে।

বিশ্ববিশ্রুত জার্মান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হেলম্‌হোল্‌ৎজ-এর চিন্তাধারা প্রকৃতির রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ 'সৌরজগতের উৎপত্তি' ও 'প্রাকৃত সৃষ্টি' নামক প্রবন্ধ দু'টিতে আলোচিত। 'প্রকৃতির মূর্ত্তি' নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ব্যক্ত প্রকৃতির স্বরূপ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা'তে হেল্‌মহোল্‌ৎজের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছে।

বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ডের চিন্তাধারা ও রচনাপদ্ধতির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের মিল দেখা যায়। 'ক্লিফোর্ডের কীট' নামক প্রবন্ধে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ক্লিফোর্ডের মতবাদকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন। অতএব, প্রকৃতির প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ডারউইন, ম্যাক্সওয়েল, হেলম্‌হোল্‌ৎজ, কেল্‌ভিন্, ক্লিফোর্ড প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকদের পথেই এগিয়েছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থেরই 'জ্ঞানের সীমানা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার ও ব্যাখ্যায় তিনি যেন পরিতুষ্ট নন। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে তাঁর মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে, হেল্‌মহোল্‌ৎজের ব্যাখ্যায় তার উত্তর মিলছে না। রামেন্দ্রসুন্দর শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন—

> "জড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই কল্পনা জীবনরক্ষার একটা উপায় বা কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন, তাই যথানিযুক্তবৎ করিতেছি।"

এখানে বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের (১৮২০-১৯০৩) সঙ্গে তাঁর

চিন্তার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 'First Principles' (1862) প্রথম খণ্ডে হার্বার্ট স্পেন্সারও বলতে চেয়েছেন, সর্বশেষ metaphysical প্রশ্নগুলোর কোনো সমাধান নেই এবং এক্ষেত্রে কোনো অজ্ঞাত শক্তি—যা'কে জানবার কোনো উপায়ই নেই তা'কে স্বীকার করতে হয়।

জড়জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের এই যে সংশয়, পরবর্তী কালে রচিত 'জিজ্ঞাসা'র বীজ এরই মধ্যে নিহিত। বস্তুতঃ, এখান থেকেই বিজ্ঞানের আলোকোদ্ভাসিত রাজদরবার ছেড়ে বিজ্ঞানদর্শনের কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় পথে রামেন্দ্রসুন্দরের যাত্রা শুরু। কিন্তু যে পথেই তিনি গিয়েছেন সে পথেই সাহিত্যের রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতির রচনাগুলি বিজ্ঞানসাহিত্যের রত্নবেদী। বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যা' সৃষ্টি করেছেন তা' হয়ে উঠেছে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য। রচনারীতির সারল্য ও উপমা-নির্বাচনের অভিনবত্বের দিক থেকে বিচার করলে হাক্স্‌লীর সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়। হাক্স্‌লীর ন্যায় রামেন্দ্রসুন্দরের উপমা-নির্বাচনেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন :—

> "একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে পারিলে যে পরিমাণ তাপ জন্মে, সূর্য্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে প্রতি ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"
>
> [প্রকৃতি : সৌরজগতের উৎপত্তি]

অন্যত্র,

> "এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—তবে সেই জলের ফোঁটায় এক একটি অণু এক একটা বেলের মত বড় দেখাইবে।"
>
> [প্রকৃতি : পরমাণু]

'On a piece of chalk' শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় হাক্স্‌লী লিখেছেন :—

> "If all the points at which true chalk occurs were circumscribed, they would lie within an irregular oval about 3,000 miles in long diameter—the area of which would be as great as that of Europe, and would many times exceed that of the largest existing inland sea—the Mediterranean,"[৬]

প্রকৃতির জায়গায় জায়গায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যকে নগ্নভাবে প্রকাশ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর মানবজীবনের ট্র্যাজিডি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যেমন,

> "প্রকৃতি মাতার বহু যত্নে লালিত ও বহু যুগের প্রয়াসে গঠিত ও পুষ্ট মানুষের এই সুন্দর তনুখানি এত সহজে বাক্‌টিরিয়া কর্ত্তৃক অঙ্গারাম্ল বায়ুতে পরিণত হইতে দেখিয়া প্রকৃতিমাতা কাঁদেন কি হাসেন বলিতে পারি না।"
>
> [প্রকৃতি : ক্লীফোর্ডের কীট]

---

৬ Collected Essays (Vol. III) (1896)—T. H. Huxley—P. 3

অন্যত্র,

"অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্রধারা 'গতপ্রাণী মৃতকায়া' সহস্রজীবের কাক-শৃগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।"

[প্রকৃতি : পৃথিবীর বয়স]

৫

'জিজ্ঞাসা'য় (১৯০৪) রামেন্দ্রসুন্দর এক নতুন জগতে পদক্ষেপ করেছেন। প্রকৃতি-পর্বে নবাবিষ্কৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাহায্যে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে নিরাশ করেছে। জগৎরহস্য ভেদ করতে গিয়ে যখনই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের কাছে উত্তর বা মীমাংসা খুঁজে পান নি তখনই উত্তর খুঁজেছেন দর্শনের কাছে। কিন্তু দর্শনবিদ্যার উত্তরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। তাই দেখা যায়, দর্শনের বিচার ও তর্কবহুল পথ ঘুরে আবার তিনি বিজ্ঞানবিদ্যার কাছেই মীমাংসার পথ খুঁজেছেন। এভাবে বিজ্ঞান থেকে দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে তাঁর চিন্তা আনাগোনা করেছে বারবার। আলোচ্য গ্রন্থেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু কি দর্শন, কি বিজ্ঞান—কোনো বিদ্যাই জগৎ-রহস্যের কিনারা করতে অক্ষম। জগৎরহস্যের গোড়ার কথা তাই আজও পর্যন্ত জিজ্ঞাসাই থেকে গেছে। আলোচ্য গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর জগৎতত্ত্বের এমন কয়েকটি গোড়ার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যে প্রশ্নগুলো যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ভাবিয়ে তুলেছে। গ্রন্থটির জিজ্ঞাসা নামকরণের সার্থকতা এখানেই। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচনা করলে জিজ্ঞাসাগুলোর উপস্থাপনে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বিচার ও আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর মূল সমস্যাগুলিকে উত্থাপন করেছেন। তাঁর এই আলোচনা থেকে সমস্যা সমাধানে নতুন কোনো পথের নির্দেশ না পাওয়া গেলেও জায়গায় জায়গায় মূল সমস্যার সমাধানকল্পে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) বৈজ্ঞানিক, (২) বিজ্ঞানদর্শন এবং (৩) দার্শনিক।

"বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল", জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোর ভিত্তি দর্শন হলেও বহু প্রবন্ধেরই অবয়ব বিজ্ঞান। তা' ছাড়া জিজ্ঞাসায় চারটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রয়েছে। অবশ্য বিশ্ব-জগতের গোড়ার কয়েকটি সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কৌতূহল এখানেও জিজ্ঞাসার রূপ নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'মাধ্যাকর্ষণ' নামক প্রবন্ধটি। কোপার্নিকস, কেপ্‌লার, নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ষণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা' নিয়ে এখানে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ কেন হয়,—এ প্রশ্নের উত্তর নিউটন

জানতেন না; কেউ-ই জানেন না। এখানেই লেখকের জিজ্ঞাসা। 'বর্ণতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে প্রাকৃতিক দ্রব্যে বিবিধ বর্ণের বিকাশের কয়েকটি প্রধান কারণ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণবৈচিত্র্যের উপযোগিতা কি, তা'র যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, বর্ণবৈচিত্র্যে জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষার সুবিধা হয় এবং আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু মূল প্রশ্নের (যেমন, আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিতা) মীমাংসা এ থেকে হয় না। বস্তুতঃ, লেখকের জিজ্ঞাসার মূলসূত্র এখানেই। জিজ্ঞাসায় সংযোজিত 'উত্তাপের অপচয়' নামক রচনাটি একটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। জগৎ জুড়ে তাপের যে অপচয় ঘটছে তা'র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে এখানে বিজ্ঞান-নির্ভর আলোচনা করা হয়েছে। উত্তপ্ত পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে যাবার সময় তাপকে কাজে লাগান যায়। কিন্তু সবটুকু তাপকে কাজে লাগান যায় না। তাপের সামান্য একটা অংশ মাত্র কাজে লাগে। অবশিষ্ট সমস্ত তাপটুকুই উত্তপ্ত পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে চলে যায়। তাপকে কাজে লাগাতে গিয়ে এভাবে তা'র চরম অপব্যয় ঘটছে। তা' ছাড়া তাপের ধর্মই হোল, উষ্ণ জায়গা থেকে শীতল জায়গায় যাওয়া। এর ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন বিশ্বজগতের সকল জায়গায় উষ্ণতা হবে একই রকম। সেদিন বিশ্বজগতের প্রলয়। প্রকৃতিতেও অবিরাম তাপের অপব্যয় ঘটছে। প্রকৃতির তাপের অপব্যয় রোধ করবার উদ্দেশ্যে ম্যাক্স্‌ওয়েলের কল্পিত দুরূহ পরীক্ষাটিকে লেখক যেমন সরল উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন, বিশ্লেষণের দিক থেকে তা' অভিনব। 'নিয়মের রাজত্ব' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনাভঙ্গীর সরসতা। বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। প্রকৃতির রাজ্যে যা' কিছু দেখা যায়, তা'তেই প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান, এই হোল লেখকের বক্তব্য। যা' কিছু আজও পর্যন্ত দেখা যায় নি, তা'তে নিয়ম নেই বলে মনে হতে পারে; কিন্তু যে কোনো সময় একটা অঘটন ঘটে পূর্ববর্তী নিয়মকে ভেঙ্গে দিতে পারে। লেখক বলতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে এই ঘটনা এবং আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা মিলিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সংজ্ঞা নতুন ক'রে গড়ে নিতে হবে। বস্তুতঃ, কোনো স্থলে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলে সেই ব্যতিক্রমকেই নিয়ম বলতে হয়। কাজেই বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য। আলোচ্য প্রবন্ধটি এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিশেষত্ব সূক্ষ্ম রসবোধ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

কিন্তু জিজ্ঞাসার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানদর্শন। বিজ্ঞানদর্শন পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারা বিজ্ঞান থেকে দর্শন এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে গতিপথ পরিবর্তন করেছে। বিজ্ঞান ও দর্শন—উভয় বিদ্যার সাহায্যেই তিনি জগৎতত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', 'সৃষ্টি', 'অমঙ্গলের উৎপত্তি', এবং 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি' এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। বিজ্ঞানদর্শন পর্যায়ের অপর শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর নিজস্ব চিন্তাধারা ও বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে দর্শন করেছেন; বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গলদ কোথায় তা' বের করতে চেয়েছেন। 'মায়াপুরী' ও 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' এই শ্রেণীর প্রবন্ধ।

'সৌন্দর্যতত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' নামক দু'টি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় মানুষের সৌন্দর্যবোধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রাধান্য দর্শনের। একই বিষয়কে এই দু'টি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর দু'টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ অর্থাৎ আর্ট বা ঈস্‌থেটিক বৃত্তি। সৌন্দর্যবোধ মনুষ্যত্বের অঙ্গ। জীবনের স্থূল প্রয়োজনের জন্যে সৌন্দর্যের যে অংশটুকু আমরা গ্রহণ করি তা' প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উৎপন্ন। কিন্তু সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের মাত্রা নির্ভর করে সৌন্দর্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপর। সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যায় দর্শনশাস্ত্র লেখককে নিরাশ করেছে। তিনি উত্তর খুঁজেছেন ডারউইনের কাছে। ডারউইনের প্রাকৃতিক-নির্বাচন ও যৌন-নির্বাচনতত্ত্বকে বিশ্লেষণ ক'রে প্রকৃতির বর্ণবৈচিত্র্যের উত্তর মিলল বটে, কিন্তু সেই বর্ণবৈচিত্র্য মানুষের চোখে ভাল লাগে কেন, তা'র কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। রামেন্দ্রসুন্দর এবার উত্তর খুঁজলেন মনোবিজ্ঞানের কাছে। সৌন্দর্যবোধের দু'টি হেতু মনোবিজ্ঞান নির্দেশ করে। একটি 'অনুভূতির প্রবাহে আকস্মিকতার ও আতিশয্যের অভাব'; অপরটি 'সহানুভূতি'; অর্থাৎ, একের চোখে যা' ভাল লাগে অপরের চোখে তা' সুন্দর। এদিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন রক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সম্বন্ধ রয়েছে। আবার ব্যক্তি ও সমাজজীবনের পরিপুষ্টি প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। অতএব, শেষ পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের বিচারবহুল পথ ঘুরে এসে রামেন্দ্রসুন্দর আবার ডারউইনের ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নির্বাচনেই পৌঁছুলেন। কিন্তু যে সৌন্দর্যবোধ শুধুমাত্র তৃপ্তি আনয়ন করে, যা'র সঙ্গে ফলাফল বা লাভক্ষতির কোনো সম্বন্ধ নেই, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে সেই সৌন্দর্যবোধের কারণ নির্ণয় দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধে লাভক্ষতিহীন এই সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যাও প্রকারান্তরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যেই করেছেন। 'ইউটিলিটি' বা লাভক্ষতিবিহীন সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখবৃত্তিও ক্রমশঃ বাড়ছে। যে মানুষ যত উন্নত, তার দুঃখও তত বেশী। আবার দুঃখবৃত্তি যা'র যত প্রবল, সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতাও তার তত বেশী। দুঃখবহুল সংসারে আনন্দ রচনা না করলে কোনো মানুষেরই চলে না। অপরপক্ষে এই আনন্দরচনাশক্তিই হোল সৌন্দর্যবুদ্ধি। দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পাবার জন্যে, নিজের লাভের জন্যে মানুষ সৌন্দর্য রচনা করে। আবার যা'তে লাভ তা'ই প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে উৎপন্ন। অতএব, দেখা যাচ্ছে, রামেন্দ্রসুন্দর এখানে সৌন্দর্যতত্ত্বের উত্তর খুঁজেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাছে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়—

> "যাহাতে লাভ, তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলে এখানেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে।"

'ইউটিলিটি'র দোহাই দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সৌন্দর্যবুদ্ধির মূল বলে দেখাতে চাইলেন। কিন্তু 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সমগ্র বিষয়টিকে বিচার করেছেন একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমোক্ত প্রবন্ধের মতো এখানেও

আলোচনা শুরু করা হয়েছে ডারউইনের মতবাদ থেকে। ডারউইন জানিয়েছিলেন, যৌন-নির্বাচন থেকে জীবদেহের সৌন্দর্যের উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু মানুষ যেখানে-সেখানে 'অহেতুক সৌন্দর্য' আবিষ্কার করে। কবি ও ভাবুকদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি সবচেয়ে বেশী। এই শ্রেণীর অহেতুক সৌন্দর্যবুদ্ধি জীবনরক্ষায়ও কোনোরূপ আনুকূল্য করে না, বরং প্রতিকূলতা ক'রে থাকে। এই অকারণ সৌন্দর্যপ্রিয়তা জীবনসংগ্রামেও সাহায্য করে না। অতএব, কোনোরূপ প্রাকৃতিক কারণ থেকে এই সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি হয়েছে, এরূপ বলা চলে না। অভিব্যক্তিবাদের সমর্থক ওয়ালাশও একথা মেনে নিয়েছিলেন। কোনো কোনো জীবতাত্ত্বিকের মতে এই অহেতুক সৌন্দর্যপ্রিয়তা 'জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তুক আনুষঙ্গিক ফল মাত্র'। প্রাকৃতিক নির্বাচনে জীবের অভিব্যক্তির সময় জীবনরক্ষায় অনুকূল ধর্মগুলি বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন দু'একটি ধর্মও উৎপন্ন হতে পারে, জীবনরক্ষায় যাদের কোনো উপযোগিতা নেই। সৌন্দর্যবুদ্ধিও এরূপ একটা আনুষঙ্গিক ফললাভ মাত্র। এ থেকে লাভ কিছুই নেই; তবে এর সাহায্যে বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় ঘটেছে। এই অকারণ আনন্দলাভের উপযোগিতা রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টতঃই এখানে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনি তা' স্বীকার করেছিলেন। এখানেই উভয় প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

'সৃষ্টি' নামক প্রবন্ধে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রচলিত দার্শনিক মত কি তা' বুঝিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন। সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি প্রচলিত মতবাদ হোল—স্রষ্টার ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি। স্রষ্টারই বিধানে জগৎ চলছে। এই মতবাদটিকে অনেকে মেনে নিলেও জগতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। তা' ছাড়া জগৎসৃষ্টির উপকরণ কোথা থেকে এল, তা'র উত্তর কোনো শাস্ত্রের কাছেই পাওয়া যায় না। তবে উপকরণ দেওয়া থাকলে জগৎ কিভাবে নির্মিত হোল বিজ্ঞান তা'র উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম, একদল লোক যা'কে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলে থাকে, বিজ্ঞান তা'রই সাহায্যে জগতের নির্মাণ-প্রণালী ও ক্রিয়া-প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করেছে। প্রাকৃতিক নিয়মগুলো পুরোপুরি জানলে জগৎ কিভাবে চলছে এবং কিভাবে চলবে, বৈজ্ঞানিক তা' বলে দিতে পারবেন। এই হোল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, আমারই চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎ ক্রমে বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আমি বাহ্যজগতের কিছু অংশকে একসঙ্গে যথাস্থানে স্থাপিত ক'রে দেখি; এই হোল দেশব্যাপ্তি। আর কিছু অংশকে যথাকালে পর পর বিন্যস্ত ক'রে দেখি; এই হোল কালব্যাপ্তি। প্রকৃতিতে যে নিয়মের শৃঙ্খলা তা'রও প্রতিষ্ঠাতা আমিই। আমিই নিজের সুবিধার জন্যে এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছি। নিয়ম প্রতিষ্ঠার এই সফলতা ধরেই আমার আত্মবিকাশের পরিমিতি। এই আত্মবিকাশের নামই বিজ্ঞানচর্চা। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, জগৎ অনাদি নয়; আবার কালও অনন্ত নয়। জগতের যেটুকু অংশ যখন আমি দেখছি, সেটুকুর অস্তিত্বই তখন আমার কাছে সত্য। আবার কালের যেটুকু

অংশের সঙ্গে আমার পরিচয়, সেটুকুই আমার কাছে সত্য। এখানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়,

"অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার ; উহা কাব্যে শোভা পায় ; বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই।"

জিজ্ঞাসার 'অমঙ্গলের উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধেও ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে। মঙ্গলের উৎপত্তি বোঝা যায়, কারণ, ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি বোঝা দুরূহ। ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা বললে তাঁর দয়াময়ত্বে সন্দেহ দেখান হয়। অমঙ্গল সৃষ্টির জন্যে শয়তানকে দায়ী করলে ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে সন্দিহান হতে হয়। আবার এজন্যে মানুষকেও দায়ী করা যায় না। এদিকে দায়িত্বশূন্য ইতর জীবের যাতনাভোগের উদ্দেশ্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলতে হয়, 'অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক', স্থূলদৃষ্টিতে যা' অমঙ্গল, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তা'ই মঙ্গল। এই যুক্তিকেই রামেন্দ্রসুন্দর এখানে মেনে নিয়েছেন। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদকে ভিত্তি ক'রে তিনি বলতে চেয়েছেন, জীবসমাজে যে ভয়াবহ জীবন-সংগ্রাম, সবলের অত্যাচার, দুর্বলের নিগ্রহ ও মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়, আপাতঃদৃষ্টিতে তা' অমঙ্গল বলে মনে হলেও এর মূলে মঙ্গলই নিহিত। কারণ, অযোগ্যের বিনাশের মধ্য দিয়েই জীবসমাজের অভিব্যক্তি ঘটছে। জীবের উন্নতির মূলে রয়েছে এই অভিব্যক্তি। এরই ফলে নব নব বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের বিকাশ। ধার্মিক ও দার্শনিকেরা বলে থাকেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই। জীব নিজের মায়া বা ভ্রান্তিবশতঃই অমঙ্গলের অস্তিত্ব কল্পনা ক'রে বিভীষিকা দেখে। জীব যা'কে অমঙ্গল বলে ভাবছে, আসলে তা' মঙ্গল ; যা'কে দুঃখ বলে ভাবছে, আসলে তা' হোল আনন্দ। রামেন্দ্রসুন্দর এই দার্শনিক মতবাদকে মেনে নেন নি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, জীবের উন্নতি বা অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ের মাত্রাই বাড়ছে। এককে ছেড়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গলের আবির্ভাব একই ক্ষণে। জীবনের সঙ্গে মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিবিড় সম্বন্ধ।

'মায়াপুরী' ও 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামক দু'টি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে দর্শন করেছেন। এখানে তিনি দার্শনিকের বিচারভূমিতে দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। 'মায়াপুরী' ১৯১১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১৪) পুনর্মুদ্রিত হয়। 'মায়াপুরী' রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর সমগ্র বিজ্ঞানদর্শনের স্বরূপ এই প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত। এই প্রবন্ধেরই কয়েকটি 'আইডিয়া' পরবর্তী কালে 'বিচিত্র জগৎ'-এর রচনাগুলিতে পরিণতি লাভ করেছে। বিশ্বজগতের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই ; এ জগৎ জীবের খেলায় থেকে উৎপন্ন। এই দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেছেন বলেই বিশ্বজগৎ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এক বিরাট মায়াপুরী। বিজ্ঞানের যাবতীয় কারবার এই মায়াপুরী বা কাল্পনিক জগৎ নিয়ে। অতএব, বিজ্ঞানশাস্ত্রের এখানে গোড়ায় গলদ। বিজ্ঞানের এই গলদ স্বীকার ক'রে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর আলোচনায়

এগিয়েছেন। এ আলোচনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। বস্তুতঃ, দর্শনের ভিত্তির উপর সমগ্র রচনাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞানই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য। প্রথমে বাহ্য-জগতের সঙ্গে জীবদেহের দ্বৈত সম্পর্ক মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, একদিকে বাহ্যজগৎ সর্বক্ষণ জীবকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় আছে। অপর-দিকে বাহ্যজগৎ থেকে উপাদান নিয়েই জীব আপনাকে পুষ্ট করছে। অতএব, বাহ্যজগৎ একদিকে যেমন পরম শত্রু, অপরদিকে তেমনি পরম মিত্রও। জীবদেহের সঙ্গে বাহ্য-জগতের সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে জীবদেহের গঠনবৈচিত্র্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সরস আলোচনা করা হয়েছে। অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীর মতো রামেন্দ্রসুন্দরও জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবেই দেখেছেন। তা' সত্ত্বেও জীবদেহ নয়, জীবন এবং জীবনপ্রবাহই রামেন্দ্র-সুন্দরের কাছে বড়। বিভিন্ন রচনায় তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন, সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে বীজের নবজীবন আরম্ভ হয়; ব্যক্তি যায়, কিন্তু জাতি থাকে। আবার তা'ই যদি হবে তো এককালে যে সব জীব পৃথিবীতে আদৌ ছিল না, কালক্রমে তা'রা কিভাবে আবির্ভূত হোল? রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রশ্নেরও জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন ডারউইনের জীবতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে। তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ত্রুটি কোথায়, এই প্রসঙ্গে তা' নির্দেশ করা হয়েছে। জীবনযুদ্ধে জীব অবিরাম হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ করছে। জীবের কাছে যা' উপাদেয় তা' তা'কে সুখ দেয়। এ হোল প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই পরোক্ষ ফল। কিন্তু এই হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ ক্ষমতায় যে অসঙ্গতি রয়েছে, রামেন্দ্রসুন্দর তা' অতি প্রাঞ্জলভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, এমন অনেক জিনিস আছে যা' জীবনসমরে প্রতিকূল। অথচ স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও জীব সেই জিনিসগুলিকে গ্রহণ করতে চায়। এখানেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের অপূর্ণতা। আলোচ্য প্রবন্ধে জীবের সংস্কার ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সারা জীবনব্যাপী জীবদেহের উপর যে সকল আক্রমণ চলছে, তা' থেকে পরিত্রাণ পেতে হোলে সহজ সংস্কারই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু এমন সব ঘটনাও ঘটে থাকে, জীবের সহজাত সংস্কার যেখানে কোনোরূপ লক্ষ্য নির্দেশ করতে পারে না। আপাততঃ সুখ বলে জীব যা'কে গ্রহণ করে, পরিণামে তা' দুঃখ এনে দেয়। এখানেও লেখক প্রাকৃতিক নির্বাচনের অসম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেখানে সহজ সংস্কার পথ দেখায় না, সেখানে 'বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তি' জীবকে সাহায্য করে। এই বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষতায় মানুষ জীবজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিবৃত্তি আবার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর-শীল। মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবার সুযোগ থাকায় বিজ্ঞানের শক্তিও দিন দিন বাড়ছে। বৈজ্ঞানিক আবার নিজে যা' দেখছেন, তা'ই লিপিবদ্ধ করছেন। কিন্তু বিশ্ব-জগতের অতি সামান্য অংশই বৈজ্ঞানিকের নজরে পড়ে। জগৎতত্ত্বের কয়েকটি গোড়ার প্রশ্নের সদুত্তর আজও পর্যন্ত বিজ্ঞান দিতে পারে নি। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়,

> "জীবনরহিত জড় দ্রব্যে কখন্ কিরূপে জীবনের আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে সুখ-দুঃখের বেদনা-বোধ আবির্ভূত হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন জীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি

লাভ করিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ডারুইনবাদী দেখাইয়াছেন, জীবের জীবন-রক্ষার্থ এই সকল ব্যাপারের আবশ্যকতা আছে ; অতএব জীব যখন জীবন ধারণ করে, তখন তাহাতে এই এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল হয় ও ফলেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু জগদ্‌যন্ত্রকে যন্ত্র হিসাবে দেখিলে ঐ ঐ ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায় নাই।"

'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধে বিজ্ঞানবিদ্যার ত্রুটি আরও স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান যে সব জাগতিক সত্য নিয়ে কারবার করে এবং যা'দের নিরপেক্ষ সত্য বলে নির্দেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তা'রা মনঃকল্পিত সত্য। বিজ্ঞানবিদ্যায় আমরা কেবল কতকগুলো মনগড়া পুতুল তৈরী ক'রে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ঢাকঢোল বাজিয়ে তা'দের পূজা করছি—এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রথমেই রামেন্দ্রসুন্দর সত্যের শ্রেণীবিভাগ ক'রে নিয়েছেন। কতকগুলো সত্য আমরা মানতে বাধ্য। এরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আর কতকগুলো সত্য প্রত্যক্ষ-প্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে আমরা মেনে থাকি। পদার্থবিদ্যার সাহায্য নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে দেখিয়েছেন, দুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হলে তা'রা পরস্পর সমান হবে, ইউক্লিডের শাস্ত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে ও সকল শাস্ত্রে তা' স্বতঃসিদ্ধ নয়। দৈর্ঘ্যের তুলনামূলক বিচারেও এ নিয়মের ব্যত্যয় হতে পারে। লেখকের মতে, স্থানভেদে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনই এজন্যে দায়ী। বস্তুত এখানেও রামেন্দ্রসুন্দর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের মূল আকর্ষণ ক'রে যুক্তির অনুবীক্ষণে সেই স্বতঃসিদ্ধকে বিচার করেছেন। এরপর ভার (Weight) ও বস্তুর (Mass) পার্থক্য আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন, বস্তু অল্প হলে ভার অল্প হয়, এটাও পরীক্ষালব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। জড় পদার্থের উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই, একথাও স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জড়কে অবিনাশী আখ্যা দিয়েছিল। উদাহরণ সহযোগে আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্যার এই সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেছেন। যে ধাক্কা দেবার ও ধাক্কা খাবার শক্তি দিয়ে জড়-পদার্থের জড়ত্ব বা বস্তুর নিরূপণ হয়, তড়িতের সেই শক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। তড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ তাদের জড়ত্ব থাকে না ; যখন বেগে চলে তখনই জড়ত্ব জন্মে। বেগ যত বাড়ে, জড়ত্বও তত বেড়ে যায়। অতএব, বস্তুর পরিমিতি যখন বেগের উপর নির্ভরশীল তখন জড় পদার্থের উৎপত্তি বা ধ্বংস নেই, একথা বলা চলে না। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক জড়-পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না। তাঁরা শক্তিকে স্বীকার করেন। শক্তি অর্থে কাজ করবার শক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্রও শক্তির অবিনাশিতা বা শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ ক'রে থাকে, একথা স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 'অতি সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে' এটিও একটি 'পরীক্ষালব্ধ সত্য'। এতে কোনোরূপ 'স্বতঃসিদ্ধতা' নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে

আমাদের ধারণা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। এদের সাহায্যে বিশ্বজগতের কিয়দংশ মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। জড় ও শক্তি আমাদেরই মনগড়া পদার্থ মাত্র। একটা সংকীর্ণ অর্থে আমরা এদের অবিনাশিতা কল্পনা ক'রে নিয়েছি। বিজ্ঞান যে বিশ্বজগতের কল্পনা ক'রে নেয়, বাস্তব জগতে তা'র কোনো অস্তিত্ব নেই। বৈজ্ঞানিকের এই জগৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে 'বিচিত্র জগৎ'-এ।

'জিজ্ঞাসা'র কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এসে গেছে। 'সুখ না দুঃখ ?', 'সত্য', 'অতিপ্রাকৃত—প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব', 'কে বড় ?' ও 'পঞ্চভূত' এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অবতারণা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কেননা, দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সংমিশ্রণ সকল যুগেই ঘটে থাকে। বিজ্ঞানবিদ্যায় কোনো পরিবর্তন সূচিত হলে দর্শনেও তা'র প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান-সাহিত্যিক স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স বলেছেন,

> "The philosophy of any period is always largely interwoven with the science of the period, so that any fundamental change in science must produce reactions in philosophy."[৭]

রামেন্দ্রসুন্দরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাঁর বহু দার্শনিক প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সাহায্যে মূল সমস্যার উপর আলোকসম্পাত করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'সুখ না দুঃখ ?' শীর্ষক প্রবন্ধটি। এ জগতে সুখ বেশী না দুঃখ বেশী—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক প্রথমেই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এরপর শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের দুঃখবাদ, দার্শনিকদের মুক্তিবাদ এবং কবিদের পরস্পরবিরোধী মতবাদ আলোচনা ক'রে লেখক যে জিজ্ঞাসাটি উত্থাপিত করেছেন তা'তে দুঃখের দিকেই 'বেশী টান' দেখান হয়েছে বলে মনে হয়।

'সত্য' নামক প্রবন্ধটিতে দু' এক জায়গায় দার্শনিক বক্তব্যের মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক মতবাদ এসে গেছে। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা এক হিসাবে সত্য। তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই নিয়মে চলবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের ভূয়োদর্শন অনুযায়ী সত্যের মূর্তিও পরিবর্তিত হয়। এ জগতে নিরপেক্ষ বা ধ্রুব সত্য হোল 'আমি আছি।' আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে আরও যে কয়েকটি সত্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তারা হোল আপেক্ষিক বা ব্যাবহারিক সত্য। আবার ব্যাবহারিক সত্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় হোল প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা। তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই নিয়মে চলবে তা'ও আমরা বলতে পারি নে। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম যখন হবে তখন জগৎযন্ত্র আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের অধীন হবে মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধে দার্শনিক-কল্পনা প্রাধান্য লাভ করলেও যুক্তিজাল বিস্তারের ক্ষেত্রে জায়গায় জায়গায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে।

---

৭ **Physics & Philosophy (1948)—Sir James Jeans : P. 2.**

'অতিপ্রাকৃত' বিষয়ক প্রস্তাব দু'টিতে বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর অতি-প্রাকৃতের মূল অনুসন্ধান করেছেন। প্রথম প্রস্তাবে তিনি বলতে চেয়েছেন, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসও কমে আসছে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, কোনো ঘটনাকে আমরা নিয়মছাড়া বলে থাকি আমাদের অজ্ঞতাবশে। আসলে সে ঘটনা নিয়মছাড়া না-ও হতে পারে। কারণ, বিশ্ব-ব্যাপী প্রকৃতির যেখানে যা' কিছু ঘটছে, সবই প্রাকৃত। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘটনার কার্যকারণসম্বন্ধ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তাঁর মতে, অতিপ্রাকৃত বলে কোনো কিছু থাকতেই পারে না। যে সকল ঘটনাকে আমরা অতিপ্রাকৃত বলে থাকি, মানুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদী বৈজ্ঞানিকের। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 'অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় প্রস্তাব'-এ আরও সুস্পষ্ট। বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে অতি-প্রাকৃতের কারণ নির্ণয় করতে চেয়েছেন এবং বলেছেন, মানুষ জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্যে স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আপনার কল্পিত জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ তখন প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে কোনোরূপ নির্দেশ দেওয়া মানুষের পক্ষে অবৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞানের যেখানে সমাপ্তি, দর্শনের সেখানে সূত্রপাত। এরই একটি সুন্দর নিদর্শন 'কে বড় ?' শীর্ষক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির আরম্ভ বিজ্ঞান দিয়ে। কিছুকাল পূর্বেও বিজ্ঞান স্থির করেছিল, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যে সৃষ্ট। মানুষের উপকারে আসে না, এমন কোনো বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে নেই। কিন্তু কিছুকাল পরে এই বিজ্ঞানই আবার জানাল, বিরাট বিশ্ব-জগতের তুলনায় মানুষ তৃণাদপি ক্ষুদ্র। বিশ্বজগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কিনা তা' মীমাংসার জন্যে লেখক প্রথমে বিজ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপকরণ খুঁজেছিলেন ডারউইন, লাপ্‌লাস্ প্রভৃতির কাছে। কিন্তু বিজ্ঞানের পরস্পর-বিরোধী মতবাদ এ প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম। লেখক তাই দার্শনিক মীমাংসার পথ খুঁজলেন, এবং জানলেন, জগৎ অসীমও নয়, অনাদিও নয় ; মানুষই এই কাল্পনিক অনন্ত জগৎ ও অনাদি কালের সৃষ্টি ক'রে এই কাল্পনিক বৃহত্ত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে ক'রে প্রতারিত হয়। দার্শনিক তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলেছেন, এই জগৎ মানুষের অন্তরে। অন্তরের জগৎকে বাইরে প্রক্ষেপ ক'রে মানুষই এই জগতের সৃষ্টি করেছে। মানুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের পরিধিও বিস্তৃততর হচ্ছে। অতএব 'কে বড় ?' এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাই থেকে গেল।

'পঞ্চভূত' শীর্ষক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ পাশাপাশি আলোচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, দার্শনিকদের মতে জগৎ পাঁচটি ভূতে নির্মিত। আর বৈজ্ঞানিক-দের মতে জগৎ আশীটি এলিমেণ্টে নির্মিত। তাই বলে দর্শন ও বিজ্ঞানে কোনো বিরোধ নেই। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতেই শুধু পার্থক্য। উভয়েই জগৎকে বিশ্লেষণ ক'রে জগতের মূল

উপাদানগুলো নির্ণয় করবার চেষ্টা করেন। আর দার্শনিকের কাছে বাহ্যজগতের যাবতীয় পদার্থ কতিপয় রূপ-রসাদির সমষ্টি মাত্র। এই রূপ-রসাদি বাদ দিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এদেশীয় দার্শনিকদের মতো ইউরোপীয় দার্শনিকরাও ভৌতিক পদার্থকে বিশ্লেষণ ক'রে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই পান না। এদিক থেকে উভয় দেশের দার্শনিকদের মধ্যে মিল রয়েছে। সাংখ্য ও বেদান্তের বিশ্লেষণপ্রণালীও প্রায় একই রকম। উভয়েই বাহ্যজগৎকে পঞ্চভূতে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের পঞ্চভূত এবং বেদান্তদর্শনের 'সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূত'—সবই মনঃকল্পিত সংজ্ঞা মাত্র। বাস্তবজগতে এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ধরনের মনঃকল্পিত সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানকেও কারবার করতে হয়, লেখক একথা স্পষ্ট করেই বলতে চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিকের 'perfect solid', 'perfect fluid' ইত্যাদির অস্তিত্ব বাস্তবজগতে নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেও এভাবে যুক্তির অসমতলে দাঁড় করাবার ফলে কোনো শাস্ত্রের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় নি বটে, তবে বৈজ্ঞানিকের এলিমেণ্টের ত্রুটি কোথায় এবং মনঃকল্পনাই বা কোনখানে, তা' আরও খোলসা ক'রে বলা উচিত ছিল।

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানদর্শন এবং বৈজ্ঞানিকতত্ত্বনির্ভর দর্শন—এই তিন পর্যায়ের রচনা ছাড়া আর এক শ্রেণীর রচনা জিজ্ঞাসায় আছে। এরা বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বনিরপেক্ষ দার্শনিক প্রবন্ধ। 'জগতের অস্তিত্ব', 'আত্মার অবিনাশিতা', 'এক না দুই ?', 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' এবং 'মুক্তি' এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলোতে বেদান্তদর্শন প্রাধান্য লাভ করলেও এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় দর্শনেই রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে 'ফলিত জ্যোতিষ' জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কিছুটা খাপছাড়া বলেই মনে হয়। তবে এ থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। যা' প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, রামেন্দ্রসুন্দর তা'কে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করেন নি। ফলিত জ্যোতিষ গণনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আজও পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে নি। ফলিত জ্যোতিষ তাই রামেন্দ্রসুন্দরের মতে বিজ্ঞান নয়। জ্যোতিষ নিয়ে ইতিপূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর আরও দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধ দু'টি 'প্রাচীন জ্যোতিষ' এই শিরোনামায় 'প্রকৃতি'তে সংকলিত হয়েছে। এই দু'টি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, প্রাচীন জ্যোতিষের গাণিতিক অংশের (গণিত জ্যোতিষ) প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের শ্রদ্ধা ছিল।

'জিজ্ঞাসা' রামেন্দ্রসুন্দরের এক অনবদ্য সৃষ্টি। দার্শনিকের বিচারভূমিতে বসে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ধারণ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি। জগৎরহস্যের উত্তর দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে এরূপভাবে কাজে লাগাতেও ইতিপূর্বে আর কারও রচনায় দেখা যায় নি। শুধু ভাবের দিক থেকেই নয়, ভাষার দিক থেকেও গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জিজ্ঞাসার ভাষার গাম্ভীর্য ও বলিষ্ঠ বাঁধুনি উচ্চাঙ্গের বাংলা গদ্যের নিদর্শন। দুরূহ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশে বাংলা ভাষার যে ক্ষমতা রয়েছে, এই গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর তা' প্রতিষ্ঠিত করলেন। তা' সত্ত্বেও তত্ত্ব নয়, সাহিত্যই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। এর মূলে ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের প্রকাশভঙ্গীর সারল্য ; আর

ছিল তাঁর সৌন্দর্য-রসিক মন। তাই দেখা যায়, জায়গায় জায়গায় তত্ত্বাদি ছাড়িয়ে লেখকের সৌন্দর্যপ্রীতি বড় হ'য়ে উঠেছে। যেমন,

> "আকাশ নীল না হইয়া পীত হইলে কি ক্ষতি হইত, তত্ত্বান্বেষীরা স্থির করিয়া বলিয়া দিবেন। আমরা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেই নীল রূপে বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসুধা পান করিতে থাকিব। এই আমাদিগের পরম লাভ।"

(জিজ্ঞাসা : বর্ণতত্ত্ব)

সূক্ষ্ম বিদ্রূপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যের নগ্ন প্রকাশ রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য। 'প্রকৃতি'তে তা'র পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এ বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন এখানেও মেলে। যেমন,

> "যাহাদের সুখলাভের ও দুঃখ-পরিহারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই প্রকৃতির পাঠশালা হইতে পাস করিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া লক্ষ পুরুষের গলা-টেপার পর জীবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।"

(জিজ্ঞাসা : মায়াপুরী)

৬

রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বিচিত্র জগৎ' লেখকের মৃত্যুর পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে সংকলিত সবগুলি প্রবন্ধই ১৩২১ থেকে ১৩২৪ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্র জগৎ'-এর প্রবন্ধগুলির মধ্যে চিন্তার ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে জড় থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে লেখকের চিন্তা অভিসারে বেরিয়েছে। বিজ্ঞানবিদ্যার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য ক'রে 'জিজ্ঞাসা'য় লেখকের মনে খট্‌কা লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা যে জগতের কল্পনা করেন, তা' প্রকৃত জগতের 'একটা মনগড়া আদর্শ বা মডেল মাত্র।' বৈজ্ঞানিকের এই মনগড়া জগতে জীবের ও জড়ের মধ্যে এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে 'যে প্রাচীরের ব্যবধান', তা' আজও পর্যন্ত লুপ্ত হয় নি। বিজ্ঞান আজও পর্যন্ত বিশ্ব-জগৎকে ঐক্যের বাঁধনে বাঁধতে পারে নি। 'বিচিত্র জগৎ'-এর পরিকল্পনার মূলে বিজ্ঞান-বিদ্যার এই অসম্পূর্ণতাই দায়ী। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বৈজ্ঞানিকের জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা ক'রে জড় ও প্রাণের মধ্যে সম্বন্ধ কি এবং প্রাণের ধর্ম কি, তা' নির্ণয় করতে চেয়েছেন। যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, এখানে তার সমাধান আশা করা যায় না। কিন্তু সমস্যার সমাধানকল্পে রামেন্দ্রসুন্দর যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগৎপ্রবাহের উৎস সন্ধানে বেরিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তা' অভিনব ও একক। আলোচ্য গ্রন্থে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণপ্রণালী ও সরস বিচারভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, ইংরেজী সাহিত্যেও তা'র তুলনা মেলা ভার।

'বিচিত্র জগৎ'-এ প্রথমেই রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিকের জগতের স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগৎ'-এ এই আলোচনা

সুরু করা হয়েছে 'Mental and Moral Science' নামক গ্রন্থে Bain সাহেবের একটি উক্তিকে কেন্দ্র ক'রে। উক্তিটি হোল, "In regard to the object properties, all minds are affected alike—in regard to the subject-properties, there is no constant agreement." "বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের বিচিত্র দর্শনপ্রকৃতি আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, Bain-এর এই উক্তির প্রথমাংশ অর্থাৎ, "In regard to the object properties, all minds are affected alike"—একথা স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, প্রকাশভঙ্গীর সরসতা এবং সূক্ষ্ম বিচার-প্রণালীর দিক থেকে তা' অনবদ্য। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে দর্শনকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন। Bain-এর উক্তির দ্বিতীয়াংশ প্রকারান্তরে তিনি মেনে নিয়েছেন।

বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহ্য জগতের আলোচনা করতে গিয়ে দু'ধরনের জগতের কথা রামেন্দ্রসুন্দর বললেন। এক হোল 'ব্যাবহারিক জগৎ'; অপরটি হোল 'প্রাতিভাসিক জগৎ'। পৃথিবীর সাধারণ লোক দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যে যে জগৎকে মেনে নেয়, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে তাই হোল 'ব্যাবহারিক জগৎ'। এই ব্যাবহারিক জগতের স্বরূপ হোল কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতের গড়। রামেন্দ্রসুন্দর বার বার বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞানবিদ্যায় এই সাধারণ বা মাঝারি মানুষদের সাক্ষ্য ও অভিজ্ঞতারই দাম বেশী। তা' ছাড়া এই মাঝারি মানুষরাই জীবনসংগ্রামে সবচেশে বেশী কৃতকার্য। কবি ও ভাবুকদের অভিজ্ঞতার এখানে কোনো দাম নেই। জীবনসংগ্রামে এরা কৃতকার্য হন না। বৈজ্ঞানিকের জগতের সঙ্গে এদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার কোনো মিলও নেই। স্বাতন্ত্র্য বর্জন ক'রে সাধারণ মানুষের সচরাচর দৃষ্ট অভিজ্ঞতা থেকেই এই ব্যাবহারিক জগতের সৃষ্টি। ব্যাবহারিক জগতে নিজস্ব অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। নিজেদেরই সুবিধার জন্যে সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতাকে এখানে মেনে নিতে হয়। কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই প্রাতিভাসিক জগতের সৃষ্টি। আর যে জগৎ যা'র কাছে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয়, সে জগৎ-ই হোল তা'র পক্ষে 'প্রাতিভাসিক জগৎ'। এ জগৎ প্রত্যেকের কাছে নিজস্ব সত্য। কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ হোল কোটি কোটি সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার গড়। কিন্তু এই যে 'Normal Man' বা 'Mean Man,'—এর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। পরবর্তী প্রবন্ধ 'ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ'-এ রামেন্দ্রসুন্দর একথা বোঝাতে চেয়েছেন। আমরা নিজেদের জীবনধারণের সুবিধার জন্যেই এক কাল্পনিক ব্যাবহারিক জগতের অনুবর্তী হয়ে চলি; জীবনযাত্রার সুবিধার জন্যেই ব্যাবহারিক জগতে 'Uniformity of Nature' মেনে থাকি। নিজেদের সুবিধার খাতিরেই ব্যাবহারিক জগতে এই নিয়মের বন্ধন দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানবিদ্যা ব্যাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনাকে কতকগুলি সূত্রে আবদ্ধ করে। এই যে কার্যকারণ সম্পর্ক (causal connection), এটা প্রকৃতই আবশ্যকীয় কিনা ("অবশ্যম্ভাবী necessary বটে কি না") এ নিয়ে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনা থেকে এই বিতর্কের উপর একটা 'নূতন attitude'-এর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলতে চেয়েছেন, এই নিয়মের বন্ধন ব্যাবহারিক জগতে 'necessary" এই অর্থে যে একে না মানলে আমাদের জীবনযাত্রা চলত না। প্রাণের দায়ে এই কার্যকারণ সম্পর্ক মেনে নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি—এই অর্থে এটা 'necessary'। এই necessity-কে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন 'ব্যাবহারিক সত্য' বা 'Pragmatic Truth'। 'Causality' বা 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' প্রকৃতই অত্যা-বশ্যকীয় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎকে পাশাপাশি রেখে উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনা থেকেও একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় জগতের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাতিভাসিক বহির্জগৎ ও ব্যাবহারিক বহির্জগৎকে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। প্রাতিভাসিক বহির্জগৎ প্রত্যেকের কাছেই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শরূপে উপস্থিত হয়। এই জগৎ সত্য এবং প্রত্যক্ষ। আমাদের মনে হয়, যেন এই রূপ-রস ইত্যাদি বাইরে থেকে আসছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রাতিভাসিক জগৎ তার নিজস্ব। যত মানুষ, প্রাতিভাসিক জগতের সংখ্যাও তত। কিন্তু ব্যাবহারিক জগৎ হোল বহুসংখ্যক প্রাতিভাসিক জগতের গড় এবং ব্যাবহারিক জগতের সংখ্যা একটি মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দর বার বার বোঝাতে চেয়েছেন, এই ব্যাবহারিক জগৎ কল্পিত, বৈজ্ঞানিকদের মনগড়া। প্রাতিভাসিক জগৎই প্রত্যক্ষলব্ধ। দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালাবার সুবিধার জন্যে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কেটেছেঁটে আমরা এই ব্যাবহারিক জগতের সৃষ্টি করেছি। এই জগতে জীবনরক্ষার জন্যে দায়ে পড়ে আমরা কতকগুলো নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছি। এই নিয়মই হোল 'Causality বা Uniformity of Nature'। এই 'Causality' বা 'কার্যকারণ সম্বন্ধ'কে 'প্রাণের দায়ে' আমরা স্বীকার ক'রে নিই। অতএব, ব্যাবহারিক জগতে এক অর্থে এরা 'Necessary'। কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে এরা কোনোমতেই 'Necessary' নয়। কেননা, প্রাতিভাসিক জগতে কোনোরূপ কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। প্রাতিভাসিক জগতে নিয়মের অস্তিত্ব কোনোমতেই 'Necessary' নয়। কেননা, এই জগতে একটার পর একটা ঘটনা আসতে কোনোমতেই বাধ্য নয়। অতএব, এই জগতে 'Uniformity of Nature' বা কার্যকারণ সম্বন্ধের একান্ত অভাব। প্রাতিভাসিক জগৎই 'Real' এবং ব্যাবহারিক জগৎই 'Unreal'। বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে বসে উভয় জগতের এই পার্থক্য নির্দেশ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে দার্শনিকদের চিরন্তন সমস্যা determinism এবং necessity-র সমাধান করতে চেয়েছেন।

'বিচিত্র জগৎ'-এ রামেন্দ্রসুন্দর যে তৃতীয় জগতের কথা বললেন তা' হোল 'বাঙ্ময় জগৎ।' বাঙ্ময় অর্থে বাক্যময় জগৎ। এ জগৎ 'concept'-এ তৈরী। 'concept'-এর কোনো বস্তুই কোনোকালে প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় না। 'concept' মানুষের মনগড়া পদার্থ। অন্তরের প্রজ্ঞা বিভিন্ন 'concept'-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করছে। এই হোল মনন-কর্ম। এই মনন-কর্মকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে গেলে তা'কে বাক্যরূপে

বা শব্দরূপে প্রকাশ করতে হয়। সেই শব্দ বা বাক্য হোল 'concept'-এর সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাগুলোকে অনেক সময় বাইরে প্রকাশের দরকার হয় না; অন্তরের মধ্যেই এরা থেকে যায়; অন্তরেই এক নতুন জগতের সৃষ্টি করে। এই জগৎ কোনোকালেই কারও প্রত্যক্ষগোচর হয় না। প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের 'প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য রূপ' আছে। ওটা 'রূপময় জগৎ'। কিন্তু এই 'conceptual world' রূপ-রস-গন্ধ বর্জিত। এ জগৎ কোনোকালেই মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচর হয় না। এ জগতের পদার্থগুলো সংজ্ঞামাত্র—নামমাত্র। এই হোল 'বাঙ্ময় জগৎ'। এ জগতের সৃষ্টিকর্তা মানুষের প্রজ্ঞা। বৈজ্ঞানিক অসংখ্য লোকের সাক্ষ্যের গড় নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের যে সাধারণ সূত্র তৈরী করেন, রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, তা'ও একটা বিবরণ বা বাক্য মাত্র। এই বিবরণ 'conceptual terms'-এ তৈরী। বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন 'concept'-এর বিভিন্ন নামকরণ করেন। 'concept' বা সংজ্ঞা-গুলো হয় সংক্ষিপ্ত, সূত্রাকারে নিবদ্ধ। এই সূত্রগুলি বৈজ্ঞানিকের মনোজগতে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী এরা তাদের বাইরে প্রকাশ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক যে ব্যাবহারিক জগতের সন্ধানে বের হন, তা'কে ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনোদিনই ধরা যায় না। অগত্যা দশজন লোকের সাক্ষ্য মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক একটা মনগড়া জগতের সৃষ্টি করেন। এই জগৎ সংজ্ঞায় তৈরী, বাক্যে তৈরী—এই হোল 'বাঙ্ময় জগৎ'। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, এই অমূর্ত জগৎ নিয়েই বিজ্ঞান-বিদ্যার কারবার; ইন্দ্রিয়ের অগোচর এই অপ্রত্যক্ষ জগৎকেই বিজ্ঞানবিদ্যা 'জড়-জগৎ' আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু এই জড়-জগতের সর্বত্রই ফাঁকি বা গলদ রয়েছে। 'জড়-জগৎ' নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্যার এই ফাঁকি ধরবার চেষ্টা করছেন। এই প্রবন্ধটিকে জিজ্ঞাসার 'মায়াপুরী' ও 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামক প্রবন্ধ দু'টির ক্রমপরিণতি বলা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বিজ্ঞানবিদ্যার এমন কয়েকটি অসম্পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা করেছেন যা' বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছে। প্রথমেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বাহ্যজগতের 'কল্পিত প্রতিমা', যা' নিয়ে বাঙ্ময় জগৎ গঠিত, বৈজ্ঞানিকরা তা'কেই বলেন জড়-জগৎ। কিন্তু এই জগৎ একটা কৃত্রিম বস্তু। প্রত্যক্ষ জগতে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। অতএব, বিজ্ঞানবিদ্যার গোড়াতেই গলদ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের পরিমাপ-পদ্ধতিতেও বিরাট ফাঁক রয়েছে। পরিমাপ-পদ্ধতিতে এই যে গলদ, এ থেকে বিজ্ঞান-বিদ্যায় 'paradox'-এর সৃষ্টি। বিচারকের নিরপেক্ষ ভূমিকায় বসে বিজ্ঞানবিদ্যার এই 'paradox' নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যথাসম্ভব বর্জন ক'রে বাহ্য-জগতের বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন; রূপ-রস ইত্যাদির সাহায্য না নিয়ে বাহ্য-জগৎকে দেখতে চান। এর কারণ, সকলের ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমান নয়; আবার অবস্থাভেদে একই পদার্থ এক একজনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকম মনে হতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা তাই পরিমাপের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু পরিমাপ করতে গিয়ে জড়পদার্থের যে মুখ্য লক্ষণ 'inertia', তা'র যথার্থ শক্তি নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কোনো বস্তুর 'inertia' তা'র বেগের উপর

নির্ভরশীল। বেগ বাড়লে 'inertia' বাড়ে; আবার বেগ কমলে 'inertia' কমে। অতএব, কোনো বস্তুর 'inertia' বা জড়ত্ব নির্ণয় করতে গেলে এই বেগের পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়। আধুনিক জড়বিজ্ঞান সকল পদার্থকেই 'length'-এ পরিণত ক'রে সেই 'length'-এর পরিমাণ নির্ণয় ক'রে থাকে। কিন্তু যে বস্তুর [যেমন, 'গজকাঠি'] সাহায্যে এই 'length'-এর পরিমাণ মাপা হয়, স্থানভেদে তা'র দৈর্ঘ্য ভিন্নরূপ হয়ে থাকে এবং দৈর্ঘ্যের কতটুকু পরিবর্তন হয়, তা' সঠিক জানবার কোনো উপায়ই নেই। অতএব, *দৈর্ঘ্য ও দূরত্বের পরিমাপে এরূপ গলদ থাকায় বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলই শিথিল হয়ে পড়ে।* কালের পরিমাপেও সমস্যা। আলোক সেকেণ্ডে প্রায় 'এক লক্ষ নব্বুই হাজার মাইল' যায়। বিজ্ঞানবিদ্যায় একেই বলা হয় 'absolute velocity'। আলোকের চেয়ে বেশী বেগ কোনো বস্তুরই হতে পারে না। কিন্তু দু'টো ইলেক্‌ট্রন—যাদের প্রতি সেকেণ্ডে গতি লক্ষ মাইল, এরা যদি পরস্পর উল্টোমুখে চলে, তবে এদের আপেক্ষিক বেগ দাঁড়াবে দু'লক্ষ মাইল। অতএব, মনে হতে পারে যে, আলোর বেগকে ইলেক্‌ট্রন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে তা' নয়। স্থানভেদে ঘড়ির সময়ের তারতম্য হয়। যে সময়কে এক সেকেণ্ড বলে মনে হচ্ছে, আসলে সে সময়টুকু হয়তো এক সেকেণ্ডের চেয়ে দীর্ঘ। অতএব, দেশ ও কালের পরিমাপে কোনোরূপ বাঁধা 'standard' নেই। আমরা দায়ে পড়েই এই 'standard' মেনে থাকি। বিজ্ঞানবিদ্যার মূলের কথা দেশ ও কালের পরিমাপে এই গলদ দেখিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছেন।

পরবর্তী প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিকের আকাশ'-এ রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তা আরও সম্প্রসারিত। বৈজ্ঞানিকের জগৎকে এখানে তিনি বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকের আকাশ অর্থে বিজ্ঞানের আলোচ্য বাহ্যজগৎ; এই জগৎ আকাশ জুড়ে অবস্থিত। দর্শনের বিচার-ভূমিতে দাঁড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকের এই আকাশ 'মনগড়া —কাল্পনিক'। বাহ্যজগৎ যে মূর্তি নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তা'ই হোল আমাদের প্রত্যক্ষ আকাশ। এই প্রত্যক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ ও বিষমাকার। আমরা প্রত্যেকের অনুভূতি অনুযায়ী এই আকাশকে নিজের মতো ক'রে গড়ে নিয়েছি। বিজ্ঞান অসংখ্য প্রত্যক্ষ আকাশের সাধারণ অংশ অবলম্বন ক'রে একটা আকাশ কল্পনা করে। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই আকাশ বৈজ্ঞানিকের 'মনগড়া'—conceptual আকাশ। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষমাকার আকাশকে বৈজ্ঞানিক সমাকার বলে ধরে নেন। তারপর তা'তে ইলেক্‌ট্রন ও ঈথার বসিয়ে সেই আকাশকে বিষমাকৃতি প্রদান করেন। বৈজ্ঞানিক অসংখ্য জড় দ্রব্যে আকাশকে চিহ্নিত করেন। জড় দ্রব্যের মুখ্য লক্ষণ হোল 'inertia'। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এই inertia-ই একটা 'সংজ্ঞা বা concept'; এর কোনো 'resistance' নেই। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 'resistance'—যা' থেকে বস্তুসত্তার অনুভূতি, তা' হোল চেতন জীবের অনুভূত সত্য পদার্থ। বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় এই 'resistance'-এর কোনো স্থান নেই। অথচ এই 'resistance'-ই হোল প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক বা প্রত্যক্ষ জগতের অন্তর্গত সত্য বস্তু। চেতন জীবের কাছে রূপ-রসাদির অতিরিক্ত 'প্রত্যক্ষ বিরোধের' বা 'resistance'-এর অনুভূতিই জড়

পদার্থের সর্বপ্রধান লক্ষণ। কিন্তু বিজ্ঞান সকল প্রকার প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জন ক'রে 'extension' এবং 'motion' এই দুই মনগড়া 'Concept'-এর সাহায্যে জড় পদার্থের বিবরণ দিয়ে থাকেন। বিজ্ঞানের বাঙ্ময় জগতে 'resistance'-এর কোনো অস্তিত্ব নেই। জড়-জগতের অস্তিত্বের মূলে তবে কি? জগৎপ্রবাহের রহস্যসন্ধানে বেরিয়ে এরও উত্তর দেবার চেষ্টা রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন। আমাদের জীবনযাত্রায় যে প্রত্যক্ষ 'বিরোধের অনুভূতি' সেই অনুভূতিকে ভিত্তি ক'রেই বৈজ্ঞানিকের বাহ্যজগৎ ও জড়জগতের সৃষ্টি। এই জড়জগৎ বহু জীবের অস্তিত্ব থেকে কল্পিত। জীবের পরস্পর আদানপ্রদান ও বিরোধ থেকেই এই জগতের বিষমাকৃতি। এই বিরোধই প্রত্যক্ষ বাহ্যজগতে বস্তুরূপে কল্পিত হয়। বিরোধের মূলে রয়েছে প্রাণ। আদানপ্রদান ও বিরোধের সৃষ্টি প্রাণই ক'রে থাকে। রামেন্দ্রসুন্দর এবার প্রাণের রহস্য-সন্ধানে বেরোলেন।

'প্রাণময় জগৎ'-এ তিনি প্রাণের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করেছেন। প্রাণ-পদার্থেব সম্বন্ধে পরস্পর বিবোধী মতবাদ আলোচনা ক'রে এবং প্রাণ ও জড়ধর্মের তুলনা ক'বে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, প্রাণেব এমন কোনো বিশিষ্টতা আছে কিনা, যা' স্বভাবতঃই জড়ধর্ম থেকে পৃথক। বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সাহিত্যিকের সরস বর্ণনাভঙ্গী তাঁর এই আলোচনাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

অনন্ত রহস্যাবৃত প্রাণতত্ত্বেব আলোচনা রামেন্দ্রসুন্দর সুরু কবেছেন একেবারে গোড়া থেকে—প্রাণিদেহের উপকরণ প্রোটোপ্লাজম্ বা প্রাণিপদার্থ থেকে। এই প্রোটোপ্লাজম্ কী, প্রথমে তা' বুঝিয়ে তিনি বলেছেন, প্রোটোপ্লাজম্ তৈরীর ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রাণিদেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ 'Vitalist' বা 'প্রাণবাদী' এবং 'Mechanist' বা 'জড়-বাদী বা যন্ত্রবাদীদের দ্বন্দ্বের কথা এসে গেছে। 'Mechanist'-রা বলছেন, প্রাণিদেহ একটা যন্ত্র মাত্র। সৌরজগৎ যেমন 'Mechanics'-এর আয়ত্ত হয়েছে, দেহযন্ত্রও হয়তো সেরূপ 'Mechanics'-এব আয়ত্তে আসবে। কিন্তু যাঁবা 'Vitalist' তাঁরা বলেন, মানুষ বুদ্ধিবলে কোনোকালেই প্রোটোপ্লাজম্ তৈবী করতে পারবে না। প্রাণ বা 'life' হোল এক অপরূপ পদার্থ; এর মূলে রয়েছে 'Vital force'; এ বস্তু কোনোকালেই প্রজ্ঞার বশ্যতা স্বীকার করবে না। প্রসঙ্গতঃ সৃষ্টিতত্ত্ব (Creation) এবং অভিব্যক্তিবাদের (Evolution) বিরোধটিও রামেন্দ্রসুন্দব অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। সৃষ্টি-তত্ত্ববাদীবা 'Nothing' থেকে 'Something'-এব উৎপত্তিতে, অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যার আশ্রয়স্থল অভিব্যক্তিবাদের মতে অভাব থেকে ভাব হয় না। যা' ছিল, তা'ই থাকে; শুধুমাত্র মূর্তি রূপান্তরিত হয়। অভিব্যক্তিবাদকে নিয়তি বা Uniformity of Nature বা কার্যকারণ সম্বন্ধের শৃঙ্খলা স্বীকার করতে হয়। বৈজ্ঞানিকরা প্রাণের সমস্যার ক্ষেত্রে কার্যকারণশৃঙ্খলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, পূর্বে কি ঘটনাচক্রে এবং কিরূপে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল, তা' যদি একবার জানা যায়, তবে তাঁরাও প্রাণের সৃষ্টি করতে পারবেন। অর্থাৎ, প্রাণের সমস্যাকে বৈজ্ঞানিকরা চাইছেন 'formula'-য় ফেলতে। অপরপক্ষে, 'Creation'-বাদীরা বলছেন, প্রাণতত্ত্ব

কোনোকালে formula-য় আবদ্ধ হবার নয়। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে বিচারপ্রণালী অনুসরণ করেছেন, 'attitude' বা দৃষ্টিকোণের দিক থেকে তা' অনবদ্য। তাঁর মতে, এই বিরোধের মীমাংসা করতে গেলে প্রথমেই খুঁজে দেখতে হয়, প্রাণপদার্থ পুরোপুরিভাবে 'Uniformity of Nature' মেনে চলে কি না। যদি না চলে, তবে প্রাণীর আবির্ভাবের মূলে একটা 'Creation বা Vital force' স্বীকার করতে হয়। জড়পদার্থ 'Uniformity of Nature' মেনে চলে। এখন দেখতে হয়, প্রাণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি না, যা' জড়ধর্ম থেকে পৃথক; যে ধর্মকে জড়-পদার্থের ধর্মের ন্যায় 'formula'-য় বাঁধা যায় না। জড় ও প্রাণের ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর উভয়ের চিরন্তন বিরোধের চিত্রটি অতি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। প্রাণ চাইছে জড়-জগৎকে আত্মসাৎ ক'রে প্রাণময় জগতে পরিণত করতে। অপরপক্ষে জড় চাইছে প্রাণি-পদার্থকে জড়পদার্থে পরিণত করতে। জড়পদার্থের উপাদেয় অংশ অবিরাম প্রাণি-পদার্থে পরিণত হচ্ছে। অপরদিকে প্রাণি-পদার্থের নিয়তই জড়-পদার্থে রূপান্তর ঘটছে। প্রাণকে শেষ পর্যন্ত জড়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। এই পরাজয় স্বীকারের নাম মৃত্যু। প্রাণ পরাজয় স্বীকার করলেও প্রাণের প্রবাহ কোনো-কালেই লুপ্ত হয় না। জড়পদার্থের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেও প্রাণের চেষ্টার অন্ত নেই এবং এই হোল প্রাণের একমাত্র চেষ্টা। অবএব, প্রাণ ঘোর স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতাই প্রাণের বৈশিষ্ট্য। প্রাণ চাইছে সমস্ত জগৎকে প্রাণময় করতে; আর জড়জগৎ চাইছে প্রাণপদার্থকে জড়পদার্থে পরিণত করতে। জড়ের সঙ্গে প্রাণের এই যে চিরন্তন বিরোধ,—এইখানেই প্রাণের বিশিষ্টতা। প্রাণ যে জড়কে প্রাণপদার্থে পরিণত করতে চায়, এর মধ্যে যেন একটা লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে। যেভাবে চললে প্রাণের আত্মরক্ষার সুবিধা, প্রাণ সেভাবেই চলে। কিন্তু জড়ের আত্মরক্ষার সেরূপ কোনো চেষ্টা নেই। এ ব্যাপারে জড় একেবারে উদাসীন, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন। এ ছাড়া প্রাণের রয়েছে ইতিহাস। অতীতের সমস্ত নিদর্শন কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ চলে। কিন্তু জড়ের কোনো ইতিহাস নেই। জড় চিরপুরাতন। কিন্তু প্রাণ নিত্য নূতন পথে চলেছে।

প্রাণের ন্যায় জড় দ্রব্যেও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ রয়েছে বটে। কিন্তু এই বিরোধ 'formula'-বদ্ধ—বাঁধাধরা। প্রাণীর ন্যায় জড় দ্রব্যেও বাছাই করবার একটা শক্তি দেখা যায়। এই শক্তি 'formula'-বদ্ধ; কার্যকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। জড়ের সঙ্গে জড়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কোনোরূপ বৈচিত্র্য নেই। এ যেন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। এই নিয়মশৃঙ্খলার বেড়াজালে জড় চাইছে প্রাণের প্রবাহকে রুদ্ধ করতে। কিন্তু প্রাণ কোনো-রূপ বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ না হয়ে চিরন্তন বেগে বয়ে চলেছে। রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণের এই বাঁধনহীন প্রবাহের বর্ণনা দিয়েছেন কবিত্বময় ভাষায়—

> "জড় অবিরাম নিয়মের বাঁধ বাঁধিয়া আপনার পাষাণ তটের মধ্যে প্রাণের স্রোতকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহ বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কূল ছাপাইয়া, দুই কূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কখন্ কোন পথে চলিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রাণের এই উচ্ছ্বাস বেগবান্

তরঙ্গিত, আবর্ত্তসঙ্কুল, ফেনিল। জড়কে ইহা যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐরাবতের বিশাল দেহ গঙ্গার স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছে।"

পরবর্তী প্রবন্ধ 'প্রাণের কাহিনী'-তে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণের যে কথা বর্ণনা করেছেন তা' হোল প্রাণের বিরোধের কাহিনী—জীবনযুদ্ধের কাহিনী। এই বিরোধের উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রারম্ভে রামেন্দ্রসুন্দর জগৎতত্ত্বের একটি গোড়ার প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খাঁটি বৈজ্ঞানিকের।

কোষ স্বতঃই কেন আপনাকে দ্বিখণ্ডিত করছে, প্রাণি-পদার্থ একটা বিরাট দেহ ধারণ না ক'রে কেন কোটি কোটি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করছে, এ হোল জগৎরহস্যের গোড়ার প্রশ্ন। জীবনের ইতিহাসকে একটা বিরোধের ইতিহাস বলে উল্লেখ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বিরোধ আছে বলেই জীবনও আছে। প্রাণি-পদার্থ যদি কোটি কোটি খণ্ডে বিভক্ত না হোত, তা' হলে এই বিরোধই থাকতো না। প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে জীবনের অস্তিত্বও থাকতো না। তিনি বলতে চেয়েছেন, চেতন জীবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা আদানপ্রদানের খাতিরেই জড়জগৎ ও প্রাণজগৎ আপনাদের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত ক'রে নিয়েছে। এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধ এ শুধু প্রাণী বনাম জড়েই সীমিত নয়; প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীরও চিরন্তন বিরোধ চলেছে। এই বিরোধই হোল জীবনসংগ্রাম। জীববিজ্ঞানীর চশমা চোখে পরে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলেছেন, জীবনসংগ্রামের সুবিধার জন্যেই স্বতন্ত্র কোষগুলো জমাট বেঁধে বড় বড় প্রাণিদেহ নির্মাণ করেছে। জগৎজোড়া জীবনসংগ্রামের স্বরূপ আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর অতি প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাণীর সঙ্গে জড়ের বিরোধ। তা' ছাড়া বিরোধ প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর। প্রাণিজগতে বিরোধের আবার বিভিন্নতা আছে। উদ্ভিদের সঙ্গে জন্তুর বিরোধ এবং জন্তুর সঙ্গে বিরোধ জন্তুর। তা' ছাড়া একই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও চলেছে চিরন্তন বিরোধ। কিন্তু জগৎজোড়া এই বিরোধের মধ্যে থেকেও প্রাণের প্রবাহ বিনষ্ট হচ্ছে না। বংশানুক্রমের মধ্য দিয়ে 'ব্যতিক্রম' বা 'Variation'-এর সৃষ্টি ক'রে প্রাণ আপনাকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করছে। এই 'Variation' থেকেই প্রাণিজগতে বিচিত্র উপজাতির উদ্ভব। 'Variation'-কে সূত্রে বাঁধতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন বটে; কিন্তু আজও পর্যন্ত কেউই কৃতকার্য হন নি। এখানে প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করতে হয়। প্রাণের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হোল 'irreversibility'। উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, খাঁটি জড় মাত্রেই 'reversible'; অর্থাৎ, জড়পদার্থের সমস্ত আচরণই পাল্টানযোগ্য। কিন্তু প্রাণের আচরণকে পাল্টান যায় না। নব নব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ক'রে প্রাণ অবিরাম চলছে। প্রাণ একবার যে পথে চলে সে পথে আর কোনোদিনই ফিরে আসে না। চলার পথে প্রাণ পুরাতনের সঙ্গে নূতনকে সংযুক্ত করে; অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি বা সৃষ্টি করে। প্রাণের নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে। অতীতের সমস্ত ঘটনা বয়ে নিয়ে প্রাণ নিত্য নূতন পথে চলে। চলার পথে প্রাণের রয়েছে স্বাধীনতা। কিন্তু জড়ের কোনো ইতিহাস বা স্বাধীনতা নেই। অতীতের কোনো চিহ্নই জড়পদার্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাণ সমস্ত চিহ্ন কুড়িয়ে নিয়ে চলে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে

প্রাণ নব নব ইতিহাস রচনা ক'রে নিত্য নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, জীবনযুদ্ধে প্রাণের যে অপচয় চোখে পড়ে, প্রাণের প্রবাহকে রক্ষার জন্যেই সে অপচয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাণ যে বিরোধের কাহিনী রচনা ক'রে চলেছে, প্রাণকে রক্ষার জন্যেই তার উপযোগিতা।

পরবর্তী রচনা 'প্রজ্ঞার জয়' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাণময় জগৎ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর মনোময় জগতে প্রবেশ করলেন। প্রাণের ধর্মই হোল বিরোধ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই বিরোধ প্রাণীদের জ্ঞাতসারে ঘটছে কি না। প্রাণীরা সচেতনভাবে এই বিরোধে লিপ্ত হচ্ছে কি না। বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে দাঁড়িয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে চেতন ও অচেতনের প্রশ্ন এসে পড়ে। চেতনার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর দার্শনিকের তত্ত্বান্বেষী জগতে প্রবেশ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর শুধুমাত্র নিজের চেতনাকেই বলেছেন চেতনা ; অন্যের চেতনা, যা' কল্পনা ক'রে নিতে হয়, তাকে বলেছেন 'চেতনাভাস বা জ্ঞান'। এইখানে তাঁর মৌলিকত্ব। ইংরাজীতে উভয় প্রকার চেতনাকেই বলা হয় 'Consciousness'। উভয় চেতনাকেই 'Consciousness' বলার ত্রুটি কোথায়, প্রসঙ্গতঃ কার্ল পিয়ার্সন প্রমুখ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের উক্তি আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর তা' দেখিয়েছেন। এই আলোচনায় গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচ্য প্রবন্ধে কোথাও প্রাধান্য লাভ করে নি। এখানে প্রজ্ঞার আলোচনা করা হয়েছে জীব-বিজ্ঞানীর বিচারভূমিতে বসে। এই প্রজ্ঞার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমেই 'instinct' বা সংস্কারের প্রশ্ন এসে গেছে। রামেন্দ্রসুন্দব বলতে চেয়েছেন, পশুপক্ষীর জীবনযাত্রায় সংস্কারই প্রধান, বুদ্ধিবৃত্তির স্থান সেখানে নগণ্য। কিন্তু মানুষের বেলায় সংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ নির্দেশ করে। পশুপক্ষীর কাল সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ; কিন্তু মানুষ কালকে অতীত ও ভবিতব্যের দিকে সম্প্রসারিত ক'রে দিয়েছে। মানুষের সাফল্যের মূল এইখানে। মানুষ অন্যান্য মানুষকে আত্মতুল্য মনে ক'রে তাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে শিখেছে। অভিজ্ঞতালব্ধ এই যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতাই হোল মানুষের 'প্রজ্ঞা বা Reason'। এই প্রজ্ঞারই সাহায্যে মানুষ অসীম দেশ ও অনন্ত কালের রচনা করেছে ; বৈজ্ঞানিক রচনা করেছে 'বাঙ্ময় জগৎ'। জীবনযুদ্ধে মানুষের যে সাফল্য, এর মূলেও এই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাই মানুষকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করে। জীবনযুদ্ধে প্রাণ আপনাকে রক্ষা করতে চায় বলেই এই প্রজ্ঞার সৃষ্টি।

'চঞ্চল জগৎ'-এ রামেন্দ্রসুন্দর জগৎপ্রবাহের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন। এখানে তাঁর বক্তব্য,—বাহ্যজগৎ নয়—জীবই চঞ্চল। জীবই আপন চাঞ্চল্যকে বাহ্যজগতে ছড়িয়ে দিয়ে জগৎকে চাঞ্চল্যে পূর্ণ করে। আলোচ্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, লেখকের দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভিনবত্ব। রামেন্দ্রসুন্দর প্রাণকেই প্রথম স্বীকার্য ধ'রে নিয়ে জগৎতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। জড়বাদীদের মতো জড় থেকে প্রাণীর উৎপত্তি বোঝাবার চেষ্টা করেন নি। 'প্রাণি-বিদ্যার চশমা চোখে' দিয়ে তিনি জগৎপ্রবাহের সূত্র অনুসন্ধান

করেছেন—'প্রাণের সম্পর্কে জড়ের তাৎপর্য্য' বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এখানেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রত্যক্ষ দেশ কিভাবে ত্রিধা-বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাণিবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে তিনি তা' বোঝাতে চেয়েছেন। আমাদের 'muscular feeling' বা 'প্রযত্ন-বুদ্ধি'র ব্যাখ্যা ক'রে প্রত্যক্ষ দেশের এই ত্রিধা-বিস্তৃতি বোঝান হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার কালে মাংসপেশীর যে কুঞ্চন ও প্রসারণ হয়, তা' থেকে একটা 'বেদনা-বুদ্ধি' জন্মে। তিন মুখে চললে তিন রকমের বেদনা-বুদ্ধি জন্মে। রামেন্দ্রসুন্দর এই বেদনা-বুদ্ধিকেই বলেছেন 'muscular feeling' বা 'প্রযত্ন-বুদ্ধি'। দেশজ্ঞানের মুখ্য সহায়ক হিসাবে এই প্রযত্ন-বুদ্ধির উপযোগিতা বোঝাতে গিয়ে তিনি মনোবিজ্ঞানকে যুক্তির অসমতলে দাঁড় করিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই 'muscular feeling' বা প্রযত্ন-বুদ্ধির অনুভূতি হয়ে থাকে মানুষের চলার অনুভূতি থেকে। এই বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তুর দূরত্ব নিরূপণ করে। তবে তাঁর মতে, মানুষের চলা বা গতিক্রিয়াটা প্রত্যক্ষ নয়, এই চলার অনুভূতি বা প্রযত্ন-বুদ্ধিই প্রত্যক্ষ। যেখানে এই অনুভূতির অভাব, সেখানে আমরা স্থির। যেখানে এই অনুভূতি বর্তমান, সেখানে আমরা চঞ্চল ও গতিশীল। বাহ্যদ্রব্যের যে অস্থিরতা বা গতি, তা' হোল মানুষেরই অস্থিরতা। মানুষেরই গতি বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বাহ্যদ্রব্যে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বাহ্যদ্রব্যকে গতিময়তা ও অস্থিরতা দিচ্ছে। এই বক্তব্যকে অতি সুন্দর উপমা ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুপরিস্ফুট করা হয়েছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন 'muscular feeling' বা প্রযত্ন-বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয় ক'রেই পরিতুষ্টি লাভ করতে পারে নি ; প্রযত্ন-বুদ্ধির উপযোগিতা কোথায়, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তাঁর মনে এসেছে। ইতিপূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর বার বার বলতে চেয়েছেন, প্রাণের কাহিনী মানেই বিরোধের কাহিনী। বিরোধ আছে বলেই জীবনযাত্রা। এই বিরোধের পরিণাম প্রাণিদেহের ক্লেশ ও ক্ষয় এবং পরিশেষে মৃত্যু। এবার তিনি দেখালেন, প্রযত্ন-বুদ্ধির মূলে ক্লেশ। কারণ, প্রাণীর গতিক্রিয়ার সময় প্রাণিদেহের ক্লেশ ও ক্ষয় হয়ে থাকে। এই ক্লেশই যখন বিরোধের সহকারী তখন প্রযত্ন-বুদ্ধিও বিরোধের সহায়ক। এই বেদনা ও ক্লেশকে বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণী বিরোধের কাহিনী রচনা করেছে ; প্রাণিজগতের আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এই উপসংহারে পৌছুলেন। কিন্তু প্রাণ কেন বিরোধের কাহিনী রচনা করল, কেন বেদনাকেই কামনা বলে মেনে নিল—জগৎরহস্যের এই বিরাট জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এসে রামেন্দ্রসুন্দর থমকে দাঁড়ালেন। বিচিত্র জগতের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৯১৯)। তা' সত্ত্বেও বিচিত্র জগতে তিনি যতদূর আলোচনা করেছেন—জগৎপ্রবাহের যতখানি গভীরে প্রবেশ করেছেন, দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব, চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা ও অনুভূতির গভীরতার দিক থেকে তা' অনন্য। বিচিত্র জগতের আর একটি বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থটির সরস ভাষা ও মনোরম প্রকাশভঙ্গী। জায়গায় জায়গায় চমৎকার উপমা রচনাকে আশ্চর্য রমণীয়তা দান করেছে। যেমন, 'ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশে উভয় জগতের তুলনা,

"ব্যাবহারিক জগৎ যেন একখানা drama ;—উহার একটি plot আছে, একটা end আছে, গোড়ায় একটা design আছে,—অঙ্কের পর অঙ্ক, একটা উদ্দেশ্য purpose লইয়া আসে ; কেহই নিরর্থক আসে না। আর প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা Epic poem ; ঘটনাবহুল, বিচিত্র, উচ্ছৃঙ্খল ; সর্ব্বত্রই একটা উলটপালট্, বিপর্য্যয় ও বিপ্লবের কাণ্ড। দেখিলে তাক্ লাগে ; হাসিতে হয় ; কাঁদিতে হয় ; অভিভূত হইতে হয় ; পুলকিত হইতে হয় ;—কিন্তু কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলে, তাহা বলা যায় না।"

অন্যত্র,

"প্রাণ একটা ছন্দোময় পদার্থ ; উহার মাঝে মাঝে যতি ও বিরাম আবশ্যক ; —গানের মত পদার্থ ; মাঝে মাঝে তাল দিয়া, ফাঁক বসাইয়া উহার সুর রক্ষা করিতে হয়।"

(প্রাণের কাহিনী)

৭

রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তী বিজ্ঞানগ্রন্থ 'জগৎ-কথা' গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের কিছু অংশ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'জগৎ-কথা'র ছাপার কাজ চলবার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়। পরে প্রধানতঃ জগদানন্দ রায়ের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। সাময়িক-পত্রে প্রকাশের কালকে মোটামুটিভাবে আলোচ্য বিষয়বস্তুর রচনাকাল বলে ধ'রে নিলে দেখা যায়, জগৎ-কথার অধিকাংশ অংশই 'জিজ্ঞাসা'র পরবর্তীকালের এবং বিচিত্র জগৎ-এর পূর্ববর্তীকালের রচনা। জগৎ-কথায় রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী খাঁটী বৈজ্ঞানিকের। এখানে তিনি জগৎকে দেখেছেন জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে। বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বকে বিচার বা বিশ্লেষণ করার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিচয় এখানে নেই। গভীর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টিরও এখানে একান্ত অভাব। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থটি খাপছাড়া। বস্তুতঃ, সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধ-প্রকাশের কাল ধ'রে বিচার করলে, 'জিজ্ঞাসা' থেকে 'বিচিত্র জগৎ' পর্যন্ত (১২৯৯-১৩২৪) রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-সাহিত্যে যে বিজ্ঞানদর্শনের যুগ চলেছিল সেই যুগে আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধের রচনা (১৩১৭-১৩১৮) কিছুটা অভিনব বলেই মনে হয়।

'জগৎ-কথা'য় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জড় শব্দকে গ্রহণ করা হয় নি। ইংরাজীতে 'matter' বলতে যা' বোঝায় অর্থাৎ, চুনা-পাথর থেকে শুরু ক'রে জীবদেহ পর্যন্ত সব কিছুকেই জড় অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকের। তবে বৈজ্ঞানিকের সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের যে সংশয় ছিল, তার পরিচয় এখানেও জায়গায় জায়গায় বিদ্যমান। বিজ্ঞানের স্থূল বিষয় নিয়ে আলোচনার কালেও রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্যার আবিষ্কারের গণ্ডী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

জগৎ-কথায় পদার্থবিজ্ঞানেরই প্রাধান্য। তবে রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও এতে কিছু কিছু আছে। আলোচনা সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। বিজ্ঞানের গাণিতিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই আলোচনা করা হয় নি। জড়-বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বাদি জনসাধারণ যা'তে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা ও বিচিত্র জগৎ-এ ভাষার যে গাম্ভীর্য রয়েছে, এখানে তা' নেই। এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর অধিকাংশই বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বাদি নিয়ে। বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক এখানে অতি সরল ও সহজ ভাষায় বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করেছেন। জগৎ-কথায় রামেন্দ্রসুন্দরের বর্ণনাভঙ্গী গল্পের মতো সুখপাঠ্য।

৮

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও লিখেছিলেন। সবগুলি পুস্তকই বিজ্ঞান-বিষয়ক। বাংলায় রচিত রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম[৮] বিজ্ঞানগ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যা' ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বালকদের উদ্দেশ্যে লেখা। সহজ কয়েকটি পরীক্ষাকে কেন্দ্র ক'রে পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলতত্ত্ব এখানে আলোচিত। রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে যে আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন, তার ইঙ্গিত এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় তৎকালীন যুগের নব্যপন্থা অনুসৃত। ইতিপূর্বে বাংলায় রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই গ্যানোর গ্রন্থকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়। কিন্তু গ্যানোর ব্যাখ্যা-প্রণালী অনেক স্থলে ত্রুটিপূর্ণ। গ্যানোর গ্রন্থের ত্রুটিগুলি পরিহার ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির পরিকল্পনায়ও আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে এই গ্রন্থে গতির নিয়ম তিনটি আলোচিত। এখানে 'বলের' ব্যাখ্যা করা হয়েছে কির্কফ্ ও অধ্যাপক টেটের প্রদর্শিত পন্থায়। 'পদার্থবিদ্যা'য় জড়পদার্থের ব্যাপ্তি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ এবং তাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহারে কোনোরূপ নূতনত্ব পরিলক্ষিত হয় না। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার চেষ্টা করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তী পাঠ্যপুস্তক 'ভূগোল' ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রথম অধ্যায়ে ভূবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব হোল, এখানে বিভিন্ন মহাদেশের ইতিহাস আলোচনা ক'রে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের সম্বন্ধ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দর আরও দু'টি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ দু'টির নাম, 'বিজ্ঞান পাঠ, ১ম ও ২য় মান' (১৯০২) এবং 'বিজ্ঞান-কথা'।

---

৮ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ ইংরেজীতে লেখা 'Aids to Natural Philosophy' ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্বন্ধেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বরাবরই সচেতন ছিলেন। তিনি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি হোল, 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' (১৩০১, ২য় সংখ্যা), 'রাসায়নিক পরিভাষা' (১৩০২, ২য় সংখ্যা), 'বৈদ্যক পরিভাষা' ও 'ভৌগোলিক পরিভাষা' (১৩০৬, ৪র্থ সংখ্যা) এবং 'শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা' (১৩১৭, ৪র্থ সংখ্যা)। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এক-মাত্র 'ভৌগোলিক পরিভাষা' ছাড়া সবগুলি প্রবন্ধই রামেন্দ্রসুন্দরের 'শব্দ-কথা' (১৯১৭) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রন্থ আলোচনা ক'রে রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ও পথে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা চলে।

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষায় 'বাঙ্গালীর স্বভাবের উপযোগী' বিজ্ঞানের ভাষা সংকলন করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ ক'রে বাংলা বিজ্ঞানের ভাষাকে পুষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে চলিত বাংলার দাবিকেও তিনি একেবারে উপেক্ষা করেন নি। বস্তু, কাজ প্রভৃতি কতকগুলি প্রচলিত বাংলা শব্দকে নির্দিষ্ট অর্থে তিনি নিজেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহারে তিনি গতানুগতিক রীতির প্রতিই আনুগত্য দেখিয়েছেন বলে মনে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজী শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন বটে; কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণ ঠিক রেখে শুধুমাত্র শব্দগুলোর হরফ পরিবর্তন ক'রে সেগুলোকে বাংলায় ব্যবহারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,

> "বাক্যের সহিত অর্থের হরগৌরী-সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক ; বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিজাতীয় অনাত্মীয় বাক্য আমাদের সাধারণের নিকট স্বতঃ অর্থহীন ; সবিশেষ অভ্যাসসহকারে ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে মনে টানিয়া আনিতে হয় ; অর্থ আপনা হইতেই মনে আসে না। সুতরাং কেবল মাত্র ইংরেজী শব্দগুলি বাঙ্গালা হরপে বসাইয়া পরিভাষা প্রণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে ফলোদয় হইবে না।"
>
> (রাসায়নিক পরিভাষা)

রামেন্দ্রসুন্দর সরলতা ও শ্রুতিমধুরতার দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক শব্দ সংকলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ ক'রে প্রয়োজনবোধে আভিধানিক শব্দকে পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করা বা অভিধান-বহির্ভূত নূতন শব্দ সৃষ্টি করার ব্যাপারেও তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। তবে যেখানে সুন্দর ও শ্রুতিমধুর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ বর্তমান রয়েছে, সেখানে বাংলায় নতুন শব্দ সৃষ্টি করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"শব্দ সৃষ্টি করা দুরূহ ; প্রাচীন শব্দের নূতন পারিভাষিক অর্থ দেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকের গত্যন্তর নাই।"

(জগৎ-কথা : কঠিন পদার্থ)

তাঁর রচনায় সংস্কৃত শব্দকে নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সংস্কৃত শব্দ.ক বাংলায় ব্যবহার ক'রে তিনি বিজ্ঞানালোচনার অনেক জায়গায় ভাষাবিভ্রাট এড়াতে চেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ যে-কোনো বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে সংস্কৃত 'অনিল' শব্দটির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় যে-কোনো প্রকার বায়বীয় পদার্থকে বায়ু বলা হয়। চিরপরিচিত বাতাস থেকে শুরু ক'রে সোডাওয়াটারের বায়ু ও দাহ্য বায়ু—সবই বায়ু নামে অভিহিত। এতে ক'রে বিজ্ঞানের ভাষার যে বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা, রামেন্দ্রসুন্দর তা' এড়াতে চেয়েছিলেন। ইংরেজীতে যে-কোনো প্রকার বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে 'গ্যাস' (Gas) শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের চিরপরিচিত বাতাসকে ইংরেজীতে বলা হয় Air। গ্যাস-এর অনুরূপ অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর 'অনিল' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিক শব্দ সংকলনের সময় জায়গায় জায়গায় সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হলেও রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ্য রেখেছেন, আহৃত শব্দগুলো যা'তে চলতি ভাষায় চলবার উপযোগী হয়। এজন্যেই তিনি সংস্কৃত 'মরুৎ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'অনিল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে বিজ্ঞানালোচনার বহু ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হলেও রামেন্দ্রসুন্দর বরাবরই লক্ষ্য রেখেছেন, সংকলিত বিদেশী শব্দগুলো বাংলা ভাষার ধাতের সঙ্গে যা'তে বেমানান না হয়। যে-কোনো প্রকার বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে ইংরেজী 'গ্যাস' শব্দটি তাঁর মনঃপূত হয় নি বলেই তিনি সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের ভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিলেও কোনোরূপ গোঁড়ামির পক্ষপাতী তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টই বলেছেন,

> "বোধ করি, কোন ভাষাতে এমন কোন শব্দ প্রচলিত নাই, সংস্কৃত ভাষার অতলস্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ না মিলিতে পারে। তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পণ ধরিয়া বসার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

(বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)

রামেন্দ্রসুন্দর 'স্থায়ী' বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমর্থক ছিলেন। পরিভাষার আকস্মিক ও মৌলিক পরিবর্তন তিনি সমর্থন করেন নি। তাই বলে এই ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোবৃত্তিকেও তিনি কোনোকালে প্রশ্রয় দেন নি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাষার সংস্কার তিনি সমর্থন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,

> "জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতনভাবে গঠিত হয়। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয় ; নূতন শব্দের প্রণয়ন করিতে হয়।"

(বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)

পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন আধুনিক-পন্থী। প্রাচীনত্বের মোহ ত্যাগ ক'রে সর্বাপেক্ষা আধুনিক পদ্ধতিতে তিনি পরিভাষা সংকলনের পক্ষপাতী ছিলেন। পদার্থের গুণের বা ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে পরিভাষার প্রণয়ন তিনি কোনোকালেই সমর্থন করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,—রামেন্দ্রসুন্দরের সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী যুগে বহু গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিভাষা প্রণয়ন করে-ছিলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হোত। এই ত্রুটি ইংরেজী ভাষায়ও বিদ্যমান। বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে এইখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান আপত্তি। একই অর্থে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ পরিহার এবং সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থে শব্দ-প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁর মূল কথা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> "প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে ; সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র।"
>
> (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)

রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে বরাবরই সচেতন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

> "বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগেই শব্দগুলির নির্দ্দিষ্ট বাঁধাবাধি অর্থ করিয়া লইতে হয় ; চলিত ভাষায় যেমন এলো-মেলো নানা অর্থ থাকে, সেরূপ থাকিলে চলে না ; এই নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ।"
>
> (জগৎ-কথা : স্থিতিস্থাপকতা)

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শব্দ-প্রয়োগের পূর্বে শব্দটিব পারিভাষিক অর্থ তিনি নিজেই ঠিক ক'রে নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন। যেমন, জিজ্ঞাসার 'পঞ্চভূত' শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমেই 'ভূত' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ঠিক ক'রে নিয়েছেন। প্রাচীন পণ্ডিতেরা পাঁচটি ভূত অর্থে যে পাঁচটি মূল পদার্থ বা এলিমেণ্টকে বোঝান নি, জড়-পদার্থকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন মাত্র, একথা গোড়াতেই তিনি বুঝিয়ে বলেছেন। এই গ্রন্থেরই 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামক প্রবন্ধে 'কাজ' শব্দটির পারিভ ষিক অর্থের ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'বিচিত্র জগৎ'-এর 'প্রজ্ঞার জয়' নামক প্রবন্ধে 'চেতনা'র পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনায় ভাষা সম্বন্ধে তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। জগৎ-কথায় দেখা যায়, বিজ্ঞানবিদ্যার স্থূল বিষয় নিয়ে আলোচনার কালে বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই গ্রন্থের 'বল' নামক অধ্যায়ে 'বল' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ আগেই ঠিক ক'রে নিয়ে তিনি আলোচনায় এগিয়েছেন। 'বস্তু' শীর্ষক অধ্যায়ের গোড়াতেই বস্তুর পারিভাষিক অর্থ ঠিক ক'রে নেওয়া হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, mass এবং inertia একার্থক হলেও তিনি এক্ষেত্রে ইংরেজীর ন্যায় বাংলাতেও দু'টি

পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। Mass-কে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন বস্তু; আর inertia-কে জড়ত্ব। 'জগৎ-কথা'র 'রাসায়নিক সম্মিলন' শীর্ষক অধ্যায়ে 'মেলা' আর 'মেশা'র পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, দু'টি জিনিস যখন যে-কোনো ভাগে মিশ্রিত হয়, তখন বলা হয় মেশা; আর ভাগের একটা বাঁধাবাধি নিয়ম থাকলে বলা হয় মেলা বা রাসায়নিক সম্মিলন। 'জগৎ-কথা'র 'ঘর্ম্মমান' নামক অধ্যায়ে, তাপ আর উষ্ণতা এক জিনিস নয়, একথা বুঝিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর থার্মোমিটারের বাংলা 'তাপমানযন্ত্র' নামটির ত্রুটি অতি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। থার্মোমিটার দিয়ে মাপা হয় উষ্ণতা। অতএব, তাঁর মতে, এর নাম বরং উষ্ণতামান হওয়া উচিত। রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে উষ্ণতামান নামটিরই প্রস্তাব করেছিলেন। পরে তিনি এর নামকরণ করেন 'ঘর্ম্মমান'।

কয়েকটি প্রচলিত নাম ছাড়া মূল পদার্থগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন মূল পদার্থ ও সেই সকল পদার্থ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য যৌগিক পদার্থের পারিভাষিক নামগুলো বাংলায় অনুবাদে কোনোকালেই তাঁর সমর্থন ছিল না। তবে গন্ধক, লোহা, তামা, প্রভৃতি যে সকল মৌলিক পদার্থের নাম বহুকাল থেকে জনসমাজে প্রচলিত, সেগুলোকে অবিকৃতভাবে তিনি নিজেই ব্যবহার করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর মূল পদার্থের বিদেশী নামগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা পরিবর্তন ক'রে নিয়ে বাংলা হরফে ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। শব্দগুলোর শ্রুতিমধুরতা এবং সেই সকল শব্দের উচ্চারণে যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকেও তাঁর নজর ছিল। আবার যে সকল নাম বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও জনসমাজে প্রচলিত হয় নি বা চলতি কথাবার্তায় স্থান পায় নি, তিনি সে সকল নাম পরিত্যাগ ক'রে মূল পদার্থগুলোর বিদেশী নামই ব্যবহার করেছেন। অম্লজান, যবক্ষারজান, উদজান ইত্যাদি শব্দ তৎকালীন বিজ্ঞানালোচনায় ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও কোনোকালেই চলতি কথাবার্তায় স্থান পায় নি। এজন্যেই দেখা যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ঐ শব্দগুলোর ইংরেজী নাম অক্সিজেন নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদিই ব্যবহার করেছেন। অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ 'পদার্থবিদ্যা'য় মূল পদার্থের নামকরণের ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতিই অনুসৃত।

মোট কথা,—সুবিধা, শ্রুতিমধুরতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে, ব্যাকরণ ও ব্যুৎপত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ ক'রে, সুনির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা অর্থে বিজ্ঞানের ভাষার ব্যবহারই রামেন্দ্রসুন্দরের অভিপ্রেত ছিল।

১০

বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তক এবং পরিভাষা সম্পর্কে রচনাগুলি ছাড়াও রামেন্দ্রসুন্দর আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।[১] 'নিকলা তেস্‌লা' (সাহিত্য ও বিজ্ঞান,

১ এই সকল প্রবন্ধ এতকাল বিভিন্ন সামরিক-পত্রে ছড়িয়ে ছিল। কিছুদিন আগে (চৈত্র ১৩৬৩) এই রচনাগুলো সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'রামেন্দ্র-রচনাবলী—ষষ্ঠ খণ্ড' নামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩০০) শীর্ষক প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। এখানে ফ্যারাডে, ম্যাক্স্ওয়েল হেল্ম্হোল্ৎজ্, হাৎর্জ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার সংক্ষেপে আলোচনার পর তেস্লার আবিষ্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তবে তেস্লা সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই এতে আছে। ১৩০০ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত 'ফটোগ্রাফি' শীর্ষক প্রবন্ধটি শেষদিকে কিছুটা টেক্নিক্যাল প্রকৃতির।

জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' ১৩০৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে এখানে সর্বসাধারণের উপযোগী আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা বিজ্ঞানসাধনার বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়েছে। এখানেই প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য। এ প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আছে মাক্সোয়েল, ফ্যারাডে, হাৎজ´প্রমুখ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের পটভূমিতে তাড়িৎতরঙ্গের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের অবদান নিয়ে আলোচনা। শেষের দিকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার, ওয়াইজমান ইত্যাদির মতবাদ বর্ণনা ক'রে জীববিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অপর প্রবন্ধ 'অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার' (বঙ্গদর্শন আশ্বিন, ১৩০৮) টেক্নিক্যাল প্রকৃতির রচনা। জগদীশচন্দ্র জড়দেহে ও জীবদেহে সৌসাদৃশ্যের কথা আলোচনা করে বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটি নতুন দিক উন্মুক্ত করে দেন। সেই দিকটি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। জগদীশচন্দ্র কিছু সংখ্যক রেখার দ্বারা ধাতব পদার্থের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ রেখাগুলোর তাৎপর্য বোঝাবার জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বিস্তৃত একটি ভূমিকার অবতারণা করেছেন। যে কোনো পদার্থের পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি যে রেখার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তা' ব্যাখ্যা করাই হল এই ভূমিকাটির উদ্দেশ্য। ভূমিকায় কলকাতার দৈনন্দিন মৃত্যু-সংখ্যা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার ফেলের সংখ্যার রেখাচিত্র অঙ্কন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৩০৮ সালের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রদীপ'-এ 'প্রকাশিত 'জড় ও চৈতন্য' একটি বিজ্ঞাননির্ভর দার্শনিক প্রবন্ধ। এ ছাড়া 'সাহিত্য' পত্রিকায় মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দর 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' লিখতেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১৩০০ সালের পৌষ সংখ্যায় ও ১৩০১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত দু'টি বৈজ্ঞানিক সংবাদ বিষয়ক রচনা। বিজ্ঞান-জগতের চিত্তাকর্ষক কয়েকটি বিষয় নিয়ে এখানে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। পৌষ সংখ্যা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক সংবাদের আলোচ্য বিষয় হোল কৃত্রিম হীরক উৎপাদনের কথা, তরল বায়ু ও তরল অম্লজানের প্রসঙ্গ, মানবশরীরে তাড়িত-প্রবাহের ক্রিয়া, আহারের সঙ্গে জীবজগতে স্ত্রী-পুরুষ জন্মের সম্পর্ক এবং কানের ভিতর অবস্থিত মানুষের বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কথা। ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক সংবাদের আলোচ্য বিষয় হোল, যুগল নক্ষত্র, বৃহস্পতির উপগ্রহ, ভবিষ্যতের কয়লা ও ভবিষ্যতের আলো। যুগল নক্ষত্র নিয়ে আলোচনায় হর্শেল, লাপ্লাস্ ও জর্জ ডারুইনের আবিষ্কার ও অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সব বিশেষ ধরনের নক্ষত্রের প্রকৃতি এবং উৎপত্তির কাহিনী বর্ণিত। মঙ্গলগ্রহ নামক ক্ষুদ্রকায়

বিজ্ঞান-সংবাদটিতে ঐ গ্রহের জলবায়ু ও আবহাওয়ার বর্ণনা এবং ওখানে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা বেশ চিত্তাকর্ষক। বৃহস্পতির উপগ্রহে ঐ গ্রহের পঞ্চম গ্রহ আবিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর চন্দ্রের সঙ্গে ঐ গ্রহের চন্দ্রের গঠন-প্রকৃতির পার্থক্য অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষোক্ত দু'টি প্রসঙ্গে কয়লার অভাবে তাড়িতের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের কথা এবং শক্তির অপব্যয় রোধ করে শুদ্ধ আলোক উৎপাদনের বিষয় মনোরম ভাষায় আলোচিত হয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছোটদের জন্যেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলোর বৈশিষ্ট্য, ছোটদের জন্যে লিখিত হলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এখানে উপেক্ষা করা হয় নি। ছোটদের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে রচনা দুরূহ হয়ে পড়বার ভয়ে বিজ্ঞানের তথ্যকে অনেকেই উপেক্ষা করেন। ফলে প্রবন্ধগুলো কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা এর ব্যতিক্রম। মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আমরা কি খাই?' (ভাদ্র ১৩০২), 'মেরুপ্রদেশ' (আশ্বিন, ১৩০২) ও 'নিউটনের কীর্ত্তি' (ফাল্গুন, ১৩০২), 'গাছের আহার' (আশ্বিন, ১৩০৫), 'উনবিংশ শতাব্দী' (বৈশাখ ১৩০৬) ও 'জ্যোতিষের কথা' (আষাঢ় ১৩০৬)। 'আমরা কি খাই' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক অপূর্ব-সুন্দর ভাষায় বুঝিয়েছেন যে, আসলে আমাদের খাদ্য হল জল, কয়লা আর ছাই। 'মেরুপ্রদেশ' নামক প্রবন্ধে প্রধানতঃ সুমেরুর জলবায়ু নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী প্রবন্ধে নিউটনের আবিষ্কারের মূল কথা বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'গাছের আহার' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বুঝিয়েছেন যে, গাছের প্রধান খাদ্য হল কয়লা। 'উনবিংশ শতাব্দী' অসম্পূর্ণ প্রকৃতির রচনা। এখানে উনিশ শতকে মানুষের অদ্ভুত জ্ঞানোন্নতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। 'জ্যোতিষের কথা'য় উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পটভূমিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রসঙ্গ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ছোটদের জন্যে আরও কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রবন্ধ কয়টি হল 'ধূলি' (সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ১৮৯২ জানুয়ারি), 'ভূমিকম্প' (সখা ও সাথী, আষাঢ় ১৩০৪) ও 'চাঁদের কথা' (যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'ছবি ও গল্প' ১৯০৬)। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে ধূলির শক্তি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর যে সরল ও তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন, তা' শুধু ছোটদের নয়, বড়দের কাছেও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হবে। মূলতঃ ধূলির জন্যই যে আকাশকে নীলবর্ণ দেখায়, বায়ুতে ধূলি আছে বলেই যে প্রদীপের শিখা প্রায়ই পীতবর্ণ হয়ে থকে, খেজুর বা তালের রসের মাদকতা যে বায়ুর সজীব ধূলিকণা থেকে উৎপন্ন হয়, ধূলির প্রভাবেই যে জীবদেহ পচতে থাকে, সজীব ধূলিকণা যে সজীব দেহকেও আক্রমণ করে এবং বায়ুস্থিত ধূলিই যে কুয়াশা ও মেঘের সৃষ্টির অন্যতম কারণ, এসকল তথ্যের মধ্যে বড়রাও অনেক বিস্ময়ের উপকরণ খুঁজে পাবেন। পরবর্তী প্রবন্ধ ভূমিকম্পে কয়েকটি স্মরণীয় ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করে পৃথিবীর ভূমিকম্প-প্রধান অঞ্চলগুলোর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে সংক্ষেপে বলা হয়েছে ভূমিকম্পের কারণ। সর্বশেষ

প্রবন্ধ 'চাঁদের কথা'য় চাঁদের প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীকে যেখানে চাঁদের চাঁদ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে, সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হোল সে জায়গাটি।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকাংশ প্রসঙ্গই বিশ্বপ্রকৃতির অজানা ও রহস্যময় দিক নিয়ে। দর্শনের রাজপথে বিজ্ঞানকে পাথেয় ক'রে জগৎরহস্যের রাজদরবারে তিনি অভিসারে বেরিয়েছেন। জগৎরহস্যের কিনারা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এই অভিসার তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু রামেন্দ্র-সুন্দরের অভিসার একেবারে ব্যর্থ হয় নি। জগৎরহস্যের গোড়ায় পৌছুতে গিয়ে তিনি পথের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, বিশ্বজগতের যে রূপ ও প্রকৃতি দর্শন করেছেন, তা তাঁর সাহিত্যে বাণীরূপ লাভ করেছে। রামেন্দ্রসাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বোধশক্তির গভীরতা, প্রকাশভঙ্গীর সংযম এবং ভাষার লালিত্য তাঁর সাহিত্যকে একটি আশ্চর্য বিশিষ্টতা দান করেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার এই গুণ-গুলো স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা যায়, অতিকথন তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি। অনেক-ক্ষেত্রে দেখা যায়, একই কথা বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি বারবার বলেছেন। সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে এরূপ পুনরুক্তি, আপাতঃ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে মনে হলেও দু' এক জায়গায় এই ত্রুটি কিছুটা যেন বেশী বলেই প্রতীয়মান হয়। এই ত্রুটির মূলে রয়েছে এক একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রতি (যেমন ডারউইনের বিবর্তনবাদ) তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এই ত্রুটি সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, রামেন্দ্রসুন্দরই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। ভাষার গাম্ভীর্য ও প্রকাশভঙ্গীর লালিত্যের দিক থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের যতখানি গভীরে তিনি অনুপ্রবেশ করেছেন, অথবা বিজ্ঞানকে বাহন করে জগৎ-রহস্যের মূলে পৌছুবার যতখানি প্রচেষ্টা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের অপর কোনো লেখকের রচনায় তা' দুর্লভ।

চতুর্থ অধ্যায়

বিজ্ঞান ও দর্শন ঃ জগৎপথিক রামেন্দ্রসুন্দর

দেশ নয়, মহাদেশ নয়, মহাজগৎ। পর্যটক নয়, অভিযাত্রী নয়, বিশ্বপথিক। রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান ও দর্শন-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে মনে হয়, মহাজগতের কোন্ এক দুর্নিরীক্ষ্য মহাপ্রাঙ্গণে কোনো এক বিশ্বপথিক যেন অভিসারে বেরিয়েছেন। দর্শনের তরীতে বিজ্ঞানের পাল খাটিয়ে কোনো দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক জগৎ-পরিক্রমা করছেন যেন। পরিক্রমণের সেই ইতিহাস লেখা আছে রামেন্দ্রসাহিত্যে। সে ইতিহাস ইতিহাস নয় শুধু। এমনকি দর্শন বা বিজ্ঞানও নয়। একেবারে খাঁটি সাহিত্য। রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শনচিন্তা সাহিত্য, আবার বিজ্ঞান-চেতনাও সাহিত্য। আসলে সাহিত্যিকের কলম তাঁর, দার্শনিকের বোধ, আর বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকের। তাই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মামুলী প্রবন্ধ লেখেন নি। দার্শনিকের বোধ নিয়ে বিজ্ঞানকে দর্শন করেছেন, বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি নিয়ে জগৎ-পরিক্রমা করেছেন। অর্থাৎ, রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্যাকে জানতে চান নি শুধু, বুঝতে চেয়েছেন ; তাই তিনি করেছেন বিজ্ঞানের বিচার। বিজ্ঞান-বিদ্যার গলদ অনুসন্ধান করেছেন, বিজ্ঞানবুদ্ধির ফাঁকি তুলে ধরেছেন। যে ভাষায় তুলে ধরেছেন, তা'তে দার্শনিকের কাঠিন্য নেই, বৈজ্ঞানিকের টেকনিক্যালিটিও নেই ; আছে সাহিত্যেকের সহৃদয়তা। এই যে সহৃদয়তা, রচনার এই যে প্রসাদ-গুণ, এরই জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর যখন যা' লিখেছেন তা'-ই সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তাঁর জগৎ-পরিক্রমার ইতিকথা হয়ে উঠেছে রসের সামগ্রী। তথ্যের ভার হালকা হয়ে আনন্দময় সহাসত্য আত্মপ্রকাশ করেছে সেখানে। জগৎ ও জীবনের এই চিরন্তন সত্যকে নিয়েই রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান ও দর্শন-সাহিত্য।

সে সাহিত্য কেমন ? না মহাকাব্যের মতো গম্ভীর। আবার গীতিকাব্যের মতো রঙে-রসে ভরা। রামেন্দ্রসাহিত্যের পটভূমি বিশ্বভুবন। পাত্রপাত্রী প্রধানতঃ তিনটি,—জড়, প্রাণ এবং প্রজ্ঞা। এই ত্রয়ীর ইতিকথা নিয়েই রামেন্দ্রসাহিত্য। জড়-জগতের রহস্যলোকের কথা আছে সেখানে। আবার আছে প্রাণজগতের বিচিত্র কাহিনী। প্রাণের কান্না-হাসি ও সুখ-দুঃখের ইতিকথা আছে। আবার আছে প্রাণের সঙ্গে জড়ের বিরোধের কাহিনী। প্রজ্ঞার কথা আছে, আবার আছে মানবমনোলোকের কথা। অর্থাৎ, জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে রামেন্দ্রমানস অভিসারে বেরিয়েছে। মহাকাব্যের স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের স্থান এখানে নিয়েছে জ্ঞানজগৎ প্রাণলোক ও জড়জগৎ। মহাকাব্যের দেবতা এখানে প্রজ্ঞা, দানব জড় পদার্থ। আর প্রাণজগৎ হ'ল

মানবের প্রতিনিধি। মহাকাব্যে হয় দেব-দানবে যুদ্ধ; এখানে যুদ্ধ প্রাণের সঙ্গে জড়ের। মহাকাব্যের মানব-চরিত্রে দেবগুণের বিকাশ ঘটে, আর এখানে যে প্রাণের কথা আছে, তার ঘটেছে প্রজ্ঞালোকে উত্তরণ। তাই বলা চলে, বিজ্ঞানরসিক রামেন্দ্রসুন্দর গদ্যে মহাকাব্য লিখেছেন। জগৎ-পরিক্রমায় বেরিয়ে বিজ্ঞানের যে মহাভাষ্য তিনি রচনা করেছেন, তা' মহাকাব্যের গৌরবে অভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু মনে যেন রাখি, মহাকাব্যের এই গৌরবটুকুই রামেন্দ্রসাহিত্যের একমাত্র প্রাপ্য নয়। গীতিকবির সম্মান থেকে বঞ্চিত করলে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি আমরা অবিচার করব। ধ্রুপদী রামেন্দ্রসাহিত্যে গীতিকবির তন্ময়তা ও আত্মগত ভাবনাকে আমরা যদি উপেক্ষা করি তো সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হবে না। রামেন্দ্রসাহিত্যের স্বরূপ বুঝতে হলে, দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের যে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাগুলো তার বিজ্ঞানভাষ্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদের জানতে হবে। কারণ, রামেন্দ্রসুন্দর আর দশ জন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকারের মতো বিজ্ঞানকে বাইরে থেকে দেখেন নি। দেখেছেন একেবারে ভিতর থেকে,—নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ-নিরানন্দের সঙ্গে মিলিয়ে। তাই তিনি বিজ্ঞানবিদ্যাকে ভাল লাগা বা মন্দ লাগার কথাটা যেমন অকপটে বলতে পেরেছেন, তেমনি পেরেছেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাগুলো খোলসা করে জানাতে। তাই বলা চলে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে মহাকবি ও গীতিকবির যুগ্ম সম্মান রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাপ্য।

অন্য কারণেও বাংলা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর এক বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী। মননশীল সাহিত্য জগতে রাজসম্মান তাঁর প্রাপ্য। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলার মননশীল সাহিত্যিকদের আর কারও সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের কোনো তুলনা চলে না। আর বিজ্ঞান নিয়ে সাহিত্যরচনার প্রশ্ন যেখানে, সেখানে তিনি অতুলনীয়। বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল তত্ত্বকে এমন অনুপম করে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লিপিবদ্ধ করেন নি। ইয়োরোপীয় মিশনারীরা বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করেছিলেন। অক্ষয়কুমার করেছিলেন সার-সংযোজন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ফুল ফুটিয়েছেন যিনি, যাঁর চেষ্টায় সেখানে ফসল ফলেছে, তিনি হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বাংলা ভাষায় যে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানালোচনা করা যেতে পারে, তা' রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম দেখালেন। বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার দৈন্যকে দূর করে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-সৃষ্টি প্রথম করলেন তিনিই। মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গণ্ডী যে শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমিত নয়, সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনা মানেই যে কিছু নিতান্ত সহজ-সরল বালকপাঠ্য রচনা নয়, তা' তিনিই প্রথম প্রমাণ করলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানচিন্তার আসরে বাংলা সাহিত্যের সঙ্কুচিত পদক্ষেপের যুগ কাটল। বিজ্ঞান-চেতনার অরুণালোকে বাংলার মননশীল সাহিত্যসংসার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চায় বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এই মনে করে বাংলাকে যাঁরা অশ্রদ্ধার নিরুদ্দেশ-জগতে নির্বাসিত করেছিলেন, তাঁরাও অচিরেই রামেন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে মাতৃভাষার বলিষ্ঠতা ও প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তা আবিষ্কার করে বিস্মিত হলেন। 'প্রকৃতি'র (১৮৯৬) লেখক রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে রহস্যময় জগতের কয়েকটি

কালো পর্দা উত্তোলিত হ'ল। 'জিজ্ঞাসা'য় (১৯০৪) জড় ও জীব-জগতের নতুন এক রহস্য-সন্ধানীকে আবিষ্কার করল বাঙালী পাঠকসমাজ। 'বিচিত্র জগতে' দেখল, এই বিজ্ঞানভিক্ষু সাহিত্যিক প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে অবতরণ করেছেন এবং এখানে বসে বিজ্ঞানবিদ্যার সত্যি-মিথ্যে ও ক্ষমতা-অক্ষমতা নিয়ে যে বিচার বিশ্লেষণ করছেন, বিজ্ঞানীর ফর্মুলায় তা' কোনোদিন ধরা পড়ে না। সুগভীর এক দার্শনিক-বোধের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সম্মিলন না ঘটলে, সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে বিজ্ঞান-চেতনার মণি-কাঞ্চন যোগ না ঘটলে এমন রচনা সম্ভব নয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রচেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষার সবচেয়ে উপেক্ষিত একটি দিক সাহিত্যসভায় গৌরবের আসন লাভ করেছে। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চিন্তা ও নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মাতৃভাষায় প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। এ পথ উন্মুক্ত করেছিলেন বলেই বাংলার সাহিত্য-সংসারে রামেন্দ্রসুন্দর নূতন পথের পথিক। এ পথ ধরে মহাবিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন বলেই তিনি জগৎপথিক। এ ছাড়া পথ-পবিক্রমার মতো অনুকূল পরিবেশ রামেন্দ্র-জীবনে ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের প্রতিভাবান ছাত্র, অপরদিকে সাহিত্য-জগতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ-কালে বিজ্ঞান-জগতে ঘটছিল নব নব আবিষ্কার। নূতন নূতন বিজ্ঞানীরা বিশ্বপ্রকৃতির নূতন এক একটি রহস্য-দ্বার উন্মুক্ত করছিলেন তখন। একদিকে বাইরের এই আলোড়ন, অপরদিকে ভিতরের অনুপ্রেরণা রামেন্দ্রসুন্দরকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এমন ঘটনা অনেকের জীবনেই তো ঘটে। অনেকেই তো নূতন আবিষ্কারের উত্তেজনায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন; বিজ্ঞান-জগতের সমসাময়িক ঘটনা ও আবিষ্কারকে নিয়ে বিজ্ঞান-সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সে সব রচনার স্থায়ী কোনো মূল্য আছে কি? অসংকোচে বলব, নেই। সাময়িক ঘটনা নিয়ে চিরন্তন সাহিত্য-সৃষ্টি গল্প-উপন্যাসের বেলায় বরং হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বেলায় তা' হওয়া খুব কঠিন। কারণ, সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও এগোচ্ছে। নতুন যুগের বিজ্ঞানীরা পুরনো দিনের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাই একশ' বছর আগেকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই আজকের দিনে অচল। কেননা, যে সব বৈজ্ঞানিক ধারণার উপর ভিত্তি করে ওদের লেখা হয়েছিল, আজ সে সব বাতিল হয়ে গেছে। তবে তো বলতে হয়, সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে চিরন্তনত্ব বলে কিছু নেই। কথাটা সাধারণভাবে হয়তো সত্যি; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মতো লেখকদের ক্ষেত্রে সত্যি নয় কোনোমতেই। রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক রচনা পাঠ করলে মনে হয়, সমসাময়িক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলো তাঁর বক্তব্যপ্রকাশে সাহায্য করেছে মাত্র, মূল বক্তব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে নি। তার কারণ, রামেন্দ্রসুন্দর জগৎ ও জীবনের এমন সব রহস্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলো চিরকালের। চিরদিন বিশ্বের মনীষীরা যাদের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন এবং অনাগত কালেও সে সব রহস্যের সমাধান সুদূর-পরাহত, এমন সব দুর্জ্ঞেয় ও রহস্য-ঘেরা চিরন্তন 'জিজ্ঞাসা'-গুলোই হ'ল রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচ্য বিষয়। দর্শনের পাদপীঠে বসে বৈজ্ঞানিক সত্যের যাচাই করার দিকেই তার

প্রবণতা ; তাই মনে হয়, বিজ্ঞানচিন্তার পরিবর্তন ঘটলেও রামেন্দ্রসাহিত্যের চিরন্তনত্ব খর্ব হবে না কোনোদিন। বরং বাংলার এক অনন্য সাহিত্য-সাধক হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে চির-ভ্রমণরত এক মহাপথিক সাহিত্য-রসিকদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রিক্ত করবেন চিরদিন।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম ও দর্শন : বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দর

১

রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যসাধনা শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানের রাজপথ ধরে। কিন্তু খানিক-দূর এগিয়ে দেখলেন, রাজপথ শেষ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানবিদ্যার পথে আর এগোন চলছে না। জগৎরহস্যের কিনারা পেতে হলে এবার অন্য এক পথ ধরা দরকার। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে দার্শনিক বোধকে মিলিয়ে এবার দরকার অজানা-অনন্তের অন্ধকারময়, বন্ধুর পথে যাত্রা করা। এ যাত্রাই রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বযাত্রা। এ পথ ধরে এগোলেন বলেই তিনি জগৎপথিক। কিন্তু জগৎপথের যাত্রী হবার মুহূর্তে এক একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বেদ-ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদের ভারতবর্ষের দিকে আপন দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছেন। দেখেছেন অতীত ভারতকে ; অতীত ভারতের কল্যাণধর্ম ও সত্য-শান্তিকে। এই অতীতচারী সত্যদৃষ্টির আলোকে সুদূর অতীতকে যেমন দেখেছেন, ঠিক তেমনি দেখেছেন অদূর বর্তমানকেও। অতীত-দেখা চোখে বর্তমানের বেদপন্থী হিন্দুসমাজের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। আবার আলোকসম্পাত করেছেন অতীত যুগের বেদপন্থীদের ক্রিয়া-কর্ম, সিদ্ধি-সাধনা ও যাগ-যজ্ঞের উপর। তাই সাহিত্য-সাধক রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানভিক্ষুই নন শুধু, বেদপন্থীও বটে। বিজ্ঞানের বেলায় যেমন, বেদ-এর বেলায়ও তেমনি সত্য-সুন্দর ও কল্যাণব্রতের ভাষ্য রচনা করেছেন তিনি।

এই ভাষ্য-রচনার একটা ইতিহাস আছে। বেদ-পরিক্রমার মূলে ইতিবৃত্ত আছে একটু। উপরে এর আভাস দিয়েছি। নীচে এ কথা খোলসা করে বলব। কেননা, বিজ্ঞানপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের বেদপন্থীতে রূপান্তর কৌতূহলোদ্দীপক।

এই প্রসঙ্গে গোড়াতেই বলে রাখি, বিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষমতা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের মনে বরাবরই একটা সংশয় ছিল। তবে সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বে এ সংশয়কে বারবার কাটাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাথমিক রচনা 'মহাশক্তি' (অগ্রহায়ণ ১২৯১), 'বিবর্তন' (শ্রাবণ ১২৯২), 'মহাতরঙ্গ' (অগ্রহায়ণ ১২৯২) ও 'জড়জগতের বিকাশ' (আষাঢ় ১২৯৩) নিয়ে আলোচনা করলে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়। কিন্তু মনে যেন রাখি, এ পর্বের সংশয় বিজ্ঞানবিদ্যায়ই নিবদ্ধ নয় শুধু, দর্শনশাস্ত্রেও প্রসারিত। যেমন, 'মহাশক্তি'র এক জায়গায় আছে,

> কে বলিবে—এ ব্রহ্মাণ্ড কার রচিত ? কে জানে এই ব্রহ্মাণ্ড কি ? এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিহীন অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল

ভ্রাম্যমাণ,—কে আমাকে বলিবে ইহা কি? প্রাচীন বৈদান্তিক বলিয়াছেন, এ মায়া; আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের একমাত্র উত্তর,—আমি জানি না।

সাহিত্য-চর্চার প্রাথমিক পর্বে বিজ্ঞান ও দর্শনে রামেন্দ্রসুন্দরের এই সংশয়ের কথা স্বীকার করে নিয়েও বলবো, এ অধ্যায়ে বিজ্ঞানই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। এ যুগে বিজ্ঞানবিদ্যার সাহায্যেই বিশ্বরহস্যের উত্তর খুঁজেছেন তিনি। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য তাঁর প্রথম বিশিষ্ট বিজ্ঞানগ্রন্থ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬) সম্বন্ধে। এখানেও রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানভিক্ষু জগৎপথিক। বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই বিশ্ব-প্রকৃতির স্বরূপ-অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যা অনেক ক্ষেত্রেই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারল না। এই গ্রন্থের 'জ্ঞানের সীমানা' নামক প্রবন্ধে দেখি, রামেন্দ্রসুন্দরের মনে খটকা লেগেছে। বিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর মনে জেগেছে সন্দেহ। এই সন্দেহ থেকেই পরবর্তী গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা'র (১৯০৪) পরিকল্পনা। বিজ্ঞানবিদ্যার অক্ষমতার কাহিনী এখানে আরও প্রকটভাবে চিত্রিত। সে চিত্র আছে 'মায়াপুরী'তে (কার্ত্তিক ১৩১৬)। আছে 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা'য় (অগ্রহায়ণ ১৩১৭)। এইভাবে একদিকে বিজ্ঞানবিদ্যার এই অসম্পূর্ণতা, অপরদিকে স্বদেশপ্রেম রামেন্দ্রসুন্দরকে বেদ চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছে। বিজ্ঞানবিদ্যার অসম্পূর্ণতার কথা বলতে গিয়ে 'কর্ম্মকথা'র (১৩২০) ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন,

> "পরার্থ কর্ম্ম করিব কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টাও স্থানে স্থানে করিয়াছি। আধুনিক কালের হিতবাদী পণ্ডিতেরা যেরূপে উত্তর দেন, তাহাতে তৃপ্তি হয় না। ডারুইনপন্থীরা কিরূপে হিতবাদের মূল অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও যথাশক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে বোধ করি এইখানেই নিরস্ত হইতে হয়। আমি কেন পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিব, এ কথার চরম উত্তর বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট পাওয়া যায় না। পরার্থপরতার অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগে প্রেরণার মূল সৃষ্টিতত্ত্বের বীজের মধ্যে নিহিত আছে,"—

এই গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞে' রামেন্দ্রসুন্দর সে কথা বুঝিয়েছেন। যজ্ঞের মাহাত্ম্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে বেদপন্থীর কর্মাদর্শ ও জীবনদর্শন বর্ণনা করেছেন ওখানে। বিজ্ঞান নয়, বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের আলোকেই রামেন্দ্রসুন্দর ওখানে জীবনে ত্যাগের তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক না হলে এমনটি সম্ভব হ'ত না। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্বেও দেশীয় সংস্কৃতি ও ধর্মশাস্ত্রের প্রতি এই শ্রদ্ধা আদর্শ দেশপ্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব।

ছোটবেলা থেকেই দেশকে ভালবাসতেন রামেন্দ্রসুন্দর। স্বদেশবাসী ও স্বদেশীয় ধ্যান-ধারণাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। স্বজাতিপ্রীতির বশেই ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত নিয়ে তিনি 'পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা' (১৩০৭) লিখেছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৩১২)। অতএব দেখি, যে যুগে রামেন্দ্রসুন্দর পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে নিয়ে ভাবছেন, স্বদেশ ও স্বজাতিকে নিয়েও ভাবছেন

ঠিক সে যুগেই। জিজ্ঞাসা ও বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা প্রায় একই সময়ে রচিত হচ্ছে। কিন্তু মনে যেন রাখি, তখনও এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে নি। সে পরিচয় কেমন করে ঘটল, 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণের' (১৩১৮) ভূমিকায় তিনি নিজেই তা' বলেছেন,

> "দীঘাপতিয়া-রাজবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ শ্রীমান্ কুমার শরৎকুমার রায় যখন আমার নিকট পদার্থবিদ্যা পড়িয়া এম. এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, আমি তখন মাঝে মাঝে পদার্থবিদ্যার সীমা ছাড়াইয়া অন্যান্য কথা পাড়িতাম। আমাদের দেশের পুরাতন কথা যে আমরা জানি না বা জানিবার যত্নও করি না এবং ইহার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হইত। এমন কি, আমাদের জাতীয় জীবনের যে কিছু বিশিষ্টতা, তাহার মূল ভিত্তিরও আমরা সন্ধান রাখি না, এই জন্য বসিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিতাম ও আমাদের শিক্ষাকে ধিক্কার দিতাম। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া এই সন্ধানকার্যে সাহায্য করা উচিত, এই কল্পনাও এই সময়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।"

২

এর ফলে শরৎকুমার রায় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির অনুবাদ-প্রচাবে উদ্যোগী হলেন। মূলতঃ তাঁবই প্রচেষ্টায় ও ব্যযে প্রথম আরম্ভ হ'ল ঐতবেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের কাজ। যতীন্দ্রনাথ চৌধুবী, হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষ'দেব পরামর্শে পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণকে এ কাজে নিযুক্ত করা হ'ল। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম দু'টি অধ্যায় অনুবাদ করে সিদ্ধান্তভূষণ এ কাজ থেকে বিদায় নিলেন। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ছাপার কাজও চলছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি বিদায় নেওয়ায় কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। এমন সময় শরৎকুমার রায়ের অনুরোধে রামেন্দ্রসুন্দরের উপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুবাদ করার ভার পড়ে। এ সম্বন্ধে আচার্যদেব লিখেছেন,

> "তিনি যে কেন আমাব উপর এই ভাব অর্পণ করিলেন, আর আমিই বা কেন ভার গ্রহণ করিলাম, তাহার কোন সঙ্গত উত্তর দিতে পারিব না। এখন তাহা মনে করিয়া বিস্মিত হই। বেদবিদ্যা অল্পজ্ঞকে ভয় করেন ; কিন্তু আমার মত অজ্ঞের হাতে পড়িয়া তাঁহার কিরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছিল, তাহা জানি না। বেদবিদ্যায় আমি তখন সর্বতোভাবে অজ্ঞ ছিলাম। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতাই আমাকে এই ভার গ্রহণে প্রোৎসাহিত ও প্রেরিত কবিয়াছিল। ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া ভারতবর্ষের পুরাতনী বিদ্যায় অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্যহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি বোধ করিতাম। এই সুযোগ অবলম্বনে সেই মহতী বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব, এই প্রলোভন ত্যাগ করিতে আমি সমর্থ হই নাই।

এই প্রাংশুলভ্য ফলের লোভেই আমি উদ্বাহু বামনের বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছিলাম।"[১]

অতএব, দেখছি, বেদ-অধ্যয়ন ও শাস্ত্র-চর্চার প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। বেদ-বিদ্যার সঙ্গে পরিচিতি তিনি ভারতীয়দের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই যখন তাঁর উপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুবাদের ভার পড়ল, তখন তিনি এ কাজে এগোলেন সশ্রদ্ধচিত্তে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে। সুদীর্ঘ আট বৎসরের চেষ্টায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের কাজ শেষ হয়। কাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৩১০ সালে। আর শেষ হ'ল ১৩১৮ সালে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনুবাদকে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যে তিনি অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন।

আনন্দাশ্রম থেকে প্রকাশিত মূল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। অনুবাদে সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যার অনুসরণ করেছেন। মার্টিন হোগের ইংরেজী অনুবাদ ও মূলগ্রন্থের সাহায্য বিশেষ নেন নি। সায়ণের ব্যাখ্যায় সংশয় হলে ইংরেজী অনুবাদ দেখেছেন বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সায়ণের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হলেও সায়ণাচার্যকেই তিনি অনুসরণ করেছেন।[২] এ ছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তুকে সহজ ও বোধগম্য করে তুলবার জন্য অনুবাদগ্রন্থটিতে প্রচুর টীকার সন্নিবেশ করেছেন। টীকার সাহায্যে কোথাও বা দুরূহ ও সাংকেতিক প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোথাও বা করা হয়েছে মূলগ্রন্থের সূত্র-নির্দেশ। আর গ্রন্থটির পরিশিষ্টে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য বুঝান হয়েছে। টীকা ও পরিশিষ্ট-রচনায় লেখক অন্যান্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং সেই সব ব্রাহ্মণগ্রন্থের অনুযায়ী সূত্রগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। পরিশিষ্ট লেখা হয়েছে প্রধানতঃ শতপথব্রাহ্মণগ্রন্থের এবং তদনুযায়ী কাত্যায়নীর শ্রৌতসূত্রের অবলম্বনে। আচার্য বেবার কর্তৃক শতপথ ব্রাহ্মণের এবং যাজ্ঞিকদেবাদিকৃত-ব্যাখ্যাসমন্বিত কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, পরিশিষ্ট-প্রণয়নে লেখক তার সাহায্য নিয়েছেন। বেদের শাখাভেদে ঋত্বিক বা পুরোহিতদের অনুষ্ঠানে অল্পবিস্তর ভেদ আছে। তাই স্থলবিশেষে লেখক বৌধায়ন এবং আপস্তম্ব-প্রণীত শ্রৌতসূত্রেরও সাহায্য নিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মূলতঃ ঋগ্‌বেদনির্ভর। অপরাপর বেদ অনুযায়ী কর্মের উল্লেখ এই ব্রাহ্মণে প্রসঙ্গতঃ আছে মাত্র। যজুর্বেদী বা সামবেদী ঋত্বিকদের কর্মের সম্পূর্ণ উপদেশ না থাকায় যজ্ঞের একাংশ মাত্র এই ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে। বৈদিক যজ্ঞের সম্পূর্ণ বিবরণ ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মূলতঃ আছে প্রধান ঋত্বিক ও তার সহকারীদের ক্রিয়াকর্মের কথা। এরা ঋক্‌মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন; দেবতা আহ্বান করতেন। প্রধান ঋত্বিককে বলা হ'ত হোতা। কারণ, দেবতা আহ্বানে তাঁর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। এই হোতা ও তাঁর সহকর্মীদের কথাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাধান্য পেয়েছে; তবে অনেক জায়গায় যযুর্বেদীয় ঋত্বিক অধ্বর্যু ও তাঁর সহকারীদের কথাও এখানে এসে গেছে। আর এসেছে সামবেদীয় ঋত্বিক উদ্গাতা ও তাঁর সহকারীদের প্রসঙ্গ। বৈদিক যজ্ঞে হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা—এই তিন শ্রেণীর

১-২ রামেন্দ্র রচনাবলী—৫ম খণ্ড (মাঘ ১৩৫৭)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—নিবেদন পৃঃ ।৴০-॥০।

ঋত্বিকের প্রয়োজন হ'ত। অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে এঁরা একযোগে নিজ নিজ কাজ করতেন। হোতা পদ্য ও ছন্দোময় ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার আহ্বান করতেন। অধ্বর্যু গদ্যময় যজুর্মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেন। আর উদ্গাতা সামমন্ত্র গান করতেন। যাগ-যজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও সকল শ্রেণীর ঋত্বিকের কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নেই বটে, তবে এ থেকে বৈদিক যজ্ঞের বিপুল ঐশ্বর্য-আড়ম্বর ও সুমহান আদর্শ-চেতনার একটি স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকদের পক্ষেও এ গ্রন্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। এ জন্যে অনুবাদক ও টীকাকার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কৃতিত্ব বড় কম নয়। সহজ ও প্রাঞ্জল বাংলায় তিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করেছেন। বৈদিক যুগের ধ্যান-ধারণার সুদুর্গম বন্ধুর পথে যাত্রা করেও তিনি সাধারণ পাঠকদের কথা ভুলে যান নি। বরং সর্বত্রই অনুবাদ করেছেন পাঠক-সাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু তাই বলে অনুবাদ কোথাও হালকা বা লঘু হয়ে পড়েনি। আলোচ্য বিষয়ের গাম্ভীর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বত্রই লেখক সুনির্বাচিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাক্য যোজনা করেছেন বেদ-ব্রাহ্মণের পবিত্রতা ও আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে। এক কথায় আদর্শদীপ্ত, সংযত বাগ্‌ভঙ্গী এই অনুবাদকে এক বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তাই অকপটে বলা চলে, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যেও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি বিশেষ স্থান আছে। মৌলিকতা বা অভিনবত্বের জন্যে নয়, প্রদীপ্ত দেশপ্রেম, ঐকান্তিক ধর্মপ্রাণতা ও অপরূপ সাহিত্যিক অভিরুচির জন্যেই তাঁর এই অনুবাদ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন-লাভের ছাড়পত্র পেয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিষয়-বস্তু নিয়ে আলোচনা করলে এই উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করা সহজ হবে। অবশ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম দু'টি অধ্যায়ের অনুবাদ করেছিলেন পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের অন্তর্গত। চল্লিশ অধ্যায়ে এই ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ। সকল সোম-যজ্ঞের প্রকৃতিস্বরূপ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ দিয়ে এর আরম্ভ। জ্যোতিষ্টোম নাম হ'ল কেন? না, অগ্নি ঊর্ধ্বে উঠে জ্যোতিস্বরূপ হলেন। দেবগণ সেই জ্যোতির স্তব করলেন। সেইজন্যে নাম হ'ল জ্যোতিস্তোম। সেই জ্যোতিস্তোমকে দেবগণের প্রীত্যর্থে পরোক্ষ নামে জ্যোতিষ্টোম বলে ডাকা হয়।[৩] গোষ্টোম, আয়ুষ্টোম প্রভৃতি বিবিধ সোমযাগের মধ্যে সকলের প্রথমে স্থান জ্যোতিষ্টোমের। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটি সংস্থা। তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র,—এই চারটি সংস্থা পর পর বর্ণিত হয়েছে। এই চারটির মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি, অর্থাৎ সকল অনুষ্ঠানই অগ্নিষ্টোমে উপদিষ্ট হয়েছে। উক্‌থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র বিকৃতি, অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম-সাধারণ অনুষ্ঠান ব্যতীত কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠান এতে উপদিষ্ট হয়েছে। এইজন্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথমে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞই বর্ণিত হয়েছে। অগ্নিষ্টোমের প্রারম্ভে ঋত্বিক-বরণ অনুষ্ঠিত হ'ত। কিন্তু ঋত্বিক-বরণ হোতার সম্পাদ্য অনুষ্ঠান নয়। তাই সে অনুষ্ঠানকে ঋগ্বেদ-অনুসারী বলা যায় না। সেজন্যে প্রথমে দীক্ষণীয়েষ্টি অনুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আরম্ভ হয়েছে।[৪] ইষ্টিকর্মও

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩য় পঞ্চিকা : ১৪শ অধ্যায় ; ৫ম খণ্ড।

৪ রামেন্দ্র-রচনাবলী। পৃঃ ৩-৪।

অধ্বর্যু করে থাকেন, অতএব এ কর্মও যজুর্বেদ-অনুসারী। কিন্তু ইষ্টিকর্মের অন্তর্গত যাজ্যাপাঠ[৫] ও অনুবাক্যাপাঠ[৬] হোতার করণীয়ের মধ্যে পড়ে। এরা ঋগ্বেদীয় অনুষ্ঠান। তাই ইষ্টিবিধান না জানলে যাজ্যা ও অনুবাক্যা পাঠ কখন করতে হবে, তা' জানবার উপায় থাকে না। সেজন্যে ইষ্টিবিধান ঋগ্বেদীয় হৌত্র অনুষ্ঠান না হলেও এই ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের প্রথমে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বর্ণনার প্রাক্কালে ইষ্টিবিধান করা হয়েছে।

ঋগ্বেদানুসারী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে ইষ্টিবিধান বর্ণনার যে কারণ এখানে বলা হ'ল, তা, মূলতঃ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী। অনুবাদকে সহজ ও সর্বজন-বোধ্য করার ব্যাপারে তিনিও যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, উপরের এ আলোচনা থেকেই তা' প্রমাণিত হবে।

প্রথম অধ্যায়ে দীক্ষণীয় ইষ্টি, তার প্রশংসা, যজমানের সংস্কার, তার যাজ্যা, অনুবাক্যা সংযাজ্যা ও সত্যকথন বর্ণিত হয়েছে। তারপর দীক্ষার পরদিন প্রাতঃকালে সম্পাদ্য অগ্নিষ্টোমের আরম্ভসূচক ইষ্টিযজ্ঞ প্রায়ণীয়াদি বিধানের জন্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ। এখানে প্রায়ণীয় ইষ্টি ও সোমযাগের সমাপ্তিসূচক ইষ্টিযজ্ঞ উদয়নীয় ইষ্টি ও তার দেবতাদি বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ের আরম্ভ সোম আনয়নের দিক-নির্ণয় প্রসঙ্গ দিয়ে। তারপর সোম আনয়নের মন্ত্র বর্ণনা করে আনীত সোমকে শকট থেকে নামাবার বিধান। পরবর্তী অংশে বর্ণিত হয়েছে সোমক্রয়ের পর ক্রীত সোমের সম্বর্ধনার্থ ইষ্টিযজ্ঞ 'আতিথ্য ইষ্টি'র কথা। প্রসঙ্গতঃ মূলের অনুসরণে অগ্নিমন্থন মন্ত্র ও আতিথ্যেষ্টি-মন্ত্রবিধান বর্ণনা করে তৃতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে স্থান পেয়েছে যাগ-যজ্ঞের আরও বহু বিচিত্র বর্ণনা। বহু উপাখ্যান, বহু কিংবদন্তী, বহু ক্রিয়া-কর্ম, বহু অর্চনা-আরাধনার কাহিনী। অগ্নিষ্টোমের পর একে একে এসেছে অগ্নিষ্টোম-উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, গবাময়ন, দ্বাদশাহ, অগ্নিহোত্র, সোমযজ্ঞ ও রাজসূয়ের কথা; প্রতিটি নাম, অনুষ্ঠান আর ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িত বহু ইতিহাস ও আখ্যায়িকা। যেমন, ওঁ-নামের সৃষ্টিকথা,[৭]—

> প্রজাপতি কামনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মিব। তিনি তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক, এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন; তৎপরে সেই লোকসকলের পর্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্যালোচনায় সেই লোকসকল হইতে তিনটি জ্যোতি জন্মিল; পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু ও দ্যুলোক হইতে আদিত্য জন্মিল। তখন তিনি সেই তিন জ্যোতির পর্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্যালোচনায় তিন বেদ জন্মিল। অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ ও আদিত্য হইতে সামবেদ জন্মিল। তখন তিনি সেই বেদের পর্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্যালোচনায় সেই বেদ হইতে তিন শুক্র (জ্যোতিঃপদার্থ) জন্মিল; ঋগ্বেদ হইতে ভূঃ, যজুর্বেদ হইতে ভুবঃ, সামবেদ হইতে স্বঃ জন্মিল। তখন

৫-৬ যাগের পূর্বে হোতা বা তাঁর সহকারী কর্তৃক উচ্চারিত যাগ-মন্ত্র।

৭ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ৫ম পঞ্চিকা: ২৫শ অধ্যায়, পৃঃ ৩৫৯—৩৬০।

তিনি সেই শুক্রের পর্যালোচনা করিলেন। তাঁহার পর্যালোচনায় তাহা হইতে তিন বর্ণ জন্মিল;—অকার, উকার ও মকার। তিনি সেই তিন বর্ণকে একত্র যোগ করিলেন; তাহাতে তাহা ওঁ হইল। এই জন্য ওঁ বলিয়াই প্রণব করে; ঐ স্বর্গলোকও ওঁ-স্বরূপ; ঐ যে আদিত্য তাপ দেন, তিনিও ওঁ-স্বরূপ।

এ ছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে বহু উপাখ্যান। সেগুলোর মধ্য দিয়ে বৈদিক যজ্ঞের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে যজ্ঞে পুরোডাশ বা চাউলের রুটি প্রদান ও যাজ্ঞিকদের সেই রুটি ভক্ষণের তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যাক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, এই যে যজ্ঞে পুরোডাশ প্রদান, এর দ্বারা পশু হননেরই (আলম্ভন) কাজ হয়। পুরোডাশের উপকরণ ধানের খড় হ'ল পশুর লোম। তুষ হ'ল চর্ম আর ক্ষুদ হ'ল রক্ত। এ ছাড়া চাউল থেকে প্রস্তুত রুটির বিভিন্ন অংশ হ'ল মাংস। আর চাউলের যা কিছু সার বা কঠিন ভাগ তা' হ'ল অস্থি। অতএব, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে, যে পুরোডাশ দ্বারা যাগ করে, সে পশুগণের সকল যজ্ঞভাগ দ্বারাই যাগ করে। একটি আখ্যায়িকার[৮] মধ্য দিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই পশু-প্রতীক পুরোডাশের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা রামেন্দ্রসুন্দরের বর্ণনাগুণে আখ্যায়িকা হয়ে উঠেছে সহজ ও সুখপাঠ্য; বলা হয়েছে,—

"[পুরাকালে] দেবগণ পুরুষকে (মনুষ্যকে) পশুরূপে আলম্ভন (যজ্ঞে হনন) করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই হননোদ্যুক্ত পুরুষ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অশ্বে প্রবেশ করিল। সেই জন্য অশ্ব যজ্ঞযোগ্য হইল। অনন্তর যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই পুরুষকে দেবগণ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিলেন; সেই পুরুষ (তখন) কিম্পুরুষ হইল।

তাঁহারা অশ্বের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই হননোদ্যুক্ত অশ্ব হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও গরুতে প্রবেশ করিল। সেই হইতে গরু যজ্ঞের যোগ্য হইল। দেবগণ সেই যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অশ্বকে বর্জ্জন করিলেন; সেই অশ্ব (তখন) গৌর-মৃগ হইল।

তাঁহারা গরুর আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই বধোদ্যুক্ত গরু হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অবিতে (মেষে) প্রবেশ করিল। সেই হইতে অবি যজ্ঞের যোগ্য হইল। তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত গরুকে বর্জ্জন করিলেন; সে গবয় হইল।

তাঁহারা অবির আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই বধোদ্যুক্ত অবি হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও অজে (ছাগে) প্রবেশ করিল। সেই হইতে অজ যজ্ঞের যোগ্য হইল। দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অবিকে বর্জ্জন করিলেন; সে উষ্ট্র হইল।

সেই যজ্ঞভাগ অজে বহুকাল ধরিয়া ক্রীড়া করিয়াছিল। সেই হেতু এই যে অজ, সে পশুগণ মধ্যে (যজ্ঞে) সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

---

৮ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ২য় পঞ্চিকা: ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ১১২—১১৩।

তাঁহারা অজের আলম্ভনে উদ্যত হইলেন। সেই বধোদ্যুক্ত অজ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল ও এই (পৃথিবীতে) প্রবেশ করিল। সেই হইতে এই (পৃথিবী) যজ্ঞের যোগ্য হইল। তখন দেবগণ যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত অজকে বর্জন করিলেন; সে শরভ হইল।

এই সেই পশুগণ (যজ্ঞভাগ) মেধ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় অমেধ্য (যজ্ঞের অনুপযুক্ত বা অপবিত্র); সেইজন্য ইহাদের (মাংস) ভোজন করিবে না।

পরে পুরোডাশের বিধান—'তমস্যাং…………য এবং বেদ'

"এই পৃথিবীতে (প্রবিষ্ট) যজ্ঞভাগকে দেবগণ অনুগমন করিয়াছিলেন। অনুসৃত হইয়া সে ব্রীহি (ধান্য) হইল। সেইজন্য যখন পশুর (হননের) পর (ধান্য হইতে প্রস্তুত) পুরোডাশ নির্বপণ (আহুতি দান) করা হয়, তখন আমাদিগের যজ্ঞভাগযুক্ত পশু দ্বারাই ইষ্ট ঘটে, কেবল পশু দ্বারাই ইষ্ট ঘটে। যে ইহা জানে, তাহারও যজ্ঞভাগ-যুক্ত পশু দ্বারাই ইষ্ট ঘটে, কেবল পশু দ্বারাই ইষ্ট ঘটে।"

৩

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দেড় বছর পরে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তী গ্রন্থ 'কর্ম্ম-কথা' (১৩২০) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি হ'ল ১৩০১ থেকে ১৩১৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আচার্যদেবের এগারোটি প্রবন্ধের সংকলন। রচনাকালের হিসেবে 'কর্ম্ম-কথা'র সর্বশেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞ' ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলো প্রবন্ধই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে লেখা। অতএব, কর্ম-কথার প্রবন্ধগুলো থেকেই হিন্দু-ধর্ম ও প্রাচ্য-দর্শনের পথযাত্রী রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারার পরিচয় মিলবে। আর মিলবে, বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয়।

কর্মকে পরিহার করতে পারে না মানুষ। কর্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না,—এ গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর তা' বোঝাতে চেয়েছেন। এ সম্বন্ধে কর্ম-কথার 'নিবেদন'-এ তিনি বলেছেন,

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" এই বাক্যকে আমি ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলি দাঁড় করাইয়াছি। কর্ম পরিত্যাগে মনুষ্যের ক্ষমতাও নাই এবং অধিকারও নাই, ইহাই আমার মুখ্য বক্তব্য।

এই গ্রন্থের 'বৈরাগ্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে বৈরাগ্যের উপর কটাক্ষ আছে। কিন্তু মনে যেন রাখি, ঐহিক বা পারত্রিক স্বার্থপরতা থেকে যে বৈরাগ্যের জন্ম, যার দ্বারা মানুষে 'জীবনের কর্ম্মভার গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শান্তির আশায় পরার্থপর অশান্তি স্বীকারে কুণ্ঠিত হয়,' সেই বৈরাগ্যই লেখকের কটাক্ষের বিষয়। আচার্য ত্রিবেদী বিশ্বাস করেন, 'আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এই বৈরাগ্যের কখনই প্রশ্রয়' দেননি এবং সেইজন্যই 'গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের উচ্চে' স্থান দিয়েছেন। তা' ছাড়া 'শাস্ত্রানুমোদিত বিশুদ্ধ বৈরাগ্য' নিষ্কাম কর্মপরতা থেকে অভিন্ন বলেই রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা। তাই বৈরাগ্যের প্রতি

কোনোরূপ কটাক্ষপাত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। আসলে কর্ম-কথায় তিনি মহত্তর জীবনাদর্শের অনুধ্যান করেছেন। সত্য ও কল্যাণদৃষ্টির আলোকে বেদপন্থী হিন্দুসমাজের জীবনবেদ ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম প্রবন্ধ 'মুক্তির পথ'[৯]-এ দেখি, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখ-দুঃখের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী দু'টি মতবাদ আলোচনা ক'রে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, অবিমিশ্র সুখ যেমন এ জগতে নেই, তেমনি নেই অবিমিশ্র দুঃখও। আসলে সুখ-দুঃখ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। একে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জ্ঞানের বৃদ্ধিতে দুঃখ নাশের প্রয়াস নিহিত, এই অবধি মাত্র বলা যায়। কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধিতে দুঃখের হ্রাস হবে এবং সুখের মাত্রা বাড়বে, এমন কথা বলা যায় না। কারণ, আমরা যা'কে জ্ঞান বলি, তা' হ'ল জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান।

এ হ'ল এক ভ্রান্তি। জ্ঞান নামক এই ভ্রান্তি থেকেই জগতের উৎপত্তি হয়েছে। হয়েছে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি। অতএব, জ্ঞান নামে পরিচিত এই ভ্রান্তি যতক্ষণ বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ সুখ-দুঃখ পরিহার করা সম্ভব নয়। তাই এই ভ্রান্তির বিলোপ-সাধন করলেই সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হবে এই জগতের অস্তিত্ব। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, এইভাবে ভ্রান্তি-নাশ অতিক্রম করে বিচিত্র সুখ-দুঃখের আশ্রয় এই জগতের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিতে পারলেই যথার্থ মুক্তিলাভ সম্ভব। কারণ, বেদজ্ঞ আচার্য ত্রিবেদী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, মুক্তি অর্থে কেবল দুঃখ থেকে মুক্তি নয়, সুখ থেকেও মুক্তি ; ভ্রান্তির পাশ থেকে মুক্তি, জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি।

মুক্তির পথ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের এই আলোচনায় বৈদিক ভারতবর্ষের মুক্তিতত্ত্বের কথাই ধ্বনিত হয়েছে। এই মুক্তিবাদই ভারতবর্ষের জনসমাজকে একদিন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছিল। অতএব, রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বেদপন্থী ভারতপথিক। ভারত-সাধনার পথ ধরেই মুক্তি-পথের অভিযাত্রী হয়েছেন তিনি। প্রাচীন ইয়োরোপের খৃষ্টীয় ধর্মপন্থা নয়, আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ নয়, বৈদিক ভারতবর্ষের মোহ-মুক্ত কল্যাণাদর্শই তাঁকে এখানে পথ দেখিয়েছে।

ঠিক একই কথা বলা চলে পরবর্তী আলোচনা 'বৈরাগ্য'[১০] সম্বন্ধে। বৈরাগ্যের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করে এখানেও রামেন্দ্রসুন্দর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা' প্রাচীন ভারতীয় কল্যাণাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। গীতার নিষ্কাম কর্মাদর্শকেই লেখক এখানে গ্রহণ করেছেন। আমাদের ধর্মশাস্ত্রের বিধানকে উদ্ধার করে বলেছেন, গৃহাশ্রমের পর আশ্রম নেই, কর্মে আমাদের অধিকার হোক, ফল-কামনায় যেন আমাদের রতি না থাকে, ফলকামনা আমাদের প্রবৃত্তির হেতু না হয় যেন ; কর্ম পরিত্যাগে যেন আমাদের আসক্তি না জন্মে।

ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মসাধনার কথা বলতে গিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে বিজ্ঞান-সচেতন রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের জীবনের বিরোধের চিত্রটিকেও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

৯. প্রথম প্রকাশ : সাধনা, চৈত্র ১৩০১।

১০ প্রথম প্রকাশ : সাধনা, আষাঢ় ১৩০২।

বলেছেন, মানুষের সঙ্গে সমাজের বিরোধ। আর বিরোধ জড়ের সঙ্গে। সন্দেহ নেই, জীবনযুদ্ধে বহু আঘাত-সংঘাত, দুঃখ-যাতনা সহ্য করে মানুষকে জীবনপথে এগোতে হয়। কিন্তু তাই বলে কর্মত্যাগের অধিকার নেই কারও। আসক্তি ত্যাগ করতে হবে; কর্মাচরণ করতে হবে কর্তব্যবোধে। ফলকামনাশূন্য এই যে কর্মযোগ, এই হ'ল যথার্থ বৈরাগ্য। এ থেকেই জন্মে শুদ্ধ জ্ঞান। এই বৈরাগ্যেরই ফল হ'ল ভক্তি, তৃপ্তি ও মুক্তি।

কর্মত্যাগে মুক্তি নেই, গৃহ ও সমাজ-বন্ধনকে অস্বীকারের মধ্যে কল্যাণ নেই। গৃহধর্ম ও সমাজজীবনকে এড়িয়ে আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগ্য-সাধনা সুফল দিতে পারে না। নিষ্কাম কর্মযোগী যিনি, জীবনসংগ্রামে দুঃখ-যাতনাকে বরণ করার মধ্য দিয়েই তাঁর দুঃখ-মুক্তি ঘটে। এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন:

> "মুক্তিকামনা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু মুক্তির পথ তত সরল নহে। মানবিকতার মাহাত্ম্য খর্ব্ব করিয়া, মনুষ্যকে জীবনহীন লোষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করিয়া, দুঃখ হইতে এক রকমের মুক্তি লাভ না ঘটিতে পারে, এমন নহে; কিন্তু তাহা জড়ের বাঞ্ছনীয়, মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। সংসারের শোণিত-কর্দ্দমময় পিচ্ছিল ক্ষেত্রে সহস্রবার স্খলিতপদ হইয়া, আততায়ীর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, জীবন-দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকাতেই মনুষ্যের গৌরব; এবং এই জীবন-দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহারই চরম ফল দুঃখমুক্তি।"

আশাবাদী রামেন্দ্রসুন্দর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, একদিন মানুষ দুঃখমুক্তির এই অমৃত-পথের সন্ধান পাবে। তখন কর্মানুষ্ঠান ও কর্তব্য-সাধনাকেই সে তার জীবনের স্বরূপ বলে জ্ঞান করবে। দুঃখের স্বীকৃতিকেই জীবের উন্নতির প্রধান লক্ষণ বলে ধরে নেবে। দুঃখভোগ-শক্তিকেই মানুষ প্রকৃত গৌরব বলে মেনে নেবে; এবং আপনার আত্মীয়-পরিজন আর স্বজাতি ও বিশ্বজনের প্রতি কর্তব্য করে পরম প্রীতি ও অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করবে। আচার্য ত্রিবেদীর মতে, এই হ'ল প্রকৃত বৈরাগ্য। অর্থাৎ, রামেন্দ্রমানস এখানে আমাদের শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথকেই অনুসরণ করেছে। এই পথ-পরিক্রমা আরও জটিল ও রহস্যময় হয়েছে পরবর্তী প্রবন্ধ 'জীবন ও ধর্ম্মে'।[১১] বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের বোধকে মিলিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে জীবন ও ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সঙ্গে করেছেন উভয়ের সম্বন্ধ-নির্ণয়। সাংখ্যদর্শনের পটভূমিকায় প্রথমেই জীবন ও ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি। জীবন কি? না, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন। ধর্ম কা'কে বলে? না, যা'র দ্বারা এই সম্বন্ধ স্থাপন ও সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রয়াস সফলতা লাভ করে। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে 'তুমি' ও 'আমি'র অর্থ বুঝিয়ে বলেছেন লেখক। আমি বলতে বিষয়ীকে বোঝায়। অর্থাৎ, যে কর্তা, যে ভোক্তা, যে সুখী, যে দুঃখী, তা'কে বোঝায়। আর 'তুমি'র অর্থ হ'ল, আমার বাইরে যা' কিছু আছে, তা'র সবই। অর্থাৎ 'আমি' ছাড়া সমগ্র জগৎকে 'তুমি' অর্থে নির্দেশ করা হয়েছে। আমার প্রত্যক্ষগোচর ও

১১. প্রথম প্রকাশ: সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০০।

অনুভূতিগোচর সবই 'তুমি'। আবার অনুভূতির আছে প্রকারভেদ, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। এদের মেলামেশায় ও মাখামাখিতে গড়ে ওঠে যে প্রবাহ, তা নিয়েই আমার সমগ্র জীবনব্যাপী আমি। এক কথায় অনুভূতিই সব। সমগ্র বাহ্য-জগৎটা আমার অনুভূতি ও আমার অনুভূতিই সমগ্র বাহ্য-জগৎ। এই অর্থে উভয়ে অভেদ। সুতরাং আমি ও আমি-ছাড়া উভয়ই এক। একেকে ছেড়ে অন্যের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ ছাড়া অন্য এক যুক্তির কথাও লেখক বলেছেন। সেই যুক্তিটি হ'ল এই যে, আমি আছি, এটা যেমন এক অর্থে ঠিক, তেমনই আমার বাইরে আমা-ছাড়া একটা বাহ্য জগৎ খাড়া করে সেই বাহ্য জগতে আমাকে একটা বিশেষ পথে চলতে হচ্ছে, এটাও অন্য অর্থে ঠিক। আমি কেন আছি, এ কথার কোনো উত্তর নেই। কেন আছি, কেন এরূপ হ'ল, ওরূপ হ'ল না, তা'রও কোনো জবাব মেলে না। এখানেই অজ্ঞতার প্রশ্ন এসে যায়। হয়তো অজ্ঞতা আছে ও অজ্ঞতাবশতঃ উত্তর দেবার নানাবিধ প্রচেষ্টা আছে। এই অজ্ঞতাকেই জ্ঞানের আবরণ দিয়ে সাংখ্যদর্শন নাম দিয়েছে প্রকৃতি। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রকৃতির দোহাই দিয়ে থাকে। প্রকৃতির প্রভুত্বে ও প্রকৃতির বিধানেই তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করি আমি। আমিও যেমন সুখদুঃখভোগী একটা কিছু, তুমিও ঠিক সেইরূপ। অথচ তুমি আমার কল্পিত, তুমি আমার অন্তর্গত। কিন্তু তুমি থাক আর নাই থাক, প্রকৃতির নিয়োগে আমি তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে তবু বিশ্বাস করছি। মেনে নিচ্ছি, তুমি আছ এবং অন্যান্য আরও অনেক কিছু আছে। তা'রা সকলেই তুমি-স্থানীয়। এই অর্থে বাহ্য জগৎটাই 'তুমি'। তাহলে দেখা গেল, 'আমি' অর্থে আমি; আর 'তুমি' অর্থে আমি-ছাড়া আর সব। কিন্তু এর মূলে যে বিরোধ রয়েছে তা' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, আমাতে তুমি ও তোমা নিয়ে আমি ; এই অর্থে উভয়ে ভেদ নেই। আবার,—আমা ছাড়া তুমি স্বতন্ত্র ; তোমার অস্তিত্ব আমাকে ছেড়ে, এই অর্থে উভয়ে সম্পূর্ণ প্রভেদ। এই বিরোধ নিয়েই জীবনের উৎপত্তি। এই বিরোধেই জীবনের সমাপ্তি। রামেন্দ্রসুন্দর একেই বলেছেন, 'প্রকৃতির খেলা'। খেলা কেন ? না, মূলের এই বিরোধ সর্বত্র বিদ্যমান বলে। আমায়-তোমায় একতা, অথচ আমায়-তোমায় ভিন্ন ভাব বলে। তোমার স্বার্থে আমার স্বার্থ ; অথচ তোমার সংহারে আমার পূর্তি বলে। আমি বলতে, আমার ভৌতিক শরীর নয়। সাংখ্যদর্শন ও আধুনিক জীববিজ্ঞানের আলোকে রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, এক হিসেবে আমার শরীরও জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত ও তার সঙ্গে একাত্ম। অর্থাৎ, সমগ্র জগতের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক খণ্ড খণ্ড করে আলোচনা করলে এই রকম দাঁড়ায় ; আমি-ছাড়া সমগ্র জগতের মধ্যে অর্থাৎ সমগ্র তোমার মধ্যে প্রথমে আমার সঙ্গে আমার শরীরের সম্বন্ধ, পরে পুত্র-পরিবার ও মানবজাতির সম্বন্ধ এবং তারপরে আসে জীব ও জড়জগৎ ও সর্বশেষে আমার রচিত ও কল্পিত অতীন্দ্রিয় মানসরাজ্য। এইভাবে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ নির্ণয়ে আমার জীবন। এই সম্বন্ধ নির্ণয় থেকেই ধর্মের ব্যবস্থা। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এই প্রবন্ধে সেই সম্পর্কের

ভূমিকা লিখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রাকৃতিক নির্বাচনের আলোকে এবং সাংখ্যদার্শনিকের দৃষ্টিতে জীবন ও ধর্মের রহস্যময় সম্পর্কের কথা বিচার করতে গিয়ে বলেছেন,

"তুমি আমার মিত্র ও তুমি আমার ঘোর শত্রু। তোমাকে লইয়া আমি। তোমাকে ছাড়িলে আমার কিছু থাকে না; অথচ তোমা হইতে স্বতন্ত্রভাবেই আমার অস্তিত্ব; তোমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়াই আমার জীবনের ব্রত। এরূপ ক্ষেত্রে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ নির্ণয়ই সমস্যা; তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য নির্ণয়ই আমার জীবন। সেই সম্বন্ধ নির্ণয় ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের অপর নাম ধর্ম্মব্যবস্থা।

তোমার প্রতি কর্ত্তব্য, ইহার অর্থ আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য; আমার জাতি, জ্ঞাতি, বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য; মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য; জীব ও জড়ের উপর কর্ত্তব্য ও আমার আশা ভয় স্বপ্ন কল্পনার প্রতি কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের সমষ্টি ধর্ম্ম। মূলে বিরোধ; সামঞ্জস্যের অভাব। ধর্ম্ম সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায়। ধর্ম্মের গতি সামঞ্জস্যের পূর্ণতার অভিমুখে;"

অতএব দেখছি, রামেন্দ্রসুন্দর এখানেও আশাবাদী। ধর্ম আমাদের পূর্ণতার দিকে নিয়ে চলেছে, এই তাঁর প্রত্যয়। ধর্ম কি? না, কর্তব্যই হ'ল ধর্ম। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম-সাধনার মধ্যে ধর্মের অধিষ্ঠান।

ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে পরবর্তী প্রবন্ধ 'স্বার্থ ও পরার্থে'।[১২] তবে এখানে জীবনরহস্যের আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। ধর্ম ও কর্মের ব্যাখ্যা করেছেন স্বার্থ-পরার্থের বিরোধ-ভূমি থেকে যাত্রা শুরু করে। বলেছেন, স্বার্থ ও পরার্থ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই দু'টির বিরোধ বহু দিন থেকে চলে আসছে। এই বিরোধ নিয়েই সমাজজীবন। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ধর্ম ও অধর্মের যে দ্বন্দ্ব, তা'রও মূল এখানেই। স্থূলতঃ, স্বার্থের অভিমুখে, প্রবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তা'র নাম অধর্ম। পরার্থের অভিমুখে, নিবৃত্তির অভিমুখে যে চেষ্টা, তা'র নাম ধর্ম। ধর্মে-অধর্মে, স্বার্থে-পরার্থে বিরোধ ইতর জীবের মধ্যে নেই, সামাজিক মানুষের মধ্যে আছে। আছে বলেই সমাজের যা' কিছু ইতিহাস। তবে সামাজিক মানুষের সকল কাজকে স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি এই দু'টি মাত্র পর্যায়ে ফেলেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। সূক্ষ্ম হিসেবে স্বার্থপ্রবৃত্তি, স্বার্থ-নিবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তি এই তিনটি পর্যায়ে ফেলেছেন; এবং তারপর জীবনে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাকে ব্যাখ্যা করেছেন অভিব্যক্তিবাদ অনুযায়ী, ইউটিলিটির মতানুসারে। উদাহরণ সহযোগে স্বার্থপ্রবৃত্তি, স্বার্থনিবৃত্তি ও পরার্থপ্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এই তিনের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টাতে জীবন। স্বার্থ কিছু বজায় না রাখলে জীবন টেকে না। এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। আবার পরার্থের জন্যে স্বার্থ উৎসর্গ করতে হবে, নইলে সমাজ চলবে না, সমাজের মঙ্গল হবে না। আর, সমাজের মঙ্গল না হ'লে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল নেই। "স্বার্থসাধন ব্যক্তিজীবন রক্ষার উপযোগী; পরার্থসাধন সমাজের জীবনের জন্য আবশ্যক।" মানুষ দুর্বল জীব। সমাজে না থেকে জীবনযুদ্ধ চালান তার পক্ষে কঠিন।

১২. প্রথম প্রকাশ: সাধনা, বৈশাখ ১৩০০।

তাই নিজের লোকসান স্বীকার করেও সমাজের সমবেত বলের নিকট মাথা নোয়াতে হয় তাকে। বাধ্য হয়েই সমাজের জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে হয়। এই হ'ল অভিব্যক্তির প্রণালী ; ইউটিলিটির মতানুযায়ী ব্যাখ্যা। কিন্তু এ ব্যাখ্যায় জীবনের সামঞ্জস্যবিধান দুরূহ ব্যাপার। কতটুকু নিজের জন্যে রাখব, আর কতটুকু পরের জন্যে ছেড়ে দেব, তার মীমাংসা এ থেকে হয় না। এদিকে স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করার উপদেশ অনেকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু স্বার্থ বিসর্জন করবো কেন? এ প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন জবাব আসে নানারকম। এদের মধ্য থেকে চার শ্রেণীর উত্তর বা মতবাদ বেছে নিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। আলোচ্য প্রবন্ধে তাদের দোষ-গুণ ও ভাল-মন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক শ্রেণীর উপদেশ-প্রদাতারা বলে থাকেন, ধর্ম আচরণ কর, সুখে থাকবে। নিবৃত্তির পথে চলবে, প্রবৃত্তি অনুযায়ী ফল পাবে বলে। ২য় প্রকার মতবাদে বিশ্বাসীরা পরকালের দোহাই দিযে থাকেন। তাঁরা বলেন, ধর্মপথে চললে পরকালে সুখ অবধারিত। স্বার্থ-বিসর্জন সম্পর্কে তৃতীয় উত্তর হ'ল, ধর্মের জয় সর্বত্র। প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর, ফল ভাল হবে। তোমার না হোক অন্য সকলের ভাল হবে। আর সকলের যদি ভাল হয় তো তোমারও ভাল। অতএব, দেখা যাচ্ছে, উপরের তিনটি মতবাদের মধ্যে লাভালাভের প্রশ্ন জড়িত, ফলের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। তাই এই তিনটি মতবাদকেই যুক্তির অসমতলে দাঁড় করিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তিনি সমর্থন করেছেন চতুর্থ এক সম্প্রদায়ের উত্তর—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্তব্য কর্মকে। তাঁরা বলেন, কর্তব্যবোধে ধর্ম আচরণ কর। সুখের আশা করো না ; সুখ অনিশ্চিত। দুঃখ দেখে ভয় পেয়ো না। মনে রেখো, দুঃখ জীবনের সহচর। কর্ম করা কর্তব্য ; একমাত্র এই বোধ নিয়ে ধর্মাচরণ কর। ফলের আকাঙ্ক্ষা করো না। ইহকালে কি পরকালে সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়, সমাজের লাভ-ক্ষতির গণনা করে ইউটিলিটির হিসেব ধরে নয়, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্তব্যপালন যার প্রকৃতিগত তিনিই প্রকৃত ধর্মাচারী। এই ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্তব্যপালন ও ধর্মাচরণের উপদেশ দেয় রামায়ণ। তাই রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, রামায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য।

কিন্তু এই যে ধর্মাচরণ, এর মূলে আছে প্রবৃত্তি। পরবর্তী প্রবন্ধ 'ধর্ম্মপ্রবৃত্তি'তে[১৩] রামেন্দ্রসুন্দর তা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে ধর্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ ও মূল অন্বেষণ করেছেন তিনি। করেছেন অপরূপ সুন্দর এক পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায়। কাহিনীটি রাজা দিলীপের। বশিষ্ঠের হোমধেনুকে বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবনদানে উদ্যত হয়েছিলেন ঐ রাজা। ইউটিলিটির মতে, দিলীপের হিসেবে ভুল হয়েছিল ; ভাবপ্রবণতার বশে তিনি বিচারবিমূঢ় হয়েছিলেন। কারণ, গরুর জীবনের চেয়ে তাঁর জীবনের মূল্য অনেক বেশী। রাজা দিলীপ এক্ষেত্রে তাঁর স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিলেন ; ইউটিলিটি-তত্ত্বে নির্ভর করে লাভ-ক্ষতি গণনা করেন নি। এই যে বিচারমূঢ়তা, ধর্মপ্রবৃত্তি থেকেই এর উদ্ভব। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, সুস্থ ও সবল মানবাত্মাই অকুণ্ঠিতভাবে এ ধরনের বিচারমূঢ়তা দেখাতে পারে।

১৩. প্রথম প্রকাশ : সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০৪।

এ থেকে সমাজজীবনের অভিব্যক্তি সূচিত হচ্ছে। এই স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি সমাজকে মহত্তর উন্নয়নের পথ-নির্দেশ করেছে। ধর্মপ্রবৃত্তির বিশ্লেষণ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর এই বক্তব্যকে এখানে উপস্থাপিত করেছেন। ইংরেজী Conscience ও আমাদের শাস্ত্রের অন্তর্যামী বোঝাতে 'সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি' কথাটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রবৃত্তি মানুষের মনে সর্বক্ষণ অশান্তি জাগিয়ে রাখছে। ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা লোকশাস্ত্রের পথ নয়, এর প্রভাবে মানুষ অন্য এক পথের সন্ধান পেয়ে থাকে। তখন সে সকল অনুরোধ ও উপদেশ উপেক্ষা ক'রে, সকল ভীতিপ্রদর্শন তাচ্ছিল্য ক'রে আলাদা এক পথ ধরে এগোয়। সে পথ উন্নতির পথ; অভিব্যক্তির পথ। অন্তরতম প্রদেশ থেকে উত্থিত সেই সাবধান-বাণী তাকে কল্যাণের পথে চালনা করে; সেই অকৃত্রিম, সরল, সুস্থ ধর্মসংস্কার তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু মানুষের এই যে স্বাভাবিক সহজ সংস্কার বা ধর্মপ্রবৃত্তি, এর উৎপত্তি কোথা থেকে? মনুষ্যপ্রকৃতির আলোচনা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যা করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, সমাজ-রক্ষার জন্যে "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে কালসহকারে"-এর বিকাশ। মনুষ্য ভিন্ন ইতর জীবে এর অস্তিত্ব নেই। এই হ'ল মনুষ্যত্বের বিশিষ্টতা, মনুষ্যত্বের প্রধানতম লক্ষণ। এরই নাম স্বাভাবিক ধর্ম-প্রবৃত্তি। যা'তে সমাজের মঙ্গল, যা' ধর্ম, তা'রই অনুষ্ঠানে এই সুস্থ, সহজ, স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি উপদেশ দেয়। সমাজের মঙ্গলের অর্থ অধিক লোকের অধিক হিত। কিন্তু কি ক'রে বুঝবো, কোন্ কাজে হিত, আর কিসে অহিত? রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তি নয়, স্বভাবের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধর্মপ্রবৃত্তিই এ ব্যাপারে আমাদের পথ দেখাবে। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে আশাবাদী। এখানে ভবিষ্যৎ মানবসমাজের কল্যাণময় চিত্রটিকে কল্পনায় নিরীক্ষণ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, এ প্রবন্ধের জায়গায় জায়গায় কল্পনা যেন উচ্ছ্বসিত। বৈজ্ঞানিক চেতনা ও দার্শনিক যুক্তি-জালের প্রাচীর ডিঙিয়ে বাঁধনহীন কল্পনাস্রোত এখানে যেন কবিত্বের রঙ্‌মহলে অভিসার করেছে। যেমন ধর্মপ্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলছেন,

"ইনিই অন্তর্যামী হৃষীকেশ। মনুষ্যের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কে আসিয়া নবাগত অপরিচিতের মত দেখা দেয়, মানুষ তাহাকে ভাল করিয়া যেন চেনে না; মানুষের কাছে সে যেন নূতন। স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিতে যখন সে ভিতর হইতে কথা কয়, মনুষ্য তখন স্তম্ভিত হয়; মনুষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মত তখন তাহার আদেশবাণী মানিয়া চলে। জৈব প্রবৃত্তি মনুষ্যকে যখন আত্মমুখে চালাইতে যায়, তখন সে সেই প্রবৃত্তির মুখে বল্‌গা ধরিয়া দাঁড়ায়, তাহার গতি রোধ করে, তাহার বেগ সংযত করে। সে নবাগত অপরিচিত, কিন্তু কৃত্রিমতাশূন্য; স্বভাব হইতে তাহার উৎপত্তি; পৃথিবীর মলিন মৃত্তিকায় তাহার অঙ্গ গঠিত হয় নাই। মনুষ্য তাহাকে ভয় করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে শ্রদ্ধা করে, তাহাকে ভক্তি করে, অবহেলে তাহাকে প্রেমের আলিঙ্গন দিতে শিক্ষা করে। মানবের প্রিয়তম সখা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? এতদিন তোমার অদর্শনে মানব যেন ব্যাকুল ছিল। তোমার সিংহাসনে তুমি দৃঢ় হইয়া আসন গ্রহণ কর। মানবাত্মার

সহিত তোমার প্রীতির বন্ধন যেন কখন ছিন্ন না হয়। জীবনের সমরক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শক, তুমি দুর্ব্বল মানবরূপী জীবকে পথ দেখাইয়া দাও, তোমার অনুজ্ঞা পালন করিয়া সে নিশ্চিন্ত, ধন্য ও কৃতার্থ হউক। মরীচিকাভ্রান্ত মৃগের মত মানব এত দিন মিথ্যা প্রলোভনের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আজি কাল্পনিক আশা, কালি কাল্পনিক বিভীষিকা তাহাকে মরুক্ষেত্রে ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল। আজ সে শ্রদ্ধেয় আত্মীয় সহচর পাইয়াছে। আজ সে জীবনে শান্তিলাভ করিবে। আজ তাহার জীবনে দুঃখের রজনী পোহাইবে।"

পরবর্তী প্রবন্ধ 'আচার'-এ[১৪] কর্মকাণ্ডের জগতে অবতরণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। ধর্ম-প্রবৃত্তির অরূপ-জগৎ থেকে আচার-অনুষ্ঠানের রূপময় জগতে নেমে এসেছেন। Morality থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন Legality-র দিকে। বিজ্ঞানবুদ্ধি ও দার্শনিক বোধের আলোকে বেদের কর্মকাণ্ডের যৌক্তিকতা উপস্থাপিত করেছেন।

অধ্যাপক ডয়সেন তাঁর Philosophy of the Upanishads নামক গ্রন্থের শেষাংশে বেদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, মূশা-প্রবর্তিত পুরাতন বিধান ও যীশু-প্রবর্তিত নূতন বিধান, এদের পরস্পর যে সম্পর্ক, বেদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাণ্ডের সম্পর্ক কতকটা সেরূপ। কর্মকাণ্ডের ভিত্তি Legality, আর জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তি Morality ; এই উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ, তার সামঞ্জস্য হতে পারে না। "কর্ম্মকথা"-র 'নিবেদন'-এ রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, কেবল ডয়সেন কেন, এই বিরোধের সামনে এসে অনেক পণ্ডিতেরই খটকা বাধে। কর্মকাণ্ডের সংকীর্ণ গণ্ডী ও তার জটিল বন্ধন দেখে 'মুক্তিপ্রয়াসী বহু সাধু ব্যক্তি' ধৈর্য রাখতে পারেন না। অথচ সকল দেশে সকল কালে মানবসমাজ এই কর্মকাণ্ডকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। সময়ে সময়ে কোনো মহাপুরুষ এসে প্রাচীরের বেড়া ভেঙ্গে মানুষকে স্বাধীনতা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার স্থলে হয় স্বেচ্ছাচারিতা এসে সমাজধর্মকে নষ্ট করবার উপক্রম করে, অথবা 'নূতন একটা প্রাচীর' উঠে "নূতন বেষ্টনের সৃষ্টি" করে। এই প্রসঙ্গে 'কর্ম্মকথা'য় রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টতই বলতে চেয়েছেন, যে-সকল আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে এই কর্মকাণ্ড, 'কোন সমাজই কোনরূপে' তাদের 'একেবারে বর্জ্জন' করতে পারে না। তারা কেবল 'মূর্ত্তি বদল' করে 'আপনাকে প্রতিষ্ঠিত' রাখতে চায়। মানবের ইতিহাস এর সাক্ষী। 'এই ঐতিহাসিক সত্যকে' ভিত্তিহীন বলে উপেক্ষা করলে চলবে না। 'মানব-সমাজ-রূপ জীবন্ত যন্ত্রের আত্মরক্ষণ-প্রয়াস' থেকে এর উৎপত্তি। 'কর্ম্মকথা'র 'আচার' এবং 'ধর্ম্মের অনুষ্ঠান' এই দুই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর এ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমোক্ত প্রবন্ধ 'আচার' নিয়ে আগে আলোচনা করা যাক। রামেন্দ্র-সুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, "সামাজিক আচারের প্রধান উপযোগিতা সামাজিক মানবজীবনের শোভাবর্দ্ধন।" প্রবন্ধটির গোড়ার দিকে আচারের প্রতিকূলে কতকগুলো

১৪. প্রথম প্রকাশ : ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫।

যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন তিনি। বলেছেন, বস্তুতই আচারানুষ্ঠান অনেক সময়ে আমাদের জীবনের স্বাধীনতা হরণ ক'রে নিয়ে জীবনের ভারস্বরূপ হয়। আচারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, "আচারের অনুরোধে কৃত্রিমতার বৃদ্ধি হয় ; কৃত্রিমতায় সত্য-গোপন ঘটে।" কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমাদের শরীরে যে বিকৃতি ও বিরূপতা বর্তমান, তা' গোপনের জন্যে আমরা বসন-ভূষণের আশ্রয় নিয়ে থাকি। কারণ, মনুষ্যদেহের বিরূপত্ব আচ্ছাদন না করলে সাধারণ মানুষের চলে না। কৃত্রিম অলঙ্কার দিয়ে সৌন্দর্য বাড়াবার আবশ্যক হয়। 'স্বাভাবিক বলে বলীয়ান্' ব্যক্তি অলঙ্কারের বোঝা বইতে ঘৃণা বোধ করতে পারেন, ধর্মবলে বলীয়ান্ যিনি, তিনি আচারের দাসত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত হতে পারেন, কিন্তু 'ইতর সাধারণের' এরূপ করলে চলে না। কারণ, প্রকৃতি জগৎকে মানুষের নিকট 'সম্পূর্ণভাবে সুন্দর ও সুখময়' করে গড়েন নি। সে কাজটা প্রকৃতি মানুষের হাতেই দিয়েছেন। কাজেই মানুষকে 'অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয়' দিতে হয় ; 'প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ' করতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চান, মানুষকে এজন্যে সম্পূর্ণ দায়ী করলে চলবে না। কিন্তু যারা জীবনবিমুখ, দারা-সুতকে লোহার শিকল ভেবে জীবনযুদ্ধ থেকে যারা পলায়ন করেন, তারা সমাজবিহিত আচারানুষ্ঠানের প্রতিকূলতা করে থাকেন। যুক্তির অসমতলে দাঁড় করিয়ে এই শ্রেণীর বৈরাগীদের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। সংসার-বিবাগীদের আক্রমণ করেছেন তীক্ষ্ণ ও কঠোর ভাষায়। তবে মনে যেন রাখি, নিষ্কামতা অর্থে বৈরাগ্য শব্দটিকে তিনি এখানে ব্যবহার করেন নি ; সৌন্দর্য-বিরাগ সমাজত্যাগীদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দর জীবনবিমুখ বৈরাগ্যকে কোনোকালেই সমর্থন করেন নি। কারণ, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্র এই বৈরাগ্যের বিরোধী। বেদশাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে পরাশর-প্রণীত নিখিল ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রমকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেন নি। পারমার্থিক বিচারে ব্রাহ্মণ জগৎকে হয়ত অলীক বলতেন, কিন্তু ব্যবহারতঃ এই সমাজকে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা সুন্দর করে তুলবার জন্যে এদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এই যে আগ্রহ, অসুন্দরকে আচার-পালনের দ্বারা সুন্দর করার এই যে আকাঙ্ক্ষা, এরই সমর্থক রামেন্দ্রসুন্দর। এ সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন,

> আমার ধারণা এই যে, অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তোলাই, অকাব্যকে কাব্যে পরিণত করাই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য ও মনুষ্যত্বের গৌরবময় বিশেষণ। যে উপায়ে এই পরিণতি সংঘটিত হয়, তাহা স্বভাবতই কৃত্রিম। আমার বিশ্বাস এই যে, ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেক অশোভন অসুন্দর স্বাভাবিক অনুষ্ঠানকে মহত্তর সমাজজীবনের সহিত কৃত্রিম সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া কৃত্রিম বেশে ও কৃত্রিম ভূষায় সজ্জিত করিয়া সংস্কৃত শোভন ও সুন্দর করিয়া সংসারক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রের বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য।"

এই উদ্দেশ্য সর্বত্র সফল হয়েছে কি না, তা' নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কোনো আচার বা বিধানের দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্তন আবশ্যক কি না, তা'ও বিবেচ্য। কৃত্রিম

বিধানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব হয়, সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পায়, একথাও তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু সব কিছুরই দু'টো দিক আছে। দু'দিক থেকে প্রত্যেক বিষয়কে দেখা উচিত, এই বিবেচনায়, সমাজে সৌন্দর্যবুদ্ধির ক্ষেত্রে আচার-অনুষ্ঠানের সার্থকতা, —এই অবজ্ঞাত দিকটির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উগ্র সমাজ-সংস্কারকগণ যে আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভাঙবার জন্য অতিরিক্ত উৎসুক হয়ে পড়েন এবং ব্রাহ্মণ-প্রণীত শাস্ত্রকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন, তা' কতখানি যুক্তিযুক্ত, আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্লেষণ থেকে সে সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার উপকরণ পাওয়া যায়।

১৫

ভাববার উপকরণ 'ধর্মের অনুষ্ঠান'[১৫] নামক প্রবন্ধেও রয়েছে। ধর্মানুষ্ঠানকে এখানে দু'টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানের সপক্ষেই যেন বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের সহানুভূতি বেশী। ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য এবং সমাজের পক্ষে এর নিগূঢ় সংযোগের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করে লেখক এখানে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও বিজ্ঞানচেতনার আলোকে ধর্মের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করেছেন সমাজ ও ইতিহাসের পটভূমিকায়। এ প্রবন্ধে হিন্দুসমাজই নয় শুধু, সমগ্র বিশ্বমানবসমাজের সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্কের কথা এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত। সরস প্রকাশভঙ্গী, সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরস এবং তার চেয়েও বড় কথা, বৃহত্তর ইতিহাসের পটভূমিকায় ধর্ম, সমাজ ও জীবনকে দেখবার যে সত্যনিষ্ঠ প্রয়াস এখানে রয়েছে, তা' থেকে জীবনসাধক, কল্যাণব্রতী রামেন্দ্রসুন্দরকেই খুঁজে পাই আমরা।

ইংরেজী রিলিজন বোঝাতেই ধর্ম শব্দটিকে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর হয়েছে ধর্ম বা ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা। বলা হয়েছে, 'কোন-না-কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান মাত্রেরই সাধারণ অঙ্গ।' অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস ও অন্ধভাবে তার 'প্রীতিসম্পাদনই প্রচলিত সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।' দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এক এক দেবতার উপাসনাপদ্ধতি এক একরকম। দেবতার সঙ্গে জড়িত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো হ'ল ধর্মের প্রাণ। উপাসনাপদ্ধতি ও তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহকে 'ধর্মের শরীর' বলা হয়েছে। সমাজের কিছু বাছাই লোক ধর্মের প্রাণ অর্থাৎ তার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাগ নিয়ে আলোচনা করে; বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, ইতর সাধারণে তা' মেনে নেয় এবং বিশ্বাস করে চলে। ধর্মের অনুষ্ঠানগুলো পালন করতে ইতর-ভদ্র ও পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিশেষে সবাই বাধ্য থাকে। তা' ছাড়া এই অনুষ্ঠান কে কতখানি পালন করে চলে, তা' দিয়েই 'সাধারণতঃ প্রচলিত ধর্মে আস্থার মাত্রা পরিমিত হয়।' ব্যক্তিবিশেষকে ধর্মানুষ্ঠানের বিষয়ে কিছুমাত্র স্বাধীনতা দিতে সমাজ নারাজ। ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলিত পদ্ধতির লঙ্ঘন সকল দেশে ও সকল কালে সমাজদ্রোহ বলে গণ্য হয়। চোরের

১৫. প্রথম প্রকাশ: ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩।

ও হত্যাকারীর বরং ক্ষমা আছে, কিন্তু স্বধর্মত্যাগীর ক্ষমা নেই। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, সমাজের এই কঠোর মনোভাব আপাতঃদৃষ্টিতে নির্মম বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর পিছনে বৃহত্তর কল্যাণাদর্শ নিহিত আছে। 'রাজশক্তি যেখানে রাজনৈতিক একতা সাধনে অসমর্থ, ধর্মশাসন সেখানে সমর্থ হয়'। একে যা' পারে না, অন্যে তা' সহজেই করে থাকে। এই বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ইহুদি জাতির ইতিহাস এবং হিন্দুদের ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, হিন্দু সমাজে যে কিছু বন্ধন, একতা ও জাতীয়তা বর্তমান, তা' এই 'ধর্মানুষ্ঠানেরই একতাগত'। সেই প্রবল জাতীয়ত্ব বাইরের কোনো শক্তির কাছে আজও অবধি সংকুচিত বা পরাভূত হয় নি। তাই মানুষকে সমাজের অধীন থাকতেই হবে। সমাজের আদর্শ যুক্তিবিরুদ্ধ হলেও মানতে হবে। 'সামাজিক জীব সমাজের অধীন'। এই অধীনতার সীমা কতদূর অবধি, তার কোনো উত্তর দেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। শুধু বলেছেন, 'মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এক দলকে সেই সীমারেখার এক পার্শ্বে রাখে ; মনুষ্যের সমাজ-বশ্যতা' অন্য দলকে অন্য পার্শ্বে রাখে। স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল, উভয় দলের চিরন্তন বিরোধ। এই বিরোধের মীমাংসা হয় নি। কখনো হবে কি না, জানা যায় না। কিন্তু এই সনাতন বিরোধের ফলে সেই সীমারেখা ক্রমশই সরে গিয়েছে। অতএব দেখছি, মূল সমস্যার সমাধান করেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নূতন এক Attitude বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন।

Attitude বা দৃষ্টিভঙ্গীতে অভিনবত্বের পরিচয় 'ধর্মের প্রমাণ'[১৬] নামক প্রবন্ধেও সুস্পষ্ট। ধর্মের প্রমাণ উপস্থাপিত করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যে বিশিষ্ট আলোচনা-ক্রম অনুসরণ করেছেন, তা' একদিকে যেমন শাস্ত্র-নির্ভর, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞান-সচেতনও বটে। সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকে, জীবনের নির্মম সত্যকে প্রকাশ করার অপরূপ ক্ষমতায় এবং সর্বোপরি বক্রোক্তি ও কৌতুকরসের মিলনে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি মনোরম হয়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোতে দেখেছি, নিষ্কাম কর্মসাধনার জয়গান করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। কিন্তু কর্ম করবে যে মানুষ, তার জীবনতরী তো কর্মসাগরে ভাসছে। কখন্ কোন পথে যেতে হবে, মানুষ তার ঠাহর পায় না। তখন পথ দেখায় ধর্ম। কিন্তু ধর্ম যে আছে তার প্রমাণ কি ? এই প্রমাণকেই আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ; এবং তা' করতে গিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন জীবজগতের একেবারে মর্মমূল থেকে। প্রথমেই ইতর জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর, বলেছেন, ইতর জীব মুখ্যতঃ সংস্কারের অধীন। মৌমাছির উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, ওরা যেখানে সমাজ বেঁধে বাস করে, সেখানেও সংস্কারেরই প্রভুত্ব। প্রাকৃতিক শক্তি ইতর জীবকে শাসন ও পরিচালনা করে। এদের মধ্যে পাপ-পুণ্যের কথা উঠতে পারে না। মানুষ আহার-নিদ্রাদি কয়েকটি বিষয়ে সংস্কারের বশবর্তী বটে, কিন্তু অন্যত্র প্রজ্ঞা মানুষের কর্তব্য

---

১৬ প্রথম প্রকাশ : সাহিত্য,শ্রাবণ ১৩০৭।

নির্দেশ করে। সন্দেহ নেই, মানব-জীবন কোনো কোনো বিষয়ে প্রাকৃত শক্তির অধীন, কিন্তু অপরাপর ক্ষেত্রে মানুষের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'প্রজ্ঞা' নিয়ে যুক্তিপুর্ণ আলোচনা করেছেন লেখক। সঙ্গত কারণেই বলেছেন, প্রজ্ঞা অনেক রকমের পথ দেখায় মানুষকে। মানুষ ঠেকে শিখে পরীক্ষা ক'রে এর কোনো একটি পথ বেছে নেয়। প্রজ্ঞা কর্তৃক নির্দিষ্ট পথ অনেক সময়ে সংস্কারনির্দিষ্ট পথের বিরোধী হয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিকে সমর্থন করে বলা চলে, প্রজ্ঞাই জীবনকে 'বর্দ্ধিত ও পুষ্ট ও বলবান্ করে'। এই প্রজ্ঞার পিছনে ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা, সমাজের অবদান। তাই সঙ্গত কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর এবার ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন, সমাজের দৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য বলতে কি বোঝায়, তা' স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন। বলেছেন, আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ সমাজ বেঁধে বাস করে। এই সমাজবন্ধন তার 'ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন, উভয়েরই রক্ষণের জন্য আবশ্যক'। 'কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অনেক সময় বিরোধ ঘটে'; একের পক্ষে যা' অনুকূল,তা' অন্যের প্রতিকূল হয়। সামাজিক জীবনে মানুষকে নিজের স্বাতন্ত্র্য সংযত করতে হয়। 'মুখ্যতঃ সামাজিক জীবনের অনুরোধে, গৌণতঃ ব্যক্তিগত জীবনের অনুরোধে এই ত্যাগস্বীকার'। এই ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত না হলে সমাজের আক্রমণ ও নিগ্রহ সইতে হয় মানুষকে। কারণ, মানুষের কার্যের ফলভোগী সে একা নয়, ফলভোগী সমগ্র সমাজ। এইভাবে ব্যক্তিমানুষের কার্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বর্ণনা করে পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, যে সকল কর্ম সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়, সেগুলো পাপ; আর যেগুলো প্রশংসিত হয়, সেগুলো পুণ্য। সামাজিক জীবনের বাইরে পাপ-পুণ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। সমাজকে রক্ষার জন্যেই ব্যক্তিগত কার্যের এই শ্রেণীবিভাগ। "স্থূলতঃ যা' সামাজিক জীবনের অনুকূল, তাহার নাম পুণ্য; যা' সামাজিক জীবনের প্রতিকূল, তাহার নাম পাপ; পাপ-পুণ্যের আবিষ্কর্তা ও নিয়ামক মানব-সমাজরূপী বিরাট পুরুষ"। ইতর জীবের পাপ-পুণ্য বোধ নেই, নেই কোনো প্রজ্ঞা। এদের ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে কোন্ কার্য অনুকূল, সহজাত সংস্কার তা' অন্ধভাবে দেখিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে যা' কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা, সবই প্রকৃতির হাতে। 'ইতর জীবের সমগ্র জীবন যন্ত্রের মত প্রাকৃতিক নিয়মের বশে চলে'। মানুষের জীবনে প্রকৃতির প্রভুত্ব এতটা প্রকট নয়। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে প্রভুত্ব অবশ্য প্রকৃতির হাতে। কিন্তু অবশিষ্ট বহু ব্যাপারেই প্রজ্ঞা মানুষকে পথ দেখায়। এর ফলে লাভ যেমন আছে, তেমনি আছে ক্ষতিও। তবে লাভের পরিমাণই বেশী। কেননা, প্রজ্ঞাবশে চলতে গিয়ে অনেক ব্যাপারে ঠেকে শিখতে হয় মানুষকে এবং এর ফলেই প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে, আর মানুষের হয় ক্রমিক উন্নতি। এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর যে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা' হ'ল এই,—'ইতর জীবের জীবন স্থিতিশীল, মনুষ্য-জীবন উন্নতিশীল; এবং সেই উন্নতিশীলতা অনেকাংশে আপনার ইচ্ছাধীন ও চেষ্টাসাধ্য'। নিজ নিজ ইচ্ছামত চলতে গিয়ে মানুষ প্রজ্ঞার সঙ্গে সংস্কারের বিরোধ বাধিয়ে বসে। অনেক সময় সংস্কার যে পথে চলতে বলে, প্রজ্ঞা সে পথ দেখায়

না। ফলে, মানুষের জীবনে প্রজ্ঞায় ও সংস্কারে বিরোধ ঘটে। এই এক বিরোধ, এবং এ ছাড়া আর এক বিরোধের কথা রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রবন্ধে বার বার বলেছেন। তা' হ'ল ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে বিরোধ। যে কার্য ব্যক্তির অনুকূল, তা' হয়ত সমাজের প্রতিকূল। 'সংস্কার বা প্রজ্ঞা, অথবা সংস্কার ও প্রজ্ঞা, উভয়ে ব্যক্তিগত জীবনের স্ফূর্তির জন্য যে পথ দেখায়', তা' কখনও কখনও সামাজিক জীবনের অন্তরায় হয়'। তাই সমাজ তা'কে জোর করে তখন সামাজিক জীবনের অনুকূল পথে ও ব্যক্তিজীবনের প্রতিকূল পথে চালাবার চেষ্টা করে। এই হ'ল আর এক ধরনের বিরোধ। এ থেকেই মানব-জীবনে পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি। অতএব দেখছি, দু' প্রকার বিরোধের কথা বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রজ্ঞায় ও সংস্কারে বিরোধ। আর বিরোধ ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে। অর্থাৎ, অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, 'মনুষ্য-জীবন কেবল বিরোধময়'। পাপ ও পুণ্যে যে সনাতন বিরোধ, এ থেকেই তার উৎপত্তি। অতএব, অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা চলে, শাস্ত্রজ্ঞানই শুধু নয়, বিজ্ঞানবুদ্ধিও রামেন্দ্রসুন্দরের ধর্মবোধকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মের প্রমাণ উদ্ধার করতে বেরিয়ে পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন মানব-জীবনের বিরোধের মধ্য থেকে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীর ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি এই বিরোধের জয়গান করেছেন এখানে। বলেছেন, "শুধু মনুষ্য-জীবন কেন, জীবন মাত্রই কেবল বিরোধ। প্রতিকূল শক্তিসমূহের পরস্পর সংগ্রামই জীবনের সংজ্ঞা। এই বিরোধের ও এই সংগ্রামের নামান্তরই জীবন। এই বিরোধেই জীবনের পরিপুষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই বিরোধেই জীবে ও জড়ে প্রভেদ"। রামেন্দ্রসুন্দরের এই সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন না জানিয়ে উপায় নেই। তার কারণ জীব-জগতেই শুধু বিরোধ আছে। জড়জগতে বিরোধের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই বিরোধ মানব-জীবনে আবার সবচেয়ে বেশী। কেননা, অপরাপর জীবের মত জড়ের সঙ্গে মানুষের বিরোধ তো আছেই, তা' ছাড়া আছে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে সমাজের বিরোধ এবং প্রজ্ঞাব সঙ্গে সংস্কারের বিরোধ। সত্যদ্রষ্টা রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন, এই বিরোধই হ'ল মানব-জীবনের লক্ষণ। এরই ফলে মানব-জীবনের উন্নতি ও পরিণতি; মানুষের মাহাত্ম্য ও গৌরব। তা' ছাড়া পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তিও এই বিরোধ থেকেই। উভয়ের সমবায়ে মানুষের জীবন। আলো ও আঁধার যেমন সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, পাপ ও পুণ্যও তেমনি মানব-জীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, মানব-জীবনের কথা ভাবা যায় না। এইভাবে বিরোধের মধ্য থেকে পাপ ও পুণ্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তার করে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন উপস্থাপিত করে চিন্তারাজ্যের আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন। প্রথম প্রশ্ন, কোন্ কাজটা পাপ? আর কোন্ কাজটা পুণ্য? না, সমাজ-জীবনের যা' প্রতিকূল, তা' হ'ল পাপ; আর যা' অনুকূল, তা' হ'ল পুণ্য। এখন প্রশ্ন, কোন্ কাজটা সমাজ-জীবনের অনুকূল? না, সুপ্রাচীন কাল ধরে যে কাজ মানব-জীবনে সুফল প্রদান করে আসছে। যুগযুগান্তরের শিক্ষায় মানুষ যা'কে ভাল ও শ্রেয় বলে

জেনেছে। যা' ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার ফল নয়, যা' সমগ্র মানব-জাতির যুগ যুগ-ব্যাপী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপার্জিত, তা'র উপর নির্ভর করাকেই রামেন্দ্রসুন্দর সমীচীন মনে করেন। এই যে অভিজ্ঞতা, তিনি এরই নামকরণ করেছেন শ্রুতি ও স্মৃতি। কিন্তু মনে যেন রাখি, সকল অভিজ্ঞতাকেই সমান মূল্য দেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী ঋষিদের অভিজ্ঞতাই তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। অন্যে যা' দেখে না, তাঁ'রা তা' দেখেছিলেন। তাই তাঁ'রা ঋষি। অন্যে যা' শোনে না, তা'ই তাঁ'রা শুনেছিলেন। এরই নাম শ্রুতি। তাঁদের শিষ্যপরম্পরা, তাঁদের পরবর্তী পুরুষ-পরম্পরা, তাঁদের কাছ থেকে শুনে যা' স্মৃতিপটে এঁকে রেখেছেন, তা'র নাম স্মৃতি। কিন্তু সাধারণ মানুষ শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপর্য অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না। মহাজনের পন্থাই তখন পন্থা। 'সাধুসম্মত সদাচার তখন ধর্ম্মের প্রমাণ'। তবে কি প্রজ্ঞাবলহীন সাধারণ মানুষকে চিরদিন মহাজনের পথ খুঁজে বেড়াতে হবে? এ প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, না, চিরকাল মহাজনের পথ খুঁজে নেবার দরকার হয় না মানুষের। আমাদের মধ্যে আছেন যে অন্তর্যামী, তিনি আমাদের পথ দেখান। ভিতর থেকে আমাদের কর্তব্য-কর্মের নির্দেশ দেন। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার যেখানে উপদেশ দেয় না, অথবা যেখানে উপদেশ আমরা বুঝতে পারি নে, সেখানে অন্তর্যামীর 'নীরব বাণী' আমাদের ধর্মাধর্মের বিভেদ দেখিয়ে দেয়। এই যে আমাদের অন্তরের প্রেরণা, হৃদি-স্থলে অবস্থিত অদৃশ্য শক্তির দ্বারা এই যে আমাদের পথ-নির্দেশ, ইংরেজীতে যা'কে বলে Conscience—বাংলায় রামেন্দ্রসুন্দর তা'র নামকরণ করেছেন ধর্মপ্রবৃত্তি। অন্তর্যামীর প্রেরণা থেকেই এর উদ্ভব। কিন্তু এখনো প্রশ্ন থেকে যায়, অন্তর্যামীর এই প্রেরণা কেমন করে কাজ করে? এ প্রশ্নেরও যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, অন্তর্যামীর প্রেরণা 'অনেকটা সহজাত সংস্কারের মত কাজ করে'। মানুষ জন্মের পর থেকেই এই অন্তর্যামীর অধীনতা আশ্রয় করে। সহজ সংস্কার যেমন কারণ দেখায় না, প্রেরণ করে মাত্র, এই সহজাত ধর্ম-প্রবৃত্তিও সেরূপ কারণ দেখায় না, একেবারে সোজাসুজি হুকুম চালায়। বলে, এই কাজটা ভাল, এই কাজটা মন্দ; কেন ভাল, কেন মন্দ, তার কোনো কৈফিয়ত দেয় না; 'ইউটিলিটির হিসাব বা অন্য কোন হিসাব দিতে চায় না, কোনরূপ পুরস্কারের প্রলোভন, কোন তিরস্কারের ভয়, কিছুই দেখায় না'। এই বিশিষ্ট মানব-ধর্মের বিকাশ কি করে হ'ল, তা' নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে চিরকাল বাক্‌বিতণ্ডা চলে আসছে। এখানে সেই বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবেশ করেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। শুধু বলেছেন, মানুষের সামাজিক জীবনে ব্যক্তি-সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তি-সমষ্টির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, জাতির সঙ্গে জাতির যে ভীষণ দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ থেকে চলে আসছে, 'সেই ভীষণ দ্বন্দ্বের পরিণামফলে, সেই ভীষণ দ্বন্দ্বে যোগ্যের জয়ে ও অযোগ্যের পরাজয়ে, এই বিশিষ্ট মানব-ধর্মের অভিব্যক্তির মূল অনুসন্ধান' করলে এর কিছুটা উত্তর মিলতে পারে। তাঁর মতে, 'যে সনাতন বিরোধ জীবের জীবনের মূল স্থলে বর্তমান, যে বিরোধে জীবের অভিব্যক্তি ও জীবনের উন্নতি, যে বিরোধে জীবনের মাহাত্ম্য ও গৌরব', মানব-সমাজে

সেই সনাতন বিরোধের আকারভেদ থেকেই মানুষের এই সহজাত ধর্ম-প্রবৃত্তির উদ্ভব কতকটা বুঝা যেতে পারে। সে যা'ই হ'ক, সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয় এ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হ'ল, 'শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি বা হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর পরিতোষ সকল ধর্মের মূল ও প্রমাণ'।

পরবর্তী প্রবন্ধ 'প্রকৃতি-পূজা'[17] 'জিজ্ঞাসা'র ১ম সংস্করণে (১৯০৪) সংকলিত হয়েছিল। পরে এই প্রবন্ধটিকে ওখান থেকে সরিয়ে 'কর্ম্ম-কথা'য় স্থান দেওয়া হয়। প্রবন্ধের এই স্থান-পরিবর্তন কতখানি যুক্তিযুক্ত হয়েছে, তা' নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তার কারণ, বেদপন্থীর কর্মসাধনা ও ধর্ম নিয়ে যে আলোচনাক্রম কর্মকথার প্রবন্ধগুলোতে পাই, তা' আলোচ্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যেন কিছুটা অনুপস্থিত বলেই মনে হয়। বরং মনে হয়, জিজ্ঞাসার অন্যান্য প্রবন্ধের বেলায় যেমন, এখানেও তেমনি রামেন্দ্রসুন্দর প্রকৃতি-পূজা-মন্দিরের রুদ্ধ-দুয়ারের সামনে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বেদপন্থীদের ধর্ম-কর্ম নিয়ে গভীর ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার যে প্রচেষ্টা এ গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধে পাওয়া যায়, তা' এখানে যেন অনুপস্থিত বলেই মনে হয়। মনে হয়, ভাষার ইন্দ্রজাল ও কবিত্বময় বর্ণনার অন্তরালে এ প্রবন্ধে যুক্তিভিক্ষু রামেন্দ্রসুন্দর যেন ক্ষণিকের জন্যে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু এই গেল একদিক। অপরদিকে এ প্রবন্ধটিকে 'কর্ম্ম-কথা'য় সংকলনের সপক্ষেও যুক্তি উপস্থাপিত করা চলে। পরবর্তী-কালে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', 'যজ্ঞ' ও 'যজ্ঞ-কথা'য় রামেন্দ্রসুন্দর যজ্ঞকে কেন্দ্র ক'রে বেদপন্থীদের যে কর্ম-কথা বাণীবদ্ধ করেছেন, তার মূল এ প্রবন্ধে আছে। এ রচনার এক জায়গায় তিনি স্পষ্টই বলেছেন, বিশ্বসৃষ্টি এক মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞে দেবশ্রেষ্ঠ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। দেবগণ তাঁকে পশুরূপে কল্পনা করে এই যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন। 'আত্মোৎসর্গ ছাড়া যজ্ঞ হয় না। যজমান যজ্ঞে আপনাকে পশুরূপে উৎসর্গ করেন। যজ্ঞে তিনি আত্ম-নিষ্ক্রয়স্বরূপে পশু বধ করেন'। যজ্ঞের বধ বধ নয়। মানবের 'পাপপ্রক্ষালনের জন্যে বলির প্রয়োজন'। যজ্ঞকে কেন্দ্র করে কর্ম-সাধনার এই বিশিষ্ট attitude থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর পরবর্তী-কালে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুবাদ করেন, যজ্ঞ-কথা লিপিবদ্ধ করেন। অতএব, এদিক থেকে বিচার করলে 'কর্ম্ম-কথা'য় এ প্রবন্ধটির সংযোজন অযৌক্তিক হয় নি। বরং, প্রকৃতির পীড়নে মানুষ চিরদিন পীড়িত, তাই দুর্বল মানুষ পূজার্চনা দ্বারা চিরদিন প্রকৃতিকে খুসী করবার চেষ্টা করে আসছে, একথা বুঝাবার জন্যে এবং প্রকৃতি-পূজার বিচিত্র কাহিনী ও মানব-জীবনে প্রকৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পুরাণ-ইতিহাস-কাব্য থেকে উদাহরণ নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে কবিত্বময় ও কৌতুকরসাশ্রিত ভাষায় এ আলোচনাটি করেছেন, তা' 'কর্ম্ম-কথা'র তাত্ত্বিক প্রবন্ধরাজ্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টি করেছে। তবে প্রকৃতি-পূজার রহস্যদ্বার উদঘাটিত করতে চান নি তিনি। সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে প্রকৃতি-পূজার যে অদৃশ্য প্রবাহ আজও চলছে, তাঁর মতে, সেই প্রবাহের আবিষ্কারের কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মাধর্ম নিয়ে আলোচনার পর ভারতীয়দের কর্ম-সাধনার স্বরূপ তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই

১৭ সাধনা: কার্ত্তিক ১৩০২।

দেখি, 'কর্ম্ম-কথা'র পরবর্ত্তী প্রবন্ধ 'ধর্মের জয়'-এ,[১৮] যথা ধর্ম তথা জয়, এই চিরপ্রচলিত নীতিবাক্যের যাথার্থ্য বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি। নীতিবাক্যটির প্রতি কোনোরূপ সংশয় প্রকাশ না করে আলোচনা শুরু করেছেন একেবারে গোড়া থেকে। বহু-বিচিত্র উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করে প্রথমে বলেছেন, ধর্মের জয় সংসারে নিত্য ঘটনা, এমন কথা বলা চলে না। কারণ, সংসারে চলে বহু অবিচার ও অত্যাচার। অধর্মের শাস্তি হাতে হাতে হলে এগুলো ঘটত না। রাজ্যশাসন, সমাজশাসন ও ধর্মের শাসনের প্রয়োজন হত না কিছু। কিন্তু যখন দেখি, অনেকেই এই সব শাসনকে ফাঁকি দিচ্ছে, তখন অন্য এক যুক্তির অবতারণা করে আমরা ধর্মের জয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি। আমরা বলি,—মানুষকে, রাজাকে ও সমাজকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু সকলের দৃষ্টির আড়ালে ধর্মের অদৃশ্য ফাঁদ পাতা আছে। তাকে এড়াবার উপায় নেই। জগদ্বিধানকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। ধর্মের জয় সম্বন্ধে এই হ'ল আমাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা। কিন্তু সত্য-সন্ধানী রামেন্দ্রসুন্দর এ ব্যাখ্যায় পরিতুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করেছেন, সত্যই কি পাপী জগদ্বিধানকে ফাঁকি দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে পারে না? অধর্মের পরাজয় সত্যই কি অবশ্যম্ভাবী? সত্যই কি অধর্মের ফল সর্বত্র হাতে হাতে ফলে? যুক্তি ও উদাহরণ সহযোগে তিনি দেখিয়েছেন, অধর্মের ফল সর্বত্রই হাতে হাতে ফলে না। যদি ফলতো, তবে জগতে ধর্মের এত দুর্ভিক্ষ থাকত না। অনেকে আবার বলেন, অধর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গেই ফলে না বটে, তবে শেষ পর্যন্ত, in the long run তা' অবশ্যই ফলবে। In the long run পুরুষানুক্রমে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, কথাটা একদিক থেকে হয়ত সত্যি, পিতার কর্মফল পুত্রে ভোগ করে সত্যি কথা; কিন্তু পরের উপর নিজের কর্মফল চাপিয়ে দিয়ে in the long run বা লম্বা দৌড়ে ধর্মের জয় হবে, একথা মেনে নিতে তিনি নারাজ। তিনি প্রতিপাদন করতে চান, আপন কর্মের ফল আপনাকেই ভোগ করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ হিন্দুদের জন্মান্তরবাদের কথা এসে গেছে। ইহকালে সর্বত্র ধর্মের জয় না দেখে তা'রা পরকালের আশায় বসে থাকে। পরজন্মকৃত কর্মের ফল ভোগ করবার জন্যে জন্মজন্মান্তর কল্পনা করে থাকে। তাদের মতে, 'কোটি জন্মের পরম্পরায় পরিভ্রমণের নাম সংসার'—আমরা এই সংসার-চক্রে কর্মপাশবদ্ধ হয়ে কর্মের ফল ভোগ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কবে এই কর্মপাশের বন্ধন থেকে জীব মুক্তি লাভ করবে, সে উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা আমাদের পূর্বপুরুষরা সুদীর্ঘকাল ধরে করেছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর সে পথ ধরে যান নি। কর্মপাশে বদ্ধ জীবের মুক্তিলাভের উপায় নিয়ে এখানে আলোচনা করেন নি তিনি। 'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' এই বাক্যটির তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছেন শুধু। আমাদের প্রচলিত একটি বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, পাপী সমাজ এবং সংসারকে ফাঁকি দিলেও নিজের মনকে ফাঁকি দিতে

১৮ রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধটি বৌবাজারের সরস্বতী ইন্স্টিটুটের অনুরোধে ক্লাসিক থিয়েটারে আহুত সভায় পাঠ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঐ সভার সভাপতি (কর্ম-কথা, নিবেদন)। এই প্রবন্ধটি ১৩১০ সালের মাঘ সংখ্যা সাহিত্যে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পারে না, অনুতাপের অনলে অনুক্ষণ দগ্ধ হয়; একটা আধ্যাত্মিক শাস্তি তাকে লাভ করতে হয়, অনেকেই এরূপ ধারণা করে ধর্মের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠবে, অনুতাপ করতে পারে না, বা জানে না, এমন মহাপাপীও কি সংসারে নেই? এ প্রশ্নের জবাব দেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। শুধু বলেছেন, আমরা যখন ধর্মের জয়গান করি, তখন আমরা এই আধ্যাত্মিক নরকভোগের কথা মনে করি নে। 'আমরা বুঝি যে, এই যে জয়, ইহা সংসারে জয়, বৈষয়িক জয়, ভৌতিক জয়'। আমরা অধর্মের যে পরাজয় প্রতিপন্ন করতে চাই, সে পরাজয় সাংসারিক পরাজয়। পার্থিব উন্নতি ও সুখলাভ বিষয়ে পরাজয়। তা যদি না হবে তো আমরা আমাদের কাব্যে-উপন্যাসে, কথায়-কাহিনীতে ধর্মে-নীতিতে সর্বত্রই অধর্মের পরাজয় ও ধর্মের জয় ভৌতিক বিষয় সম্পর্কে দেখবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? পার্থিব ভৌতিক বিষয়েই অধর্মকে তিরস্কৃত ও ধর্মকে পুরস্কৃত দেখবার জন্য এত লালায়িত কেন? এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমরা 'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' এই বাক্যে কি অর্থে বিশ্বাস করি ও কতটুকু বিশ্বাস করি, তা' ভেবে দেখা দরকার। আলোচ্য প্রবন্ধে মহাভারতকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, ঐ মহাকাব্যে ধর্মের জয় কিভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

মহাভারতের প্রধান ঘটনা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। সে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। তাই সেটা ধর্মযুদ্ধ। মহাভারতে পাণ্ডবপক্ষের জয়কে প্রায় সকলেই সাংসারিক, বৈষয়িক ও ভৌতিক জয় হিসাবে ব্যাখ্যা করেন; অনেকেই বলেন, মহাভারতে ধর্মের জয়ের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হল, অধর্মাচারী কৌরবদের সবংশে বিনাশ এবং ধর্মাচারী পাণ্ডবদের ধর্মরাজ্যের সিংহাসন অধিকার। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এই মতবাদকে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে, এভাবে ব্যাখ্যা করলে মহাভারতকে খাটো করা হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বাস, মহাভারত স্পষ্ট করেই দেখিয়েছে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ধর্মপুত্রের জয় হয় নি। আমরা সিংহাসন-লাভ ও রাজ্যপ্রাপ্তিকে জয় বলে মনে করি। কিন্তু তা' আসলে জয় নয়। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, সেরূপ জয়ে ধর্মের জয় হয় না। পাণ্ডুপুত্রেরাও সেরূপ জয় লাভ করে থাকবেন; কিন্তু সে জয়ে তা'রা উল্লসিত হন নি। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বীরশূন্যা বসুন্ধরার অধিপতি হয়ে আপনাকে জয়যুক্ত মনে করেন নি। কেন করেন নি, তা' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নূতন এক দৃষ্টিকোণ থেকে মহাভারতের বিচার করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই 'মহাভারতের মহানাটকের যবনিকাপাত' হয় নি। ধর্মের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরবর্তী অঙ্কগুলির প্রয়োজন আছে। সৌপ্তিক ও নারীপর্ব, শান্তি ও আশ্রমবাসিকপর্ব, মৌষল ও মহাপ্রাস্থানিকপর্ব এই মহাকাব্যের সমাপ্তির জন্য অত্যাবশ্যক। মৌষলপর্ব ব্যাখ্যা করে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যদি বা জয় হয়ে থাকে, 'ভগ্নহৃদয় দীনচিত্ত মহাপ্রস্থানোদ্যত পাণ্ডবগণ' জীবন-সমরে জয় লাভ করতে পারেন নি। ইহজীবনে ধর্মের জয় হয় নি। মহাভারতই প্রতিপন্ন করেছে, যথা ধর্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্য ইহজীবনে প্রযোজ্য নয়।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে জীবনে ন্যায়-অন্যায়ের আলোচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, কি যে ধর্ম, আর কি অধর্ম, তা' স্থির করা

দুরূহ। 'ধর্মের তত্ত্ব পূর্বের মত গুহাতেই নিহিত আছে'। কি যে ধর্ম, আর কি অধর্ম, তা' বিচার-বিতর্ক দ্বারা স্থির করা কঠিন। কিসে জয়, আর কিসেই বা পরাজয়, তা' বলা দুরূহ। আমাদের মতো সাধারণ লোক রাজ্যলাভ ও সিংহাসনপ্রাপ্তিকে জয় বলে, কিন্তু যাঁরা আরও অনেক উন্নত, তাঁরা এই ধরনের লাভালাভ দিয়ে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করেন না। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেন্সার উল্লিখিত relative ethics বা সাপেক্ষ ধর্ম এবং absolute ethics বা নিরপেক্ষ ধর্মের উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই উভয় প্রকার ধর্মের আলোকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, জয় হউক আর পরাজয়ই হউক, যুদ্ধ করা কর্তব্য হিসেবে দেখা দিয়েছিল বলেই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে যুদ্ধ করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস হয়েছিল ; কিন্তু পাণ্ডবেরা ধ্বংস হলেও কৃষ্ণের পক্ষে ফল সমানই হ'ত। কারণ, জয়-পরাজয়ে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বস্তুতই পাণ্ডবদের জয় হয় নি। অগণিত আত্মীয়-পরিজনকে হারিয়ে যে জয়লাভ যুধিষ্ঠির করেছিলেন, তা' তা'র কাছে জয় নয়। আসলে ধর্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছিলেন পাণ্ডবরা। সেই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে নিষ্কামভাবে কর্তব্য-পালনে তাঁরা উপদিষ্ট হয়েছিলেন। যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে সাবধান করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়'। যুদ্ধ ক্রূর কর্ম, অতএব অধর্ম, কিন্তু কখনো কখনো প্রয়োজনে উহাও ধর্ম হয়। তিনি অর্জুনকে উপলক্ষ্য মাত্র করে মানবজাতিকে বললেন যেন, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—কর্মেই তোমার অধিকার—ফলে তোমার অধিকার নেই। যথা ধর্ম তথা জয়—এই নীতি হয়ত সত্য—কিন্তু সত্য হোক আর নাই হোক, ইহলোকে তা' প্রযোজ্য হোক আর নাই হোক, তুমি ধর্মসাধনে বাধ্য, জয়ে তোমার অধিকার নেই। তুমি যা'কে জয় বিবেচনা কর, তা' জয় না হতে পারে ; তুমি যা'কে পরাজয় মনে করছ, তা'ই হয়তো জয়। কিন্তু জয়-পরাজয় বিচারের ক্ষমতা নেই তোমার। ক্ষতি-লাভ গণনা করে তুমি কর্তব্য নির্ধারণ করো না। বিশ্বরূপ দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, কামনাশূন্য হয়ে তুমি কর্ম কর। ক্ষমা সকল সময়ে ধর্ম হয় না ; প্রাণত্যাগও সকল সময়ে ধর্ম হয় না ; আততায়ীর বিনাশেও সকল সময়ে অধর্ম হয় না। এইভাবে মহাভারতের ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের আলোকে রামেন্দ্রসুন্দর যথা ধর্ম তথা জয়, এই নীতিবাক্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম করব কেন ?—কেন ভূতের হিত করব ?— এ প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, করবে, তাঁর কারণ, সেই ভূতই তুমি। সর্বভূত তোমা থেকে অভিন্ন। তুমি সর্বভূত জুড়ে আছ এবং সর্বভূত তোমাতেই অবস্থিত আছে। কাজেই ভূতের উপকার, লোকহিত, তোমারই হিত। পরকে পীড়া দিলে তুমি নিজেকেই পীড়া দেবে। স্বেচ্ছায় ধর্মের পরাজয় ডেকে আনবে তুমি।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামায়ণে ধর্মতত্ত্ব কি ভাবে বুঝান হয়েছে, তা' নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। মহাভারতের বেলায় যেমন, এখানেও তেমনি প্রচলিত বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, অনেকের ধারণা, ধর্মের জয় ও

অধর্মের পরাজয় দেখাবার জন্যে রামায়ণ রচিত হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন, অধর্মাচারী রাবণের সবংশে নিধন ও রামচন্দ্রের সিংহাসনপ্রাপ্তি ধর্মের জয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই প্রচলিত বিশ্বাসকে রামেন্দ্রসুন্দর মেনে নেন নি। তিনি মনে করেন, রামচন্দ্রের সিংহাসনপ্রাপ্তি ধর্মের জয়ের প্রতীক নয়, একথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই মহাকবি রামায়ণের শেষভাগে উত্তরকাণ্ডটি জুড়ে দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, রাম সীতাকে বিসর্জন দিয়ে ভাল করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন, তা' নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা নিরর্থক। তিনি যা' কর্তব্য বলে বুঝেছিলেন, যা' ধর্ম বলে জেনেছিলেন, তা' রক্ষার জন্যেই সীতাকে বিসর্জন দেন। ধর্মবুদ্ধি তাঁকে ধর্মপালনে প্রবৃত্ত করেছিল। তিনি সুখের আশা করেন নি, জয়ের আশা করেন নি।

এইভাবে রামায়ণ ও মহাভারতের কর্মসাধনার কথা ও ধর্মপালনের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করে রামেন্দ্রসুন্দর ভারতবাসীর কর্ম-পন্থা সম্বন্ধে বলেছেন, আমরাও জয়ের আশা করব না। জয়-পরাজয় লক্ষ্য না করে আমরা ধর্মের পথে চলব। ধর্ম ও সত্য আমাদের লক্ষ্য হোক।

এই লক্ষ্যপথে আমাদের সহায় বেদ। 'কর্মকথা'র সর্বশেষ প্রবন্ধ 'যজ্ঞে'[১৯] রামেন্দ্রসুন্দর বেদের গুরুত্ব ও বৈদিক যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিষ্কাম ও ত্যাগ-দীপ্ত কর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। বেদপন্থীদের কর্মাদর্শ নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন বেদের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা নিয়ে। এই শ্রদ্ধার পরিচয় প্রবন্ধটির প্রারম্ভেই সুস্পষ্ট। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রত্যয়,

> "আমাদের পুরাতন সমাজতন্ত্র বেদ নামক শব্দরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা এই সমাজতন্ত্রের অধীন, তাঁহারা এই শব্দরাশিকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলিয়া মানিয়া থাকেন। যাঁহারা মানেন না,—কার্যতঃ মানেন না,—তাঁহারা বড়লোক ও ভাল হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহেন।"

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বেদকে না মানলে কেন আমাদের চলে না, তা' নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, 'সত্য দ্বারাই ভূমি ধৃত' হয়ে আছে। 'ঋত দ্বারাই আদিত্যগণ স্থির আছেন'। এই সত্য ও ঋতকে না মানলে সমাজ-সংসারের অস্তিত্ব থাকে না, বিজ্ঞানশাস্ত্র মিথ্যে হয়। কেন হয়, বেদের শব্দরাশিকে অনাদি ও অপৌরুষেয় বলার কারণ ব্যাখ্যা করে রামেন্দ্রসুন্দর তা' বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন ঋষিরা যে শব্দকে অনাদি অপৌরুষেয় বলতেন, তা' সাধারণের কাছে এক অতীন্দ্রিয় বস্তু ; তা' নিত্য-বস্তুরূপে জগৎ জুড়ে বিদ্যমান। তা'র আদি খুঁজে পাওয়া যায় না, অতএব তা' অপৌরুষেয়। তা' ছাড়া এই শব্দ থেকেই যখন ব্যাবহারিক জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, তখন এই শব্দকেই ঋত বা সত্যের বিকাশ বলে

১৯ যোগেশচন্দ্র সিংহের 'কালের স্রোত' নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকা হিসেবে এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সে লেখাটি কাট-ছাঁট করে 'যজ্ঞ' নাম দিয়ে এই গ্রন্থে সংকলিত হয়।

গ্রহণ করা যেতে পারে। মহাপুরুষরা সত্যের এই বিকাশকে দেখতে পান। তাই তাঁরা ঋষি। আর যে সত্য এতকাল থেকেও সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিল, তা' দেখেন বিজ্ঞানীরা। এই অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানীদেরও ঋষি বলেছেন। আর ঋষিদের বলেছেন, বিজ্ঞান-দৃষ্টির অধিকারী। অর্থাৎ, সত্যের কষ্টিপাথরে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সমন্বয় খুঁজেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই সমন্বয়-দৃষ্টির জন্যেই বেদ ও বিদ্যা, এই দু'টি শব্দকে তিনি সমান অর্থে গ্রহণ করেছেন। বেদ বলতে বুঝেছেন, প্রাচীন বেদ-পন্থী সমাজে ঋষিদের আবিষ্কৃত সকল বিদ্যার সমষ্টিকে। এ কালের বেদপন্থী সমাজেও যা' কিছু বিদ্যা বর্তমান রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, তা 'সেই পুরাতনী বিদ্যারই বিকৃতি ও পরিণতি মাত্র'। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে এই বিদ্যাকে জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্মকাণ্ডে ভাগ করে নিয়ে এই দু'টি কাণ্ডের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞানকাণ্ডে ব্যাবহারিক জগতের পারমার্থিক তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা আছে। ঋগ্বেদসংহিতার অম্ভৃণকন্যা বাগ্‌দেবীদৃষ্ট দেবীসূক্তে সেই তত্ত্বের পূর্ণ পরিণতি। জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম ও শেষ কথা আছে এখানেই। এখানেই আছে অনাদি ও অপৌরুষেয় সত্যের উল্লেখ। আর কর্মকাণ্ডের প্রথম ও শেষ কথা আছে 'শুক্লযজুর্বেদান্তর্গত ঈশাবাস্যমিত্যাদি ঋক্‌সমূহাত্মক উপনিষদে।' রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এখানেই আছে মানুষের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মূল কথা। কিন্তু এ কথা জ্ঞানকাণ্ডের কথার মত মানুষের সাধারণ সম্পত্তি নয়। মানব-সমাজের যে সংকীর্ণ অংশ বেদপন্থী, সেই অংশের উদ্দেশ্যেই এই কর্মকাণ্ড। এরপর কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, বেদপন্থীদের সমাজের মূল কোথায় ও এই সমাজের বিশিষ্ট ভাব কি, তা' জানতে হলে বেদের কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিতে হয়। বেদপন্থী সমাজ-ধর্মের পরিচয় ও বিশিষ্টতা এই কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কোনো জায়গা থেকে জানবার উপায় নেই। কিন্তু কর্মকাণ্ডেরও আরম্ভ কেউ জানে না। তাই এই বিশিষ্ট সামাজিক ধর্মের আদি খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কোনো পুরুষের করা নয়। বেদপন্থীর দৃষ্টিতে, এ ধর্মেও যে ব্যাবহারিক সামাজিক একদেশের পরিচয় দেয়, তা' অনাদি ও অপৌরুষেয়। যে দিন থেকে আর্য জাতির বেদপন্থী শাখা সমাজবদ্ধ হয়েছে,—সে কোন্ দিন, তা' আজও কেউ জানে না—সেই দিন থেকে এই বিশিষ্ট ধর্ম আশ্রয় করে এই সমাজ ধৃত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 'এই ধর্মের পারি-ভাষিক নাম যজ্ঞ এবং যজ্ঞের নামান্তর ত্যাগ'। ত্যাগ ছাড়া মানুষ সমাজবদ্ধ হতে পারে না। মানবজাতির ধর্ম মাত্রই ত্যাগাত্মক। তবে বেদপন্থী সমাজে ত্যাগের এক বিশিষ্টতা ছিল। সেই বিশিষ্টতার ভাবটুকু বেদে নিহিত আছে। কেমন করে আছে, প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্দ্রসুন্দর তা' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি বাহ্যজগতের উপাদান এবং তার সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা, বাহ্যজগতের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্ক জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড উভয়েরই আলোচ্য বিষয়। এই বাহ্যজগৎ কতিপয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে নির্মিত। এদের বাদ দিলে বাহ্যজগতের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে

না। এই রূপ-রসাদিময় বাহ্যজগৎকে আমি দেশে বিস্তৃত ও কালে প্রসারিত করি এবং কল্পনা করে বা সৃষ্টি করে আমার কল্পিত সম্মুখে, পশ্চাতে ও আশেপাশে ছুঁড়ে ফেলি এবং আমার কল্পিত অতীতে ও ভবিষ্যতে টেনে নিয়ে যাই। এই হ'ল আমার সুষুপ্তি থেকে জাগরণ। এরই নামান্তর জগৎ-সৃষ্টি। আবার যখন আমার সুষুপ্তি, তখন এই বাহ্য জগৎকে গুটিয়ে নিয়ে দেশ ও কালকে লোপ করে আমার ভিতরে টেনে নি। এরই নামান্তর প্রলয়। কিন্তু 'জগৎ-ব্যাপারটা' যখন আমার কল্পনা, তখন এই সৃষ্টি ও প্রলয়ও আমার কল্পিত। এইভাবে বেদপন্থীর দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, যা কিছু কল্পনা, সবই করি আমি। অতএব, আমি আছি,—এ কথা আমার পক্ষে 'অবিসংবাদিত ধ্রুব সত্য। এই সত্যটুকুই পরমার্থতত্ত্ব'। আর এই যে আমার কল্পিত জগৎ, এর অস্তিত্ব ব্যাবহারিক মাত্র। আমি একে সৃষ্টি করে আমা থেকে স্বতন্ত্র-ভাবে দেখছি ও এর সঙ্গে আমার একটা কাল্পনিক সম্পর্ক পাতাচ্ছি। এই কাল্পনিক সম্পর্ক পাতানকেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন ব্যবহার। বলেছেন, 'এই ব্যবহারের যাবতীয় আলোচনা বিজ্ঞান-বিদ্যার বিষয়'। এইভাবে কাল্পনিক জগতের ব্যাবহারিক অস্তিত্বকে বিজ্ঞানবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে, একমাত্র পারমার্থিক সত্য যে আমি, বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোকে রামেন্দ্রসুন্দর তা' প্রতিপাদন করেছেন। বলেছেন, আমিই আমার কল্পিত বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। আমিই ব্রহ্ম। এই হ'ল বেদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য। এখানে প্রশ্ন ওঠে, আমিই না হয় এ জগতের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র সৎপদার্থ। কিন্তু আমি কেন সৃষ্টি করলাম এ জগৎ ? কেমন করে এর কল্পনা করলাম ? বেদের জ্ঞানকাণ্ডের আলোকে এ প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, এই জগতের উৎপত্তি একটা 'বিসৃষ্টি' বা বিসর্জন মাত্র, ছুঁড়ে ফেলা মাত্র। আমিই এই জগৎকে আমার বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছি। কেমন করে ছুঁড়লাম ? না, আমার মনে কাম উপস্থিত হ'ল। এই কামনা থেকেই উৎপত্তি হ'ল জগৎ। অর্থাৎ, এই জগদ্ব্যাপার আমার কামনা মাত্র, আমার ইচ্ছা মাত্র, আমার লীলা মাত্র। এইভাবে জগৎ-সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করে জ্ঞানকাণ্ডের সাহায্যে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব ধর্মের ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব-পন্থার ভিত্তিমূলে আছে জ্ঞানকাণ্ড।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে জগতের সঙ্গে জীবের জ্ঞানরূপী (চেতনা) ও কর্মরূপী, এই দু' প্রকার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এই সম্পর্ক প্রথমতঃ জ্ঞানরূপী। কেননা এই জগৎকে আমি জ্ঞানের বিষয় করে নিয়েছি। এই আমার চেতনা। আমি চেতনা থেকে এই জগৎকে সম্মুখে ও পশ্চাতে, অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত করে দেখছি। আমি এই জগতের একমাত্র সাক্ষী। দ্বিতীয়তঃ এই সম্পর্ক কর্মরূপী। আমি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও খেয়ালের বশে মনে করছি, আমি সর্বতোভাবে এই জগতের অধীন। আর তা' মনে করে এই জগতের সঙ্গে আমার আদান-প্রদান চালাচ্ছি উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জনের মধ্য দিয়ে। এই আদান-প্রদানের সব কিছুই কল্পিত—এরই নাম ব্যবহার, এরই নামান্তর কর্ম। এই কর্মের ফল সুখদুঃখের ভোগ। আমি মনে করছি,

এই জগতের সঙ্গে কর্মের আদান-প্রদান চলছে আমার, এবং সেই কর্মের ফলরূপে সুখ-দুঃখ ভোগ করছি। রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, এইখানেই আমার জীবত্ব।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে জগৎরহস্যের আরও গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। সংক্ষেপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যসূত্র ব্যাখ্যা করে বন্ধন ও মুক্তির পার্থক্য এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা বুঝিয়েছেন। তারপর বেদপন্থীর দৃষ্টিতে মানব-সমাজের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'কল্পিত মৎসদৃশ জীবের সমষ্টি মানব-সমাজ'। এই মানব-সমাজের সঙ্গে আদান-প্রদানের কর্ম করে থাকি আমি ; এবং আমাকেই এর ফলভোগ করতে হয়। তা' ছাড়া জগতের উপাদেয় গ্রহণ ও হেয় বর্জনের মধ্য দিয়ে রক্ষিত হয় আমার জীবত্ব। এ থেকেই জীবের সুখ। এরূপ না করতে পারলেই জীবের দুঃখ। এই গ্রহণ ও বর্জনই জীবের কর্ম। এ থেকেই সুখ-দুঃখের সৃষ্টি। 'জীব সেই সুখভোগের ও দুঃখভোগের কর্তা। এই সুখ দুঃখ ভোগই ভোগ। কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলে এই ভোগ'। এইভাবে জীবের কর্মের সঙ্গে ভোগ ও সুখ-দুঃখের যোগসূত্র নির্দেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তারপর সুখ-দুঃখের ফলাফল নির্ণয়ে জীবের ভ্রান্তির কথা বর্ণিত। পরবর্তী অংশে অভিজ্ঞতার মূল্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, জগতের বিষয়ে পরিচয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তা' এ যুগের বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। আর এর দ্বারা যে কার্য ও অকার্য নিরূপণ হয়, তা' ধর্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কিন্তু জীবের জীবত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব যখন 'গোড়াতেই একটা কল্পিত ভ্রান্তি' থেকে উৎপন্ন তখন জীবের বিজ্ঞানান্ধতাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বিজ্ঞানান্ধ জীব সব সময়েই কার্য-অকার্য বিবেচনায় অক্ষম। অজ্ঞানান্ধতার ফলে সে আপনাকে জগৎ থেকে স্বতন্ত্র মনে করে এবং জগতের সঙ্গে একটা বিরোধের সম্পর্ক গড়ে তুলে সর্বদা প্রতারিত হয়। অর্থাৎ, রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বাহ্যজগতের সঙ্গে ব্যাবহারিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ-কারবার বিজ্ঞানান্ধদের। তাই যত কিছু বিরোধ। পরমার্থতঃ ঐরূপ বিরোধ নেই। সত্যদ্রষ্টা পারমার্থিক যিনি, যিনি জগতের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বুঝতে পারেন, তিনি এই জগৎ থেকে ভয় পান না। বৃহৎ জগৎ ক্ষুদ্র জীবকে গ্রাস করে আত্মসাৎ করে থাকে, এরূপ যে মনে করে, সে-ই প্রতারিত হয়। আর যে জানে, আমিই জগৎকে আমার বাইরে, দূরে ও নিকটে ছড়িয়ে দিয়ে জগৎ নির্মাণ করেছি, জগৎ আমাকে আত্মসাৎ করছে কি, আমিই আপনাকে প্রসারণ করে জগতে পরিণত করেছি, আধি-ব্যাধি আমার ক্রীড়া-মাত্র—তাঁর কোনো ভয় নেই। কিন্তু বিজ্ঞানান্ধ জীব আধি-ব্যাধির ভয়ে অনুক্ষণ ভীত। সে মনে করে, বৃহৎ জগৎ তাকে আত্মসাৎ করবার জন্যে উন্মুখ। এর পালটা জবাব দিতে গিয়ে আপনার জীবত্ব রক্ষার জন্যে সে জগতের যা' কিছু উপাদেয় মনে করে, তা' নিজে গ্রাস করে আত্মসাৎ করতে চায়। এরই নাম প্রবৃত্তি। ছয়টি রিপু তাকে এই প্রবৃত্তির পথে চালায়। কিন্তু বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, এই প্রবৃত্তি দ্বারা জীবের ও জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। কেন না, বেদের মতে জগতের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক অন্যরূপ। বেদে আছে, আমিই জগৎকে সৃষ্টি করেছি—আপনাকে প্রসারিত করে জগতে পরিণত করেছি—আপনাকে জগৎমধ্যে বিলিয়ে দিয়ে এই বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি

করেছি। এই যে জগৎ-নির্মাণ ব্যাপার, এ আমার ত্যাগ। কেন না, এর দ্বারা আমি আমার মহত্ত্ব ত্যাগ করে, আপনাকে সংকীর্ণ করে ক্ষুদ্র জীবে পরিণত করেছি ; আপনার একত্বকে নষ্ট করে বহুত্বে পর্যবসিত করে জগদ্বিধানের সৃষ্টি করেছি। স্বয়ং জগৎকর্তা হয়েও আপনাকে স্বকৃত জগতের নিকট বলি দিয়েছি। অতএব, জগৎ-নির্মাণ একটা ত্যাগ এবং ত্যাগের নামান্তর হ'ল যজ্ঞ। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, সকলের অগ্রজন্মা পুরুষকেই যজ্ঞরূপে—যজ্ঞীয় পশুরূপে কল্পনা করে 'প্রোক্ষিত করা' হয়েছিল। সেই পুরুষকেই যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল। সেই যজ্ঞ থেকেই চন্দ্র-সূর্য-ইন্দ্র, অগ্নি-ভূমি-আকাশ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি সব কিছু জন্মেছে। অতএব এই বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ —বিশ্বকর্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করে জগতে রয়েছে তার মূলেই যখন ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা' বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল। প্রবৃত্তির বশে জীব সবই গ্রহণ করতে চায়—প্রবৃত্তিকে নিরোধ করতে উপদেশ দিয়ে তাকে ত্যাগের শিক্ষা দিতে হবে। ত্যাগাত্মক কর্ম দ্বারাই জীবের সঙ্গে জগতের প্রকৃত সামঞ্জস্য সাধিত হবে—'ত্যাগাত্মক কর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই সম্পাদ্য।' জীবের অন্য কিছু গতি নেই। এই কর্ম পরিত্যাগ করবার প্রয়োজন নেই। কেন না, জীব যতক্ষণ জীব, ততক্ষণ তাকে কর্ম করতেই হবে—'এবং ত্যাগাত্মক কর্ম্মেই জীবের জীবত্বের সার্থকতা।' মনে রাখতে হবে, আমি, আত্মত্যাগ দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছি এবং আমি যা' সৃষ্টি করেছি, তা' আমার ভোগের বিষয় হয়েছে। মূলে ত্যাগ না থাকলে ভোগ ঘটত না। অতএব ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করতে হবে। এ জগতের সব কিছুই যখন আমার সৃষ্টি, তখন লোভের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু ত্যাগের। এই ত্যাগই কর্ম। এরই নামান্তর ধর্ম। এখানে প্রশ্ন ওঠে, ত্যাগ করব কেন ? এতে আমার লাভ কি ? বেদ-বিদ্যার সাহায্যে এ প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, জীব কর্মে বাধ্য, —কিন্তু সেই কর্ম ত্যাগাত্মক হলেই 'জীবের সঙ্গে জগতের আপাততঃ দৃশ্য বিরোধের মীমাংসা হয়'। জগৎ থেকে জীবের ভয় দূরে যায়—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। "নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে না, কিন্তু পরম শ্রেয়োলাভ ঘটে। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ত্যাগাত্মক কর্ম্মের নাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।" এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। 'যজ্ঞে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে' বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, যজ্ঞকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রকে যুক্তির অসমতলে দাঁড় করিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 'ত্যাগাত্মক কর্ম্ম যজ্ঞ এবং, ত্যাগাত্মক কর্ম্মে যদি ধর্ম্ম হয়, তবে যজ্ঞেই ধর্ম্ম।' বেদপন্থী মাত্রেই স্বীকার করবেন, ত্যাগাত্মক না হলে লোকহিতেও ধর্ম হয় না। ইহ বা পরত্র লাভের প্রত্যাশায় যে লোকহিত, তা' যজ্ঞ নয়। যে লোকহিতের মূলে কেবল ত্যাগ, তা' মহাযজ্ঞ, অতএব পরম ধর্ম। বেদপন্থীর আচার-অনুষ্ঠানের বিশিষ্টতার মধ্যেও ধর্মের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের

ফল নিজের ভোগ্য মনে না করে 'যজ্ঞেশ্বর নারায়ণে অর্পিত' করলেই তা' যজ্ঞ হয়। কেন না, 'দেবোদ্দেশে কৃত কর্ম্মই যজ্ঞ'। মানুষ আপনাকে বৃহৎ জগতের অধীন ক্ষুদ্র জীব ধরে নিয়ে 'জগদ্ব্যাপারের আপ্যায়ন জন্য সর্বস্ব ত্যাগে বাধ্য মনে করে'। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, এই হ'ল যজ্ঞকর্মের গোড়ার কথা। তারপর যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কয়েকটি ভুল ধারণার ব্যাখ্যা করে, ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ বলতে কি বোঝায়, তা' তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যজ্ঞে সর্বস্ব ত্যাগের অর্থ করে আত্মহত্যা,—নরহত্যা। সোমপান বলতে মনে করে, মাদক সেবন করে মাতাল হওয়া। কিন্তু বেদপন্থী সমাজের সোমযজ্ঞের ব্যবস্থায় বলা হয়েছে, চুমুক মাত্রেই পান, অথবা ঘ্রাণ মাত্রেই পান। কেননা, ব্রাহ্মণেরা যা'কে সোম বলে জানেন, তা' কেউ পান ক'রতে পায় না। মনে যেন রাখি, বৈদিকশাস্ত্রে যজ্ঞ শব্দটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপেই আবদ্ধ ছিল না। শব্দটির ব্যবহার ছিল ব্যাপক অর্থে। ত্যাগ বোঝাতেই কথাটি ব্যবহৃত হ'ত। তাই সঙ্গত কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, যজ্ঞের মৌলিক তাৎপর্য ত্যাগ, এই কথা স্মরণ রাখলে বেদপন্থীর শাস্ত্রে যজ্ঞের মহিমা বুঝতে পারা যাবে। জানা যাবে, জগতের সঙ্গে জীবের সামঞ্জস্য-সাধন যজ্ঞ দ্বারাই হয়।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, সাধারণ মানুষ এই সামঞ্জস্য সাধনে অক্ষম। ত্যাগের সঙ্গে ভোগের বিরোধকল্পনা প্রবৃত্তিপ্রবণ মানুষদের সহজ ধর্ম; কিন্তু এই সহজ-ধর্ম যে ভ্রান্ত, ঈশোপনিষদের আলোকে রামেন্দ্রসুন্দর তা প্রতিপন্ন করেছেন। বলেছেন, জীব ত্যাগ স্বীকার ক'রে জীব হয়েছে বলেই ভোগের বিষয় সম্মুখে পেয়েছে। 'অতএব ভোগ ত্যাগমূলক;, ত্যাগই ভোগ'। জীব জগতের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে বলেই জগৎ ভোগের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। 'এই অধীনতা একরূপ ঋণস্বীকার।' বেদপন্থীর শাস্ত্র অনুযায়ী জীব জগতের নিকট পঞ্চ ঋণে আবদ্ধ। এই পঞ্চ ঋণ মোচনের জন্যে বেদপন্থী গৃহস্থের পক্ষে নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ তাঁকে জগতের নিকট আপনার ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যজ্ঞ তখন বেদপন্থীর কাছে আপন মাহাত্ম্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই যজ্ঞ-মাহাত্ম্যের অপরূপ বর্ণনা আছে প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে। রামেন্দ্রসুন্দর বলছেন, 'বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারই একটা যজ্ঞ'। পুরুষ আপনাকে যজ্ঞরূপে কল্পনা করে এই জগতের সৃষ্টি-সাধন করেছে। 'প্রজাপতি স্বয়ং এই যজ্ঞের যজমান; দেবগণ এই যজ্ঞের ঋত্বিক'। আবার প্রজাপতিই এই যজ্ঞের পশু। 'যজ্ঞই এই যজ্ঞের দেবতা। ত্যাগের উদ্দেশ্যেই ত্যাগ'। এই ত্যাগের জন্য কোনো কামনা হতে পারে না। দেবগণ যজ্ঞ বা ত্যাগের দ্বারাই যজ্ঞরূপী দেবতার যাগ করেছিলেন। কেমন ক'রে করেছিলেন তা'র গভীর ও তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বৈদিক সূত্রের ভাষ্যকারের ভূমিকায় বসে এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, দেবতারা 'এখনও যজ্ঞরূপ বস্ত্রের বয়নকর্ম্মে আছেন—সেই বস্ত্রে বিশ্বভুবন আচ্ছাদিত' রয়েছে। 'বিশ্বভুবনের ঘটনাবলী এই বস্ত্রের তন্তুসূত্র'। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা মানব-সমাজ গঠনকালে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এমন কি, বিশ্বকর্মা এই যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি করেছিলেন এই বিশ্বনির্মাণ-

রূপ যজ্ঞ। তারপর তিনিই হোতা হয়ে এই বিশ্বভুবনকে আহুতি দিতে বসেছিলেন। ঋষি এই বিশ্বকর্মাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তুমি ভূলোক ও দ্যুলোকে বিশ্বসৃষ্টিরূপ যজ্ঞ করেছ। অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার করেছ তুমি। 'এবার ঐ যজ্ঞে অর্পিত হব্য দ্বারা, হবিঃশেষ ভোজনদ্বারা তুমি স্বয়ং বর্ধিত হও'। অর্থাৎ, যা' তুমি ত্যাগ করেছ তা' তোমার ভোগ্য হোক। এই ভাবে যজ্ঞ-রহস্যের মর্ম্মমূলে অনুপ্রবেশ করে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই শাস্ত্রবাক্যের যাথার্থ্য নির্ণয়ে এগিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, "ত্যাগই ভোগ—অতএব ত্যাগ দ্বারাই জীবের জীবত্বের সার্থকতা এবং ত্যাগাত্মক ধর্ম্মই ধর্ম্ম। এই ভিত্তির উপর বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত।" জীবের পক্ষে কর্ম পরিত্যাগ করবার উপায় নেই। অতএব, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম করতে করতেই শতায়ুঃ হবার ইচ্ছে করবে, শাস্ত্রের এই উক্তি যথার্থ। "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য-কর্ম্মকৃত"; অর্থাৎ কর্ম্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে না, গীতার এই উক্তি বেদপন্থীর কাছে শিরোধার্য। আর শিরোধার্য সেই পরম শাস্ত্রসত্য, প্রজাপতি যজ্ঞের সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর উক্তি অনুযায়ী যজ্ঞ দ্বারাই প্রজারা বৃদ্ধি পাবে—এই ত্যাগই তাদের ভোগ হবে। অতএব কর্ম করতে হবে প্রতিনিয়ত; কেন না, "কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ।" যাঁরা যজ্ঞের হুতাবশেষ ভোগ করেন —ত্যাগের পর যা' অবশিষ্ট থাকে, তা' ভোগ করেন—তাঁরা সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হন। কারণ কর্ম অক্ষর ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। 'নিত্য সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।' তাই উপনিষদের আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্য কর্ম আচরণ কর,—এ উপদেশ যথার্থ। সবই যখন তোমার, তখন কোন্ বিষয়ে আসক্ত হবে? শাস্ত্রোক্ত এই বাণী তাই একই কারণে গ্রহণীয়। তাই যাঁর আসক্তি নেই, তিনি কর্মবন্ধন-মুক্ত। 'যজ্ঞার্থ আচরিত সমস্ত কর্ম্ম লয় পায়। এই কর্ম্মাকর্ম্মবিচারের জন্য বেদপন্থীর ধর্ম্মশাস্ত্র'।

পরিশেষে ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী কর্মের চার প্রকার প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন রামেন্দ্র-সুন্দর। বলেছেন স্মৃতিঃ, শ্রুতি, সদাচার এবং অন্তর্যামীর কথা। শ্রুতিঃ অর্থে বেদোক্ত সনাতনী বাণী; স্মৃতি অর্থে মহাজনকৃত শ্রুতির তাৎপর্যব্যাখ্যা; সদাচার অর্থে মহাজনের অবলম্বিত পন্থা এবং সকলের উপর আত্মার পরিতোষ বা অন্তর্যামীর কথা। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার যেখানে পথ দেখায় না, অন্তর্যামী সহায় হয় সেখানে।

এইভাবে বৈদিক যজ্ঞকে কেন্দ্র করে এ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিপন্ন করলেন, ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভোগ হয়। যজ্ঞই ত্যাগ এবং ত্যাগাত্মক ও কামনাশূন্য কর্মই ধর্ম। আর কর্মের সবচেয়ে বড় প্রমাণ অন্তর্যামীর অস্তিত্ব। এই ত্যাগাত্মক কর্মসাধনার কথা, যজ্ঞানুষ্ঠানের এই ইতিবৃত্ত আছে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, ঐ শাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা থাকে যেন আমাদের। যে ধর্ম যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজকে রক্ষা করেছে, তা' যেন কর্মসাধনার পথে আমাদের পথ দেখায়। যেন মনে রাখি, স্বধর্মই আমাদের রক্ষা করবে; এমনকি স্বধর্ম আমাদের রক্ষা না করলেও আমরা যেন নিজস্ব জাতীয় ধর্মাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট না হই। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধটির

উপসংহারে যা' বলা হয়েছে, তা' থেকে স্বধর্মনিষ্ঠ ও কল্যাণব্রতী 'রামেন্দ্রসুন্দরকেই খুঁজে পাই আমরা। রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন,

> "যে শাশ্বতী বাণী, যে সনাতন শব্দ বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত এবং যুগে যুগে ঋষিমুখে প্রচারিত ও মহাজনকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া এই প্রাচীন সমাজে লোকস্থিতির সহায় হইয়াছে, যে সনাতন ধর্ম্ম সহস্র বিপ্লবে এই পুরাতন সমাজকে ধারণ করিয়া আসিতেছে এবং বহু অনার্য্য আক্রমণ সত্ত্বেও এই আর্য্য সমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে, সেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম্ম আমাদের এই বিপত্তির দিনে পথ প্রদর্শক হউন। স্বধর্ম্মে রক্ষিত হইলেই আমরা রক্ষিত হইব—ইহাই এই ক্ষুদ্র লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। আর যদিই বা নিয়তির প্রেরণায় আমরা রক্ষিত না হই, যদিই বা মহাকালের চক্রতলে পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস হইবে, ইহাই আমাদের নিয়তি হয়, তাহা হইলে আমাদের আর্য্য বিশিষ্ট ভাব রক্ষা করিয়াই যেন আমরা বিনষ্ট হই, ইহাই প্রার্থনা—কেন না, ভগবান অঙ্গুলিসঙ্কেতে উপদেশ দিতেছেন—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

অতএব, সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, কর্ম-কথায় কামনাশূন্য কর্ম এবং স্বধর্মেরই জয়গান করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বেদপন্থীর আচার-অনুষ্ঠান ও যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি এখানে ধর্মের বিজয় ঘোষণা করেছেন। জীবন ও ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয় করে ধর্মের প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন এবং ত্যাগাত্মক ও নিষ্কাম কর্মই যে ধর্ম তা' প্রমাণ করতে গিয়ে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অকৃত্রিম দেশপ্রীতির পরিচয় রেখেছেন। বস্তুতঃই কর্ম-কথা রামেন্দ্র-মনীষার এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

৪

বিস্ময়ের উপকরণ ছড়িয়ে আছে 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'ও (প্রথম পর্যায়, ভাদ্র ১৩২১)। জগৎ ও জীবন-রহস্যের যে গভীরে তিনি এখানে অনুপ্রবেশ করেছেন, ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, এ যুগের ভারতীয় মনীষার তা' এক স্মরণীয় অধ্যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে অনেকেরই এখানে মতের অমিল হতে পারে, অনেকে হয়তো বেদপন্থী হিন্দু ধর্ম-কর্মের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বের পরিচয় খুঁজে পেতে পারেন, কিন্তু সত্যদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার আলোকে এখানে তাঁর চিন্তাধারা যে দেদীপ্যমান, তা' সকলেই স্বীকার করবেন নিশ্চয়।

বিচিত্র প্রসঙ্গ 'রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন নি, বলেছেন। লিখেছেন অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত। অসুস্থ শরীরে শয্যাসীন রামেন্দ্রসুন্দর বলে গেছেন; আর নিজ ভাষায় তা' লিখে রেখেছেন অধ্যাপক গুপ্ত। অতএব, রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাদর্শ ও সাহিত্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য-বিচারে বিচিত্র প্রসঙ্গের গুরুত্ব নেই তত। কিন্তু এর অপরিসীম গুরুত্ব রামেন্দ্র-মানসের স্বরূপ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। বেদপন্থীর সত্যনিষ্ঠ ও উদারনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। বিচিত্র

প্রসঙ্গে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি, যুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে নিজস্ব প্রত্যয়কে উপস্থাপিত করেছেন মাত্র। কোনো গোঁড়ামীর পরিচয় বা আপন মতবাদকে জোর করে চাপাবার কোনো প্রচেষ্টা এখানে নেই, ইতিহাস ও সমাজ-বিবর্তনের পথ ধরে ধর্মরহস্যের সমাধানকল্পে তাঁর কয়েকটি ধারণার কথাই এখানে লিপিবদ্ধ আছে। ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে বেদপন্থীর ভুল ধারণা দূর করে, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের সম্পর্ক-নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। এ সম্বন্ধে বিচিত্র প্রসঙ্গ-১ম পর্যায়ের ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,—

> দুই বৎসর ধরিয়া আমার দেহ অবসন্ন। আমার মগজের ভিতর যে কথা-গুলো প্রকাশ পাইবার জন্য কিলবিল করিতেছিল, অধ্যাপক বিপিনবিহারী-গুপ্ত সেগুলোকে বাহির করিয়া দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী। নতুবা হয়ত উহা কোন কালেই বাহির হইত না।
>
> ....যাহা কিছু বলিয়াছি, উহার অধিকাংশই আমার Suggestion মাত্র; সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহাকেও বলি না।
>
> ......আমার বিবেচনায় বেদপন্থীর ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ misconception চলিত আছে; এতদ্দ্বারা যদি তা'র কিছু নিরাকরণ হয়, তাহা হইলেই আমার প্রচুর পুরস্কার হইবে। আমি বেদপন্থার ভিত্তি নিরূপণে কতকটা প্রয়াস করিয়াছি; বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় পন্থার সহিত তাহার সম্পর্ক দেখাইবারও কতকটা প্রয়াস করিয়াছি। আমার এই চেষ্টায় যদি কোন আঁধার জায়গায় আলো পড়ে, তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সাধিত হইবে।

আঁধার জায়গায় যে আলো পড়েছে, রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, বিচিত্র প্রসঙ্গ—১ম পর্যায়ের বিষয়বস্তু ও বিচার-সূত্র নিয়ে আলোচনা করলেই তা' প্রমাণিত হবে। দেখা যাবে, এক একটি প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ধর্ম, দর্শন ও সামাজিক ইতিহাসের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রথম প্রসঙ্গ, উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরে বীভৎস মূর্তি বা erotic figures সমাবেশের কারণ অন্বেষণ। এই প্রসঙ্গে আর্ট ও ললিতকলার দিক থেকে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে বৈদিক হিন্দু-ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। এখানে আলোচনা শুরু হয়েছে, উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে বীভৎস মূর্তি-সমাবেশ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সার্ উইলিয়ম হণ্টার প্রমুখ মনীষীদের অভিমত উল্লেখ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ঐ মন্দিরগুলি গড়া হয়েছিল প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী; শাস্ত্রের নির্দেশেই মন্দিরের গায়ে বীভৎস মূর্তির সমাবেশ করা হয়েছিল। সার্ উইলিয়ম হণ্টারের মতে জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রের মূর্তিগুলি বৈষ্ণব ধর্মসম্পৃক্ত। কিন্তু দু'টি কারণে হণ্টারের এই সিদ্ধান্তকে রামেন্দ্রসুন্দর গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রথম কারণ,—রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার কোনো কিছুরই আভাস এ সকল মূর্তির মধ্যে নেই। দ্বিতীয়তঃ, জগন্নাথদেবের মন্দিরেই শুধু নয়, ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরে এবং কণারকের সূর্যমন্দিরের গায়েও এ ধরনের মূর্তি উৎকীর্ণ

হয়েছিল। এইবার তৃতীয় একটি মত, লিঙ্গপূজার (Phallic worship) সঙ্গে এ সকল মূর্তির সম্পর্ক নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর শাস্ত্রনির্ভর ও ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা করেছেন। তবে জগন্নাথ-মন্দিরের বাইরের চিত্রগুলির সঙ্গে লিঙ্গপূজার কোনো সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর মতে, সম্বন্ধ যদি থাকত, তবে মন্দিরের ভিতরেও ঐরূপ চিত্র দেখা যেত। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আসলে ঐ মন্দির হ'ল সমুদয় সঙ্ঘের বা Community-র প্রতিকৃতি। তা' আবার মানবের জড়দেহেরও প্রতিকৃতি হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ এর আছে দু'টো দিক,—ভিতর ও বাহির। ভিতরটা শুদ্ধ,—শয়তানের সেখানে প্রবেশ নেই। বাইরেটা অশুদ্ধ; সেটা শয়তানের রাজ্য। অর্থাৎ, রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য, Community সম্বন্ধে যা' খাটে, মানবদেহ সম্বন্ধেও তা' খাটে। Community-র শরণ নিলে, সঙ্ঘের শরণ নিলে পরিত্রাণ, তা' নইলে নয়। বৌদ্ধধর্মে যে কেহ দীক্ষিত হ'ত, তাকে বুদ্ধ ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্ঘেরও শরণ নিতে হ'ত। খ্রীষ্টানের ক্ষেত্রেও এই একই কথা। কাজেই মন্দিরের ভিতর একরূপ, বাইরেটা অন্যরূপ। ভিতরে ভগবান ও তাঁর ভক্তগণ; বাইরে শয়তান ও তার অনুচরগণ। তাই বলে খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ, এরা কেউ কারও অনুকরণ করে মন্দির-নির্মাণ করেছে, এমন কথা বলতে চান নি রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর ধারণা, গোড়ায় যখন উভয়ের মিল আছে, তখন স্বাধীনভাবে গড়া হলেও সেই সাদৃশ্য শেষ অবধি দেখা যাবে। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপূজার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া বেদে শয়তানের অস্তিত্বের কথা নেই। বেদান্তও বলে, সংসার থেকে ভয় নেই, লজ্জা নেই, জুগুপ্সার কোনো কারণ নেই। বৌদ্ধরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে, সংসার হেয়, তাই এখানে জুগুপ্সার কারণ আছে। শয়তান বা মার ভয় দেখিয়ে থাকে, আবার বিষয়াসক্তি দ্বারা প্রলোভিত করে। শয়তানের অনুচরেরা বুদ্ধকে ও খ্রীষ্টকে ভীষণ মূর্তি দেখিয়ে লড়াই করতে এসেছিল, আবার ভোগের সামগ্রী দেখিয়ে প্রলোভিত করেছিল। খ্রীষ্টীয় গীর্জায় সেই ভয়ের দিকটা খুব ভয়ানকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যা'ই হোক, রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চান, জগন্নাথদেবের মন্দিরে বৌদ্ধ-প্রভাব পড়েছে। তাই বৌদ্ধ ভাবাভিভূত এই হিন্দুর মন্দিরে বিষয়াসক্তির যে মূর্তি অতি জঘন্য, অতি হেয়, তা' দেখান হয়েছে। ভবচক্রের চিত্রে তৃষ্ণার পরবর্তী 'স্পর্শ' বা বিষয়ভোগ নামে নিদানের চিত্রে আলিঙ্গন-বদ্ধ নরমিথুনের যে ছবি পাওয়া যায়, তা'কেই ফলিয়ে শেষ অবধি এই অশ্লীল মূর্তিতে পরিণত করা হয়েছে, এই হ'ল রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা। এই মূল থেকে, এক কাণ্ড থেকে দুই শাখা বের হয়েছে মাত্র, এই তাঁর বক্তব্য। এই বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক-দৃষ্টি ও অভিনব বিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তা' একক ও অনন্য। জগন্নাথদেবের মন্দিরের মূর্তিগুলির সঙ্গে লিঙ্গ-পূজার সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন, লিঙ্গপূজা জগৎব্যাপী। প্রাচীন মিশরে লিঙ্গপূজা ছিল। ছিল

আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, প্যালেস্টাইন—সর্বত্রই। গ্রীকদের ডাইওনীসীয় উৎসব, রোমানদের ব্যাকাস-পূজায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্যে লিঙ্গপূজার কোনো উল্লেখ নেই। তবে বৈদিক যুগেও যে Symbol of reproduction ব্যবহৃত হ'ত ব্রাহ্মণ-সাহিত্য থেকে প্রমাণ উদ্ধার করে রামেন্দ্রসুন্দর তা' সংক্ষেপে বুঝিয়েছেন। তারপর বৈদিক ও বিভিন্ন বেদোত্তর ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান-ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার পটভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দলবাঁধা সন্ন্যাসীর প্রশ্রয় দেয় নি। কিন্তু খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম তা' দিয়েছিল। বৌদ্ধ-ধর্মের মূলে দলবদ্ধ সন্ন্যাসীর ধর্ম। কাজেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-প্রবণতা বৌদ্ধধর্মে ছিল না। সেখানে গোড়া থেকেই সঙ্ঘ, সমষ্টি বা Communal ভাবটা প্রবল। ঠিক একই কথা প্রযোজ্য খ্রীষ্টানদের চার্চ বা সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলির প্রসঙ্গে। যাই হোক, বৌদ্ধধর্ম যে দলবদ্ধ সন্ন্যাসীর ধর্ম, উপযুক্ত যুক্তির সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে তা' প্রমাণিত করেছেন। তা' ছাড়া, পরবর্তী-কালে তান্ত্রিক গুপ্ত সাধনা যে বৌদ্ধ-বিহারের মধ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল, সে কথাও জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে, 'তান্ত্রিক সাধনার চক্রগত ব্যাপারটাও কতকটা Communal'—কেননা এ সাধনায় সকল বর্ণের সমান অধিকার আছে। ভৈরবীচক্রে বসলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হন। অপরদিকে ভৈরবী-চক্রের অনুরূপ ব্যাপার বৌদ্ধসঙ্ঘে অনুষ্ঠিত হ'ত। নেপালে তিব্বতে এখনও হয়। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টই বলেছেন,—বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি তান্ত্রিক বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণব পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় ও ভেকধারী নেড়া-নেড়ীরাও Communal ; এইভাবে বিভিন্ন ধর্মপন্থা ও তাদের পারস্পরিক যোগসূত্রের কথা বর্ণনা করে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, পুরীর জগনাথ-ক্ষেত্রেও এই Communal প্রকৃতি ও সমষ্টিগত প্রভাব দেখা যায়। পুরীতেও বর্ণবিচার নেই। জগন্নাথের প্রসাদ চণ্ডালও ব্রাহ্মণের মুখে দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বৈদিক, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টানধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে সঙ্গত কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর মন্তব্য করেছেন, বৈদিক পুরোডাশের সঙ্গে এবং খ্রীষ্টানদের Eucharist-ভক্ষণের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। বলেছেন, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ অন্ন নয় শুধু। এ হ'ল পরম দেবতার প্রতিমূর্তি, স্বয়ং জগন্নাথ। মূল বক্তব্যকে উপস্থাপিত করবার আগে রামেন্দ্রসুন্দর এইভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটি বিশ্বাস-যোগ্য ভূমিকা রচনা করেছেন। ঐ ভূমিকায় ভারতবর্ষের নিকট পাশ্চাত্য জগতের ঋণের কথাও আলোচিত। আর্যাবর্তের সন্ন্যাসধর্ম মিশর ও প্যালেস্টাইনের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপে প্রবেশ করেছিল, পাশ্চাত্য-জগতের বিভিন্ন ধর্মসূত্র আলোচনা করে রামেন্দ্র-সুন্দর এখানে তা' প্রমাণ করেছেন। বলেছেন, যজমানের নবজীবন লাভ, দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য বা একাত্মতালাভ, যজ্ঞে যজমানের আত্মনিষ্ক্রয় ইত্যাদি পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় ভারতবর্ষের পক্ষে অতি পুরাতন। তা' ছাড়া ভারতের বৈষ্ণবরা যে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানদের কাছে ঋণী নয়, ওয়েবার, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ মনীষীদের অভিমতকে খণ্ডন করে রামেন্দ্রসুন্দর তা' বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সন্ন্যাসী-সঙ্ঘও খ্রীষ্টান সমাজের তুলনায় ভারতবর্ষের 'অতি পুরাতন ব্যাপার'।

প্রাচ্য বৌদ্ধ-মন্দিরের গঠন ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান-মন্দিরের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়েও তিনি বলেছেন, সবই যে খ্রীষ্টানের শয়তান কারসাজি করে চীনে, তিব্বতে ও জাপানে ছড়িয়ে দিয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। তাঁর মতে, খ্রীষ্টানের শয়তান যেমন বিদেশ থেকে আমদানি, বৌদ্ধের 'মার'ও তেমনি বিদেশ থেকে আমদানি। এইখানে প্রশ্ন তুলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টানধর্মে শয়তানের প্রভুত্ব কেন হ'ল? ব্রাহ্মণ্য ধর্মেই বা কেন হ'ল না? খ্রীষ্টান ধর্মে হ'ল, কারণ, খ্রীষ্টান আজও জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের বিরোধভাব সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারে নি। বৌদ্ধ-ধর্মে মারের আবির্ভাবের কারণ, অবিদ্যা ও দুঃখের অস্তিত্বে ওরা বিশ্বাসী। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম জগৎকে মধুময় মনে করে। বৈদিক ঋষিরা বলতেন, জগৎকে ভয় করো না। তাঁরা জগৎকে আনন্দময় ও দ্যুতিময় দেখতেন। ভাবতেন, সমস্ত ভূতই আত্মায় বর্তমান, এবং আত্মা সর্বভূতে বর্তমান, সুতরাং এই জগৎকে ঘৃণা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। এই জগৎ থেকে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখে, ভারতবর্ষের বৈদিক ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে অন্য দেশের ধর্ম ও ইতিহাসের পার্থক্য বুঝতে চেয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের স্বরূপ ও মহিমা ধরতে পেরেছেন তিনি। যথার্থই তিনি বলেছেন, 'বেদানুমোদিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যখন সমস্ত জগৎটাই দেবতা,—আনন্দময়, দ্যুতিময়, সুন্দর, তখন সেখানে দুঃখের, অমঙ্গলের বা শয়তানের স্থান হতে পারে না। ব্যবহারিক জগতে কদর্য, কুৎসিত আছে, এ কথা ব্রাহ্মণ একেবারে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি কদর্যকে বিনাশ করতে, কুৎসিতকে সুন্দর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। অপরদিকে বৌদ্ধরা কদর্যকে দেখাতে চায়। রং ফলিয়ে একে বীভৎস করে। এখানেই খ্রীষ্টানের সঙ্গে বৌদ্ধের মিল এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান-ধর্মের মৌলিক পার্থক্য। পার্থক্য নারীদের প্রতি ব্যবহারেও সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে আছে নারীর মহিমার কথা। কিন্তু বৌদ্ধরা এবং প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা নারীকে ঘৃণা করত। এ ছাড়া খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ, উভয় প্রকার ধর্মাবলম্বীদেরই ছিল পার্থিব জগতের প্রতি ঘৃণার ভাব। তাই Physical Science-এ উন্নতি করতে পারেন নি এরা। উন্নতি করেছেন, Alchemy ও Chemistry-তে। অপরদিকে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মীদের পার্থিব জগতের প্রতি অবজ্ঞা ছিল না, তাই তাঁরা গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি Physical Science-এও উন্নতি করেছিলেন। সে যা'ই হোক, আধুনিক যুগে কিন্তু হিন্দুদের অনেকেই সংসারকে হেয় ও কদর্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গী বৌদ্ধভাব-প্রণোদিত। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও শাক্তদের মধ্যে এই বৌদ্ধপ্রভাবের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলোচনার পরবর্তী পর্বে আচার্য ত্রিবেদী তান্ত্রিক-পূজা-পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দুর তান্ত্রিক ধর্ম বৌদ্ধ মঠে পুষ্টিলাভ করেছিল, একথা স্বীকার করেছেন তিনি। কিন্তু বেদের সঙ্গে গোড়ায় মিল না থাকলে ঐ তান্ত্রিক ধর্ম বেদপন্থী সমাজে স্থান পেত না;—এই হ'ল তাঁর বক্তব্য। বৈদিক যজ্ঞের মত তান্ত্রিক পূজার তাৎপর্যও যে আপনাকে ব্রহ্ম বা আত্মারূপে জানবার চেষ্টা, মুক্তিলাভের চেষ্টা, তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি আলোচনা করে

রামেন্দ্রসুন্দর তা' দেখিয়েছেন। অর্থাৎ, জগন্নাথ-মন্দিরের চিত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এইভাবে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের পটভূমিকায় আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্মের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান-ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণ-ধর্মের পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিশ্লেষণ সুসঙ্গত হয়েছে। কারণ, জগন্নাথ-মন্দিরে ব্রাহ্মণ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানাপ্রকার ধর্ম-ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে সৌর-ধর্মের প্রভাবের কথাও বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করে বোঝাতে চেয়েছেন, জগন্নাথের বাৎসরিক রথযাত্রা ও উল্টোরথ সূর্যেরই রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা। তবে খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ-ধর্মের সাদৃশ্যের কথা বর্ণনা করে জগন্নাথ-মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাবের কথাই অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। একথা বলতে গিয়ে প্রথমে খ্রীষ্টান সমাজের বৈশিষ্ট্য ও গীর্জার ভিতরকার ও বাইরের দেওয়ালের চিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তারপর খ্রীষ্টীয় গীর্জার চিত্রাবলীর সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরের চিত্রকলার সাদৃশ্য দেখিয়ে এই মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাবের কথা বলেছেন। খ্রীষ্টানরা মনে করে, যারা চার্চের বাইরে, তারা খ্রীষ্টান-সমাজের বাইরে। তারা শয়তানের রাজ্যে অর্থাৎ Hell বা নরকে স্থান পাবে। আর যারা চার্চ-এর অর্থাৎ সঙ্ঘের ভিতরে এসেছে, তারা উদ্ধার পাবে। এ কারণেই ইয়োরোপের মধ্যযুগের গীর্জার ভিতর ও বাইরের দেওয়াল ভিন্নরূপে চিত্রিত। ভিতরে খ্রীষ্টীয় লীলার চিত্র, সাধু-সজ্জনদের চিত্র। আর বাইরের দেওয়ালে নরকের চিত্র, শয়তান ও তার অনুচরদের চিত্র। অর্থাৎ, চার্চের ভিতর হ'ল স্বর্গ। আর বাইরেটা হ'ল নরকের প্রতীক। জগন্নাথদেবের মন্দিরেও ঠিক এমন ব্যাপার ঘটেছে। এ মন্দিরেরও অভ্যন্তরের সমস্ত চিত্রই পবিত্র। ওখানে দেখি, দেবতারা ত্রিমূর্তির স্তব করছেন, অনন্তশয্যায় শায়িত আছেন নারায়ণ, ইন্দ্র রয়েছেন ঐরাবতের পিঠে আর মহাদেব করছেন জগন্নাথদেবের অর্চনা। অর্থাৎ মন্দিরের অভ্যন্তরে কদর্য চিত্র নেই কোথাও। বীভৎস সব মূর্তি চিত্রিত আছে বাইরের দিকে। এ থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর অনুমান করেছেন, 'হয়ত এ মন্দির প্রথমে বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল। কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরে পরিণত হলে পর বৌদ্ধদের 'মার বা শয়তান বড় একটা আমল পেলেন না'। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বৌদ্ধেরা জগৎকে তিন লোকে বিভক্ত করেছিল,—কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক। যা' কিছু প্রত্যক্ষগোচর, যা'র সঙ্গে কোনোরূপ সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয়, সেটা কামলোক। 'এই কামলোকে অবস্থিত জীব মাত্রই তৃষ্ণার বা কামের অধীন', এজন্যে এরা দুঃখভোগী। স্বর্গের দেবতা থেকে নরকের পাপী অবধি সকলেই এই কামলোকের অন্তর্গত। বৌদ্ধদের প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব এদেরই জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। রূপ-লোকের অধিবাসীর কেবলমাত্র রূপ আছে; এরা সর্বদা ধ্যানে নিমগ্ন। সর্বদাই এরা কাম-মুক্ত। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই রূপলোকেরই নামান্তর হল ব্রহ্মলোক। অরূপলোক-বাসীদের রূপ পর্যন্ত নেই। কিন্তু কামলোকের অধিবাসীদের আছে তৃষ্ণা ও উপাদান। অর্থাৎ, আছে ভোগ্যবস্তুর প্রতি প্রবল আসক্তি ও ভোগ্যকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরার বাসনা। এই তৃষ্ণা ও উপাদানই কামলোকের অধিবাসীর সর্বনাশের মূলে।

কামলোকের জীব মাত্রই এদের অধীন হয়ে কর্মফল ভোগ করছে। এ দু'টিকে বর্জন করতে না পারলে রক্ষে নেই। অতএব এদের হেয়, জঘন্য ও বীভৎস প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হ'ল। কুৎসিত করে এদের চিত্রিত করা হ'ল, যা'তে তৃষ্ণা ও উপাদানের প্রতি সহজেই মানুষের ঘৃণা জাগে। তবে মন্দিরের বাইরের গায়ে কামলোকের অন্যান্য চিত্রও থাকতে পারে; কিন্তু সকল চিত্রই যে বীভৎস হবে, এমন কোনো কারণ নেই। কারণ, নরলোক, সুরলোক, অসুরলোক,—সবই কামলোকের অন্তর্গত। জীব মাত্রই কামনার অধীন হয়ে যে সব লীলাখেলা করে, সবই মন্দিরের বাইরের দিকের গায়ে চিত্রিত হতে পারে। বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরসমূহে ঠিক তাই ঘটেছে, এই হ'ল রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত।

ঠিক একই উপায়ে রথযাত্রার সময় বহু রথের গায়ে অঙ্কিত কুৎসিত চিত্রগুলিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলতে চান, জগন্নাথের মন্দিরের গঠনে রথযাত্রার রথ গড়া হয়। জগন্নাথের রথ জগন্নাথের মন্দিরেরই অনুকরণ; এবং উভয়ের তাৎপর্যও এক। বাইরের তৃষ্ণা ও উপাদানের চিত্রকে উপেক্ষা করে রথে অধিষ্ঠিত জগন্নাথকে দেখতে পেলে আর 'ভব' অর্থাৎ পুনর্জন্ম হবে না। জীবের কামলোক থেকে মুক্তি হবে। বেদান্তেও আছে, "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু";—অর্থাৎ মানবদেহরূপ রথে আরোহণ করে আত্মারূপ রথী ভগবান্ বসুন্ধরায় বিচরণ করছেন। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বৈদান্তিকের চোখে ভগবানের রথস্বরূপ এই মানবদেহ অবিশুদ্ধ বা হেয় না হতে পারে; কিন্তু বৌদ্ধের কাছে ও বৌদ্ধ প্রভাবিত হিন্দুর কাছে এ দেহটা দুঃখভাগী ও হেয়। কারণ, এ দেহ কামলোকে বিচরণ করে। অতএব, সর্বধর্মসমন্বয়ের স্থান এই জগন্নাথক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক এসে মিলেছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। কারুকার্যখচিত জগন্নাথদেবের বিরাট মন্দিরে আলোক প্রবেশের সুব্যবস্থা না থাকার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন একটি বিশিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। অনেকেই জানেন, জগন্নাথমন্দিরে যেখানে দেবতা আছেন, সে স্থান অপেক্ষাকৃত দুর্গম। অতি সাবধানে, অনেক কষ্টে প্রদীপের আলোয় দেবতাকে কতকটা দেখা যায়। কেন এমন হ'ল? মন্দিরস্থাপত্যের বৃহত্তর পটভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বলেছেন, বহু দেবমন্দিরেরই ভিতর অন্ধকার। কারণ, জগতের অধিকাংশ লোকই বাইরের দেহটাকে সার বস্তু বলে জানে। দেহের ভিতরে যে আত্মা বা ভগবান আছেন, তিনি অধিকাংশের কাছেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, অলক্ষ্য। উপনিষদে বলা হয়েছে, তিনি গুহার মধ্যে বাস করেন, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ সাধনা করে যোগীরা তাঁকে দেখতে পান। জ্ঞানের বা ভক্তির প্রদীপ না জ্বাললে তাঁর দেখা মেলে না।

উড়িষ্যার এই মন্দির-প্রসঙ্গ নিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের কিছুটা মতভেদ ছিল। এই প্রসঙ্গে তা' উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র প্রসঙ্গের লিপিকার বিপিনবিহারী গুপ্তের কাছ থেকে উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দির সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য এঁরা শোনেন। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকার রাখার

সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণ দেখিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছিলেন, মন্দিরের অভ্যন্তর অন্ধকার হওয়ার সম্বন্ধে পাকাপাকি নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে সেখানে। সেই নিয়ম-অনুসরণেই জগন্নাথদেবের মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগে আলোক-প্রবেশের সুব্যবস্থা করা হয় নি। এ ছাড়া মন্দিরের গায়ের মিথুন-চিত্র সম্বন্ধেও তিনি শাস্ত্রগ্রন্থের নজীর তুলেছেন। আর মন্দির-গাত্রে কুৎসিত চিত্র-সমাবেশ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য,—এ আর কিছু নয়, একটা বিশেষ সময়ে বৌদ্ধধর্মকে হেয়, জঘন্য ও কদর্য প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা। মন্দিরের গায়ে কুৎসিত চিত্র খোদাই করে সকলের কাছে প্রচার করা যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অত্যন্ত কামপরবশ।

উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের অভাব রয়েছে বলেই অক্ষয়কুমারের এই যুক্তিকে মেনে নেওয়া চলে না। এদিক থেকে ডাঃ শীলের যুক্তি অপেক্ষাকৃত জোরাল। রামেন্দ্রসুন্দর যেভাবে মন্দিরের ভিতর ও বাইরেকে স্বর্গ ও নরকের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিক সেভাবে দেখেন নি। তিনি বলেছেন, নরক বললে যে বিভীষিকার ভাব মনে জাগে, মন্দিরের বাইরেকার গায়ের চিত্রগুলি দেখে ঠিক তা' জাগে না। তাঁর অভিমত, ঐ চিত্রগুলি দেখে বিশুদ্ধচিত্ত সাধুর মনে ঘৃণা উদ্রিক্ত হতে পারে; কিন্তু আপামর জনসাধারণ এদের নেহাৎ-ই ঘৃণার চোখে দেখেন না। ঐ সব চিত্র দেখে অনেক সময় বরং মানুষের ভিতরকার সুপ্ত পশুটি নেচে ওঠে। ব্রজেন্দ্রনাথ বলতে চান, ইয়োরোপের চার্চ সম্বন্ধে স্বর্গ ও নরকের উপমা খাটে। ওখানে চার্চের গায়ে যে সব বীভৎস ও ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকা হয়েছে, তা' দেখে খ্রীষ্টানের মনে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া খুব স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মধ্যযুগের ইয়োরোপে নরক সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, অনুরূপ ধারণা ছিল আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যেও। তবে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে খ্রীষ্টানের মতো অতটা ব্যবধান নেই। ভারতীয়রা বিশ্বাস করত, এখানেই স্বর্গ, এখানেই নরক। ইহকালেই রক্তমাংসকে দমন করে ভূমানন্দে পৌছুতে হবে। ইয়োরোপ দ্বৈত, ভারতবর্ষ অদ্বৈত। উভয়ের নরকের ধরনও তাই স্বতন্ত্র। শয়তানের শাস্তি ও যমদূতের শাস্তির মধ্যেও তাই তফাৎ আছে। খ্রীষ্টানের নরকে একবার যারা যায়, তাদের আর উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যমদূত ধর্মরাজের অনুচর। তাঁর শাস্তির ভিতর দিয়ে মানবাত্মা স্বর্গে পৌছুতে পারে। এই ভারতীয় চিন্তাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন, জগন্নাথ-মন্দিরের চিত্রের ক্ষেত্রে স্বর্গ ও নরকের প্রসঙ্গ অবতারণা করে খ্রীষ্টীয় ও বৌদ্ধ-ধর্মের সাদৃশ্য কল্পনা করা ঠিক হবে না। তবে একদিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের মত তিনিও জগন্নাথদেবের মন্দিরে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা বলেছেন এবং সেই বৌদ্ধ-প্রভাবের মধ্যে তান্ত্রিক রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের অভিমত, ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাবার জন্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এ ধরনের জঘন্য পাশব ব্যাপার চিন্তা করতে হ'ত। বৌদ্ধ মঠে রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য শিল্পীরা পুরুষানুক্রমে কাজ করত। আর সন্ন্যাসীরা করত design; মিস্ত্রীরা সে অনুযায়ী কাজ করত। মিস্ত্রীরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তান্ত্রিক

সাধন-পদ্ধতি তাঁদেরই নির্দেশ অনুযায়ী মন্দিরের গায়ে খোদাই করত। এইভাবে ঐ চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির ধারা থেকে গেল।

জগন্নাথদেবের মন্দির সম্পর্কে ডাঃ শীলের এই বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে রামেন্দ্রসুন্দর সমর্থন করেছিলেন। তাই বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মের সাদৃশ্যের যে সূত্রটিকে কেন্দ্র করে উভয়ের মতভেদ হয়েছিল, সেই সূত্রটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বললেন, জগন্নাথ-মন্দিরের ভিতর স্বর্গ ও বাইরেটা নরক, এমন কথা বলতে চান নি তিনি। জগৎটাকে হেয় প্রতিপন্ন করাও যে মুখ্য উদ্দেশ্য, এমন কথা বলাও তাঁর অভিপ্রেত নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, এই যে মন্দির, এ হ'ল সঙ্ঘের প্রতিকৃতি। মন্দিরের ভিতর ও বাহির বললে বুঝতে হবে, সঙ্ঘের ভিতর ও বাহির। বুদ্ধসঙ্ঘের বাইরে যারা আছে, তাদের নির্বাণ-প্রাপ্তির আশা নেই, তারা মারের অধীন হয়ে রয়েছে। খ্রীষ্টান-সঙ্ঘের বাইরে যারা আছে, তারা হয়ে আছে শয়তানের অধীন। খ্রীষ্টানের শয়তান নরকের রাজা, সুতরাং গীর্জার বাইরে নরকের ছবি ; কিন্তু গীর্জার ভিতরে ভগবানের ধর্মরাজ্য। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মন্দির সম্বন্ধে এই স্বর্গ-নরক মতবাদ খাটে না। খ্রীষ্টানের স্বর্গ ও নরকে যে বিপুল তফাৎ, ব্রাহ্মণে সেরূপ নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে, মন্দির-গাত্রে মূর্তি-সমাবেশ সম্বন্ধে এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান-ধর্মের মিল-অমিল সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্রজেন্দ্রনাথ মূলতঃ একই অভিমত পোষণ করতেন। খ্রীষ্টীয় ও বেদপন্থীদের স্বর্গ-নরক বিষয়ক ধারণাতেও শেষ অবধি উভয়ে একমত হতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সমসাময়িক কয়েকজন চিন্তাশীলদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর একমত হতে পারেন নি। চন্দ্রনাথবাবু-প্রমুখ লেখকরা জোর দিয়ে বলতেন, "আমরা হিন্দু ; আমাদের লক্ষ্য কেবলই পরকালের দিকে ; আর পাশ্চাত্যদিগের একমাত্র লক্ষ্য ইহকালে সুখস্বচ্ছন্দতা।" রামেন্দ্রসুন্দর এই মতবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। এর কারণ, পাশ্চাত্য কথাটিকে তিনি আরও সংকীর্ণ অর্থে নিয়েছেন। পাশ্চাত্য বলতে তিনি বুঝেছেন, খাঁটি খ্রীষ্টান মতাবলম্বীদের। তাই তাঁর মতে, পাশ্চাত্য বলতে যদি আজকালকার বিজ্ঞানসর্বস্বদের বুঝায় তা' হলে কথাটা কতকটা সত্য হতে পারে। অতি প্রাচীনকালের গ্রীক বা রোমানকে যদি ধরা যায়, তা' হলেও বা কতকটা সত্য হতে পারে। কিন্তু খাঁটি খ্রীষ্টান মত ধরলে, কথাটা মেনে নেওয়া চলে না। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, খ্রীষ্টানের কাছে ইহকালের কোনো মূল্য নেই, পরকালই সব। ইহকালের মূল্য শুধু পরকালের জন্যে প্রস্তুত হবার ক্ষেত্র হিসেবে। সে কারণেই যাঁরা বলেন, খ্রীষ্টান পরকালের কথা ভাবে না, তাঁরা খ্রীষ্টীয় ধর্মের মর্ম গ্রহণ করতে পারেন নি।

অপরদিকে ভারতবর্ষে ইহকালের সঙ্গে পরকালের, স্বর্গ-নরকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের এ ধরনের পার্থক্য নেই। এ দেশে 'ইহলোক পরলোক এক পর্যায়ের, এক শ্রেণীর জিনিষ। স্বর্গে মর্ত্যে বিশেষ ভেদ নাই।' ভেদ যে নেই, একথা বেদপন্থী, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন ; এবং প্রসঙ্গতঃ মন্দিরের ভিতর ও বাইরের দিককার চিত্রগুলোর তাৎপর্য আরো সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সুবিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণের পর তাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল এই

যে, "বেদপন্থীর মুক্তি, বুদ্ধপন্থীর নির্বাণ—উভয়ের পক্ষে জগৎ মিথ্যা—ইহ-পরকাল নাস্তি, স্বর্গ-নরক নাস্তি"। কিন্তু মুক্তি বা নির্বাণের অনুরূপ কোনো অবস্থা খ্রীষ্টান-ধর্মে নেই। 'সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাকালে দেবযানে গতি,' আর দেবতার সঙ্গে 'একাত্মতা লাভের চেষ্টায় দেবতার সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সারূপ্য লাভ'—এ থেকে 'পৌরাণিক হিন্দুর ব্রহ্মলোকে, শিবলোকে, বিষ্ণুলোকে গতি' ; এ অবস্থা মুখ্যতর ভক্তিমার্গে প্রাপ্য। ওখান থেকে সংসারে ফিরতে হয় না। সাধারণ হিন্দুরা একেই বলে, ভবসংসার থেকে নিষ্কৃতি—শমন-ভয় থেকে নিষ্কৃতি। বৌদ্ধমতে এই হ'ল অনাগমীর অবস্থা। অনাগমীরা শীল (সৎকর্ম) ও সমাধি দ্বারা এই অবস্থা পান ; ফলে রূপলোকে বা ব্রহ্মলোকে গতি হয়—সেখান থেকে ফিরতে হয় না। হিন্দুর পক্ষে এর "চরম পরিণতি গোলোকে—বিষ্ণু-লোকেরও ঊর্ধ্বে ; সেখানে যুগল-উপাসকদের স্থান। বৌদ্ধগণের চরম সুখাবতীতে। সেখানে বোধিসত্ত্বগণের ও অর্হৎগণের স্থান। শীল ও সমাধির উপরে প্রজ্ঞা (জ্ঞানবল) দ্বারা অর্হতেরা এই লোকে স্থান পান।" কিন্তু গোলোকবাসীও মুক্ত নন, সুখাবতীবাসীও নির্বাণ পান নি। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে যদি কোনো representation থাকে, তবে তা' এই অবস্থার। মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালের চিত্রগুলি এই অবস্থাজ্ঞাপক।

'বেদের পিতৃযানের পরিণতি নরলোক থেকে দেবলোকে, যমলোকে বা নরকে যাতায়াত'। সাধু বা অসাধুদের কর্মের ফলে এ সকল লোকে কিছুদিনের জন্যে যাতায়াত করতে হয়। এই হ'ল সুখদুঃখের বন্ধন ; অতএব একেই বলে বদ্ধাবস্থা। "হিন্দুর ভাষায় ফলকামনা, বৌদ্ধের ভাষায় তৃষ্ণা এই গতায়াতের হেতু। বৌদ্ধ-মতে এই সমুদয় লোক মারের অধীন। মারের নামান্তর কাম। দেবলোক, নরলোক, যমলোক, নরক, সমুদয়ই কামলোকের অন্তর্গত—এক পর্যায়ের জিনিষ—কেবল এ-ঘর আর ও ঘর। এ বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ একমত।"

এবার এই ধর্মবিশ্বাসের আলোকে মন্দিরের বাইরের দিককার চিত্রগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, এই কামলোকের চিত্র আছে মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে। অমরাবতীর ঐশ্বর্য থেকে নরলোকের সুখ-দুঃখ এবং নরকের যাতনা, সবই ওখানে চিত্রিত আছে। আছে দেবতাদের নানা খেলার সঙ্গে মানব-জীবনের খেলা, রাজারাজড়ার কাণ্ড থেকে গরিব গৃহস্থের গৃহস্থালি, এমন কি, ভগবান বুদ্ধের মর্ত্যলীলার চিত্র থেকে মানবদেহধারী রামচন্দ্রের লীলা। এদের সবই কামলোকের অন্তর্গত। বৌদ্ধেরা এর জঘন্য দিকটা চালাবার চেষ্টা করেছিল। কেন না, দুঃখবাদী বৌদ্ধের নিকট কামলোক বর্জনীয়, জঘন্য, কুৎসিত। আনন্দবাদী ব্রাহ্মণ একে কুৎসিত ভাবেন না। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য, হিন্দুমন্দিরে জঘন্য চিত্র বৌদ্ধ-প্রভাবের ফল।

এইভাবে স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে হিন্দু-মন্দিরের ভিতর ও বাইরেকার চিত্রগুলোকে ব্যাখ্যা করলেন রামেন্দ্রসুন্দর। তারপর স্বর্গ-নরক সম্বন্ধীয় ধারণায় হিন্দু ও বৌদ্ধদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের পার্থক্য কোথায়, তা' বোঝালেন। বললেন, খ্রীষ্টানের Heaven-কে আমরা গোলোক ও সুখাবতীর অনুরূপ মনে করতে

পারি। কিন্তু খ্রীষ্টান transmigration মানেন না; কাজেই পিতৃযানের অনুরূপ কিছু খ্রীষ্টানিতে নেই। Heaven-এর পরে একেবারে Hell; Heaven খ্রীষ্টের রাজ্য, ওখানে অনন্ত সুখ; Hell শয়তানের রাজ্য, সেখানে অনন্ত দুঃখ। মাঝামাঝি কিছু নেই। কাজেই খ্রীষ্টানের কাছে পরকালটাই সব—ইহকাল কিছুই নয়। বৌদ্ধেরা এই ধারণাকে অবৈজ্ঞানিক বলেন। Roman Catholic Christian-রা একটা Purgatory মানেন; সেখানে পাপী শাস্তিভোগ করে কতকটা বিশুদ্ধি পায়। Protestantরা সেই Purgatoryও উঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, যে সব পাপী খ্রীষ্টের শরণ নেয়নি, তাদের কোনো আশাই নেই। এ ছাড়া খ্রীষ্টানদের Doctrine of Predestination এর অনুরূপ কোনো কিছুও হিন্দু বা বৌদ্ধ-মতে নেই।

স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে হিন্দু-বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টানদের ধারণার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, আশ্চর্য ইতিহাস-নিষ্ঠা ও প্রগাঢ় বিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, উচ্চাঙ্গের মননশীল চিন্তার তা' এক বিশিষ্ট উদাহরণ। দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধে আলোচনায়, বৈদিক সাহিত্য ও পৌরাণিক সাহিত্যের মাঝখানে যে ব্যবধান আছে, তার ঐতিহাসিক হেতু নির্দেশের প্রচেষ্টায় এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব ও তাঁর স্থান গোলোকের ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব ও বৌদ্ধদর্শনে বৈদিক প্রভাব নিয়ে আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বেদোত্তর, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান-ধর্মের সঙ্গে বৈদিক দর্শনের তুলনা করে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, সব কিছুরই মূল বেদে।

বৈষ্ণব দর্শনে বেদের প্রভাব নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের স্থান গোলোক বলতে বোঝায় বাঙ্ময় লোক। বেদমতে এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাক্ অর্থাৎ শব্দ থেকে উৎপন্ন। এই শব্দই বেদ এবং এই শব্দই বেদের মন্ত্র। আবার গো শব্দে বেদে যেমন বাক্ বা শব্দ বুঝায়, সেরূপ পৃথিবী বা জগৎকেও বুঝায়। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, অহং অর্থাৎ আমি যে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এই বৈদান্তিক মতও আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে পাই। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রকেই গোরূপে নির্দেশ করার মূল বেদেই রয়েছে। বেদের মূল অন্বেষণ করেই রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, কিভাবে পরবর্তীকালে জগৎপতি সৃষ্টিকর্তাকে গোপতি ও গোপাল নামে নির্দেশ করা হয়েছে এবং কিভাবে সৃষ্ট জীবকে কখনও গো, কখনও বা গোপরূপে, আবার কখনও বা গোপীরূপে দেখান হয়েছে। বাগ্‌দেবতার নারীরূপ ব্যাখ্যানেও রামেন্দ্রসুন্দর আশ্চর্য বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, বাগ্‌দেবতার নারীরূপ কল্পনাই ব্যাকরণ-মতে স্বাভাবিক। তিনি প্রতিপন্ন করেছেন, কিভাবে বেদের মধ্যেই এই বাগ্‌দেবতার বিবিধ নাম ও বিবিধ মূর্তি দেখতে পাই এবং কিরূপে তিনি বিভিন্ন মূর্তিতে নারায়ণ বিষ্ণুর, প্রজাপতি ব্রহ্মার, এমন কি মহাদেব মহেশ্বরের পত্নীরূপে কল্পিত হয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত, জীব যখন এক পক্ষে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, তখন জীবেরও গোরূপে, গোপরূপে এবং গোপীরূপে কল্পনা আপনা থেকে আসে। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর অনির্বচনীয় ভেদাভেদ সম্পর্কের কথাও আপনা

থেকে আসে। শ্রীকৃষ্ণের ধাম যে গোলোক, এবং গোপ ও গোপী ভিন্ন অপরের সেখানে প্রবেশ নেই, একথাও স্পষ্ট হয়।

আলোচনার পরবর্তী পর্বে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, বৌদ্ধ আর বৈষ্ণব, কে কার নিকট ঋণী, এ প্রশ্ন অবান্তর। কেননা, উভয়েরই মূল বেদে। বৌদ্ধদের সুখাবতীর বর্ণনার সঙ্গে আমাদের পুরাণের ও আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থের গোলোকের এবং ব্রজমণ্ডলের বর্ণনার সাদৃশ্য দেখিয়ে তিনি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধদের সুখাবতীর সঙ্গে খ্রীষ্টানদের Heaven-এর তুলনা করেছেন তিনি। দেখিয়েছেন, উভয়ের আশ্চর্য সাদৃশ্য। এ ছাড়া যজ্ঞতত্ত্বের দিক থেকে বৌদ্ধদের বিশেষতঃ বেদপন্থীর সঙ্গে খ্রীষ্টানের মিল প্রদর্শনেও রামেন্দ্রসুন্দর প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

৫

'যজ্ঞ-কথায়'ও (১৯২০) প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় সুস্পষ্ট। বেদপন্থীর ক্রিয়া-কর্ম ও যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সবচেয়ে পরিণত চিন্তার পরিচয় এ গ্রন্থে খুঁজে পাই। বৈদিক যজ্ঞের স্বরূপ-বিশ্লেষণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় রামেন্দ্রসুন্দর এখানে অসাধারণ নিষ্ঠা ও অনন্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটি লেখকের মৃত্যুর পর ১৩৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। যজ্ঞ-কথার প্রবন্ধগুলো প্রথমে লেখা হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অনুরোধে। পরে সব ক'টি প্রবন্ধই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হয়। তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে যজ্ঞ-কথার প্রবন্ধগুলো ১৩২৪ থেকে ২৫ সালের 'সাহিত্যে' বেরিয়েছিল। এই গ্রন্থে মোট পাঁচটি প্রবন্ধে যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ-পাঁচটি হল :—যজ্ঞ—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, সোমযাগ, খ্রীষ্ট যাগ এবং পুরুষযজ্ঞ।

প্রথমোক্ত প্রবন্ধের প্রারম্ভে বেদপন্থী সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর এবং এই সমাজে যজ্ঞের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেছেন। চলিত অর্থে যে সমাজকে আমরা হিন্দু-সমাজ বলি, রামেন্দ্রসুন্দর তা'কেই বলেছেন, বেদপন্থী সমাজ। এই সমাজ বেদের শাসন মেনে থাকে। আবার বেদপন্থী সমাজের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান হল যজ্ঞ। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য না বুঝলে বেদপন্থী সমাজের বৈশিষ্ট্যকে জানা যাবে না। এ কারণেই যজ্ঞ-কথার প্রবন্ধ-গুলোতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

প্রথমে তিনি বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজের সংকীর্ণতা ব্যাখ্যা করেছেন। বেদে অধিকারকে কেন্দ্র করে বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে নিজেকে দ্বিজ বলে পরিচয় দিতেন এবং কিভাবে শূদ্র ও অনার্যদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন সে কথা বুঝিয়ে বলেছেন। তারপর দ্বিজ শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে উপনয়ন ও সমাবর্তনের কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ এসেছে বিবাহের কথা। বেদপন্থীর

যজ্ঞানুষ্ঠান নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে সামাজিক রীতি-নীতির এই দিকগুলো নিয়ে আলোচনা সুসঙ্গত হয়েছে। কারণ, বেদবিহিত ধর্ম-কর্ম সপত্নীক অনুষ্ঠান। বিবাহ না করলে এ সকল অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে না। যে বিবাহ করে নি, দেবগণের সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক ঘটতে পারে না। দেবগণ 'মনুষ্য-প্রদত্ত যজ্ঞভাগের অপেক্ষায়' বসে আছেন। যার পত্নী নেই, সে দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের বেদপন্থী সমাজে বিবাহের অধিকার নিয়েও মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অশিক্ষিত থাকলে, বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করতে না পারলে বিবাহে অধিকার মিলত না। এইভাবে দ্বিজাতি-সমাজের স্বরূপ-ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, ভারতবর্ষের এই যে অতি পুরাতন সমাজ, অশিক্ষিত ব্যক্তি যে সমাজে গৃহী হতে পারত না, ধর্ম-কর্মে অধিকার পেত না, সেই সমাজই দ্বিজাতি সমাজ। 'সেই সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বিজ ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনের যে-কোনও বর্ণেরই হউক, অথবা যে-কোনও মিশ্র বর্ণেরই হউক, সে-ই দ্বিজ'। সমুদয় বেদবিদ্যায়, এদের অধিকার আছে। সেই অধিকার থেকে কেউ এদের বঞ্চিত করতে পারে না। সমাজস্থিতি ও লোকস্থিতির জন্যে এদের কতকগুলো সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে হ'ত, কতকগুলো কৃত্রিম অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে হ'ত। এই কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলির সাধারণ নাম 'যজ্ঞ'। এই যজ্ঞের সঙ্গেই বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজের নিগূঢ় সম্বন্ধ জড়িত। বেদপন্থী সমাজের ধ্যান-জ্ঞান, ধর্ম-কর্ম এবং ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যজ্ঞের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই কারণেই যজ্ঞ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রারম্ভে বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজের বিশিষ্টতা এবং সেই সমাজের সঙ্গে যজ্ঞের নিগূঢ় যোগসূত্র বর্ণনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা আছে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে। এ কারণেই লেখক বেদের দুই ভাগ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায়, তা' বর্ণনা করে সংহিতা ও বেদমন্ত্রের মূলকথা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের প্রচার-কর্তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে মীমাংসা-দর্শনের প্রসঙ্গও অবতারণা করেছেন। অর্থাৎ একেবারে মূল ঘেঁষে অন্বেষণ শুরু করে ধীরে ধীরে যজ্ঞের আলোচনার সূচনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

প্রথমে তিনি যাজ্ঞিক পণ্ডিতদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'যজ্ঞ' শব্দটির অর্থ-নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, 'দেবতার উদ্দেশে কোনও দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ'। এখানে উল্লিখিত তিনটি শব্দ দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগকে সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয় প্রকার পারিভাষিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রথমে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ ক'রে পরে ক্রমশঃ ব্যাপক অর্থে এসেছেন।

বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদি নানা দেবতার উল্লেখ আছে। এ সকল দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ করা হ'ত। ত্যাগকর্মই হ'ল আহুতি। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হ'ত, তার নাম হব্য। হব্য হিসেবে নানা প্রকার দ্রব্য দেওয়া হ'ত। এই দ্রব্য ত্যাগই হ'ল যাগ। যে গৃহস্থের হিতার্থে যাগ অনুষ্ঠিত হ'ত, তিনি যজমান। যজমানের হিতার্থে এই যাগ করতেন যিনি, তাঁর নাম যাজক বা ঋত্বিক। এর পর

ঋগ্‌বেদী প্রধান যাজক হোতা, যজুর্বেদী ঋত্বিক অধ্বর্যু এবং সামবেদী প্রধান ঋত্বিক উদ্গাতার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা করে ঋক্, যজু ও সাম এই তিন শ্রেণীর বৈদিক ঋত্বিকদের পরিদর্শক সর্বপ্রধান ঋত্বিক ব্রহ্মার যোগ্যতা ও ক্রিয়াকর্মের কথা বলা হয়েছে। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বৈদিক ক্রিয়া-কর্মে যজমান-পত্নীর গুরুত্ব ও ভূমিকার কথা বর্ণিত। বলা হয়েছে, সপত্নীক যজমান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন, উভয়ে তুল্যরূপে ফলভাগী হতেন। যজমানের পত্নী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকতেন। তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে না পারলেও বৈদিক ক্রিয়া-কর্মে পূর্ণ অধিকার ছিল তাঁর। তাঁকেও কয়েকটি অনুষ্ঠান করতে হ'ত। যজমান-পত্নী উপস্থিত না থাকলে যজ্ঞই চলত না। গৃহ্য আর শ্রৌত-কর্ম অনুযায়ী এ ধরনের যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ত। গৃহ্য অগ্নিতে যাবতীয় গৃহ্য কর্ম অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় স্মার্ত কর্ম সম্পাদিত হ'ত। আর শ্রৌত যজ্ঞ অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হ'ত শ্রৌত অগ্নিতে। অভিজ্ঞ যাজকের অভাবে জটিল শ্রৌত অনুষ্ঠানগুলি কালক্রমে একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণরা গৃহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে একেবারে ত্যাগ করতে পারলেন না। অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু উপনয়ন, বিবাহ, পুকুর-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি গৃহকর্মের বিভিন্ন ব্যাপারে গৃহ্যযাগ এখনও চলিত আছে। অথচ যজ্ঞানুষ্ঠানের আসল তাৎপর্য নিহিত আছে শ্রৌত যজ্ঞে। তাই সঙ্গত কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, যজ্ঞের তাৎপর্য বুঝতে হলে শ্রৌত অগ্নির কথা ও শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য শ্রৌত যজ্ঞের কথা ভাল করে জানতে হবে। এই শ্রৌত অগ্নি-প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে এ প্রবন্ধে। সেই সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনে শ্রৌত অগ্নির গুরুত্বের কথাও এখানে বর্ণিত। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, "এই শ্রৌত অগ্নির ব্যাপার বেদপন্থীর গার্হস্থ্য জীবনে একটা বৃহৎ ব্যাপার। গার্হস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণতা লাভের জন্য এই শ্রৌত অগ্নির আবশ্যকতা। কিন্তু শ্রৌত অগ্নি বিবাহের পর স্থাপনীয়। গৃহস্থের বাড়ীর কোনো স্থানে অগ্নিশালা বা অগ্ন্যাধার স্থায়ীভাবে নির্মিত হ'ত। সপত্নীক গৃহস্থ সেই অগ্ন্যাগারমধ্যে যথাবিধি শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করতেন। এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা কর্মের নাম অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষেপে এর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র রামেন্দ্রসুন্দর তুলে ধরেছেন। অগ্নিহোত্র যাগের কথা বর্ণনা করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, 'এই গৃহস্থিত অগ্নি যেন সমস্ত গৃহস্থালির একটা symbol'। এই অগ্নিকে অবলম্বন করে গৃহস্থালি ধৃত ছিল। তিন অগ্নিগার্হপত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নির মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধিস্বরূপ। "এক পক্ষে গৃহস্থ এবং অন্য পক্ষে দেবগণ এবং পিতৃগণের মধ্যে তিনি মধ্যস্থতা করেন।" গার্হপত্যের অগ্নি তুলেই আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি জ্বালা হয়। আহবনীর অগ্নি দেবগণের মুখ এবং দক্ষিণাগ্নি পিতৃগণের মুখ। এই মুখ দ্বারা তা'রা গৃহস্থের নিকট তাদের প্রাপ্য গ্রহণ করেন, এবং তা'র বিনিময়ে গৃহস্থের কল্যাণসাধন করেন। "বেদপন্থী সমাজের থিয়োরী মতে সমাজ কতকগুলি গৃহের সমষ্টি মাত্র। গৃহটাই সমাজের unit। আর যিনি গৃহস্থ, তিনি সেই গৃহের সাময়িক রক্ষাকর্তা মাত্র"। দক্ষিণাগ্নিতে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই অগ্নির সাহায্যে গৃহের অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষিত হয়ে থাকে। এই হিসেবে দেখেছেন বলেই অগ্নিহোত্র রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নয়, প্রকৃতপক্ষে একটি সামাজিক

অনুষ্ঠান। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, অগ্নির দ্বারাই গৃহস্থের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অগ্নি রক্ষা করেন বলেই তিনি ধনসম্পত্তির অধিকারী এবং ধনসম্পত্তির অধিকারী বলেই সমাজের অন্যান্য গৃহস্থের সঙ্গে তাঁর আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি তাঁর কাছে সাহায্য পায় এবং তাঁকে সাহায্য দেয়। এরূপে রাষ্ট্রের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ঘটে। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের এই symbolic তাৎপর্য থাকাতেই এটি গৃহস্থ-জীবনের প্রধান অনুষ্ঠান এবং সর্বপ্রধান নিত্যকর্ম বলে গণ্য হ'ত। এই প্রসঙ্গে তিনি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছেন। সে যুগের সমাজে পিতা বর্তমানে পুত্র কতটা স্বাধীনতা পেতেন, পিতা বর্তমানে পৃথকভাবে গৃহস্থালি পেতে পৃথকভাবে অগ্ন্যাধান করে শ্রৌত কর্মের অনুষ্ঠানে পুত্রের কতদূর স্বাধীনতা ছিল, এবং স্বাধীনতা যদি থেকে থাকে তো তাঁর পৈতৃক দায়াধিকারে কোনরূপ সংকোচ ঘটত কি না, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করেছেন তিনি।

যজ্ঞকথার পরবর্তী প্রবন্ধ 'ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ' উচ্চাঙ্গের দার্শনিক রচনার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। যাবতীয় শ্রৌত যজ্ঞকে ইষ্টিযাগ, পশুযাগ ও সোমযাগ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এ প্রবন্ধে প্রথমোক্ত দু' শ্রেণীর যজ্ঞ নিয়ে গভীর ও তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে এসেছে ইষ্টিযাগের প্রসঙ্গ। আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় একটি ইষ্টিযাগ করতে হ'ত। অন্ততঃ ত্রিশ বছর ধরে করতে হ'ত। অমাবস্যার ইষ্টিযাগের নাম দর্শযাগ, আর পূর্ণিমার ইষ্টিযাগের নাম পূর্ণমাস-যাগ। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর কেবল পূর্ণমাস-যাগের বিবরণ দিয়েছেন। কারণ, পূর্ণমাস-যাগের অনুষ্ঠানটি আয়ত্ত হলেই যাবতীয় ইষ্টিযাগের অনুষ্ঠান বুঝা যাবে। পূর্ণমাস-যাগ যাবতীয় ইষ্টিযাগের প্রকৃতি বা model ; আর আর ইষ্টিযাগ এর বিকৃতি। তা ছাড়া পূর্ণমাস-যাগের বিধি সকল ইষ্টিযাগেই প্রযোজ্য।

পূর্ণমাস-যাগের বর্ণনা দিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথমে প্রধান যাগের কথা বলেছেন। তারপর এই যাগের পূর্বে এবং পরে যে সকল অপ্রধান যাগ এবং হোম করতে হ'ত, একে একে তাদের বিবরণ দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ প্রধান ও অপ্রধান যাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলো সাধারণ নিয়মেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে পশুযাগের বর্ণনা আছে। পশুযাগ নানাপ্রকার। এদের মধ্যে নিরূঢ়পশুবন্ধ নামক পশুযাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় এই যাগ করা কর্তব্য। অনেকে আবার বছরে দু'বার উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তিতে এই যাগ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এই পশুযাগ অন্য যাবতীয় পশুযাগের প্রকৃতি। এর বিবরণ দিলে অন্য যাবতীয় পশুযাগেরই মোটামুটি ধারণা হবে, এই বিবেচনায় রামেন্দ্রসুন্দর এখানে নিরূঢ়পশুবন্ধ নামক পশুযাগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তারপর দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক যুগের একটি মতবাদ Animism theory নিয়ে আলোচনা আছে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হ'ল খ্রীষ্টীয় ও বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য যে একই রকম তা' দেখান। যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটি মতের উল্লেখ করেছেন

রামেন্দ্রসুন্দর। সমাজের অভিব্যক্তির তিন স্তরে তিন মত প্রযোজ্য। প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন করে, দেবতার খোরাক যুগিয়ে তাঁর প্রীতিসাধন এবং তার দ্বারা নিজের স্বার্থসাধন। দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য, কোনো কিছু অর্পণ করে দেবতার কাছে বশ্যতা স্বীকার। এখানে দেবতার লাভালাভ দেখবার প্রয়োজন নেই। নিষ্ক্রয়স্বরূপে অল্প মূল্যের জিনিস দিলেও চলতে পারে। মাংসের পরিবর্তে রুটি দিলেও চলবে। তৃতীয় স্তরে স্বার্থ-অন্বেষণের প্রশ্ন নেই আর—একেবারে স্বার্থত্যাগের প্রশ্ন। এ স্তরে ত্যাগটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। বেদপন্থীরা এই ত্যাগকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। 'যাজ্ঞিকের পরিভাষা মতে কোনও দ্রব্য ত্যাগেরই নাম যজ্ঞ'। পশু-ত্যাগ বা উৎসর্গের কথা ওঠে এখানে। নর-যজ্ঞের প্রশ্ন ওঠে। শুনঃশেফের উপাখ্যান বিশ্লেষণ করে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, প্রাচীন বেদপন্থী সমাজে নরযজ্ঞ ছিল না। ইষ্টিযাগে এমন কি পশুযাগে ও সোমযাগেও পুরোডাশ আহুতির কথা বর্ণনা করে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বৈদিক যজ্ঞে পশুবধে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মেছিল, একথা মনে করাই সঙ্গত। পশুর বদলে রুটি দেবার তাৎপর্যই এই। ব্রহ্ম-বাদীরা বলছেন, পশুমাংসের বদলে কৃষিজাত যব বা চাউল দিলেই পশু দেওয়ার ফল হবে। এই হ'ল নিষ্ক্রয়। পশুর পরিবর্তে নিষ্ক্রয় পুরোডাশ। নরপশুর বদলে ক্রমশঃ ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল, অবশেষে ধান ও যব চলিত হয়েছে। অতএব, যজ্ঞে পুরোডাশ অর্পণ মানুষের আত্মসমর্পণেরই প্রতীক। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, যজ্ঞে আত্মসমর্পণ ব্যতীত ঈশ্বরের তুষ্টি হয় না। তাই যীশুখ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির নিষ্ক্রয়রূপে আত্মসমর্পণ করলেন। ক্রুশে চড়ে মৃত্যুই সেই আত্মসমর্পণ। ক্রুশে চড়বার পূর্বরাত্রে তিনি তাঁর শিষ্যদের যে রুটি আর মদ খেতে দিয়েছিলেন সেই রুটি হ'ল তাঁর মাংসের প্রতীক; আর মদ হ'ল রক্ত। এই রুটি আর মাংস ভোজন মানেই খ্রীষ্টকে ভোজন করা। অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুরূপে যীশু আপনাকে বলি দিলেন। যজমানের পক্ষে যেমন হবিঃশেষ-ভক্ষণ আবশ্যক, যীশুর ভক্তরাও তেমনি মদ ও রুটি উৎসর্গ করে তা' ভক্ষণ করে থাকে। বেদপন্থীদের কাছে পুরোডাশ বা রুটি হ'ল মাংসের স্থানীয়। তবে বৈদিক দেবতারা রক্ত চাইতেন না। খ্রীষ্টানের যজ্ঞে মদ হ'ল রক্তের প্রতীক। আর বৈদিক যজ্ঞের কোথাও কোথাও সুরার প্রচলন দেখা যায়।

'যজ্ঞকথা'র পরবর্তী প্রবন্ধ 'সোমযাগ' ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে আর্যদের অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান সোমযাগের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেদপন্থী সমাজে নানাবিধ সোমযাগের অনুষ্ঠান ছিল। কোনো যজ্ঞ একদিনে, কোনো যজ্ঞ একাধিক দিনে, আবার কোনো যজ্ঞ বৎসর ধরে অনুষ্ঠিত হ'ত। আলোচ্য প্রবন্ধে কেবল একদিনে সম্পাদ্য সোম-যাগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণীর সোমযাগকে বলা হ'ত জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতি-ষ্টোম আবার কম করে সাত রকমের ছিল। এদের মধ্যে অগ্নিষ্টোমই প্রধান। অগ্নিষ্টোমের প্রয়োগ-পদ্ধতি জানা থাকলে অন্য সব যজ্ঞের পদ্ধতি সম্বন্ধেও ধারণা জন্মে। এ কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর এখানে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা করা হয়েছে ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্র উভয় প্রকার গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের

উপর নির্ভর করে সঙ্গত কারণেই লেখক এ আলোচনা করেন নি। কারণ, ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞের পদ্ধতি যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। যজ্ঞ-পদ্ধতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক উপাখ্যান-উপকথা সেখানে রয়েছে। খাঁটি পদ্ধতির বর্ণনা আছে শ্রৌতসূত্র নামক স্মৃতিশাস্ত্রে। আবার শ্রৌতসূত্র রচিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ অবলম্বন করে। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উপর ভিত্তি করে লেখা হয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে লেখা হয় কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্র। এ কারণেই সোমযাগের অন্তর্গত অগ্নিষ্টোমের বর্ণনা দিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ ও আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। তবে জটিল জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি এখানে দেন নি। অনেক কাটছাঁট করে সংক্ষেপে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ দেওয়া হয়েছে এখানে।

প্রথমে যজ্ঞভূমি এবং যজ্ঞ-বেদি ও মণ্ডপের বর্ণনা, তারপর ঋত্বিক ও অন্যান্য সহকারীদের কথা। পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের উদ্যোগ-আয়োজনের প্রসঙ্গ। এই উদ্যোগ-আযোজনে সময় লাগে চার দিন। যজমানের দীক্ষা এবং দীক্ষার অনুকূল ইষ্টিযাগ প্রথম দিনের প্রধান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুসরণে রামেন্দ্রসুন্দর অতি সুন্দরভাবে যজমানের বেশভূষার ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছাড়া দীক্ষিত যজমানের পালনীয় নিয়মগুলির বর্ণনাও এখানে রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের বর্ণনায় স্থান পেযেছে যজ্ঞের আরম্ভসূচক একটি ইষ্টিযাগ বা প্রায়ণীয় ইষ্টি। তারপর সোমক্রয়, আতিথ্য ইষ্টি, প্রবর্গ্য কর্ম এবং উপসৎ ইষ্টির বর্ণনা। সোমক্রয়ের ব্যাখ্যাটি কৌতূহলোদ্দীপক। প্রবর্গ্যের ক্রিয়া-কর্মের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। উপসৎ ইষ্টির বিশ্লেষণও বেশ চিত্তাকর্ষক। চতুর্থ দিনের বর্ণনায় প্রথমেই আছে, অগ্নিপ্রণয়ন, হবির্ধান-প্রবর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অগ্নি ও সোমকে কিভাবে মহাবেদিতে স্থাপন করা হয়, সে কাহিনী। এরপর করণীয় পশুযাগ। সংক্ষেপে এখানে এর উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তারপর আছে বসতীবরী বা সোমরস ছেঁচবার জন্যে যে জলের দরকার, তার বর্ণনা। এইভাবে প্রথমে সোমযাগের উদ্যোগ-আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। তারপর পঞ্চম দিনের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে মূল সোমযাগের কাহিনী। তবে এ কাহিনী বর্ণনার পূর্বে সোম ছেঁচে রস বের করার পদ্ধতি (অভিষব) বর্ণনা করা হয়েছে। এই হল সোমাভিষব। সোমাভিষব ও সোমাহুতি এবং এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অনুষ্ঠানকে বলা হত সবন। মূল সোমযাগের বর্ণনা আরম্ভ করার পূর্বে এই সবনীয় অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রথমে আছে প্রাতঃসবনের অন্তর্গত সুবৃহৎ ক্রিয়াকাণ্ডের বর্ণনা। তারপর এসেছে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান 'মাধ্যন্দিন সবন' ও 'তৃতীয় সবনের' কথা। পরবর্তী অংশে বর্ণিত হয়েছে অবভৃথ স্নান, উদয়নীয় ইষ্টি, অনূবন্ধ্য পশুযাগ এবং উদবসানীয় ইষ্টিযাগের কথা। ব্যয়সাধ্য এই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বর্ণনার পরিশেষে দক্ষিণার উপকরণ ও ভাগ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে অগ্নিষ্টোমের কয়েকটি বিকৃতি উক্থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র যাগের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এরপর বারোদিন ধরে অনুষ্ঠিত

দ্বাদশাহ সত্রের কথা এবং এক বৎসর ধরে অনুষ্ঠিত গবাময়ন সত্রেরও উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

প্রবন্ধটির শেষদিকে, চন্দ্রের সঙ্গে পার্থিব সোমলতার সম্পর্ক কিরূপে কল্পিত হল, মানববিজ্ঞানের পক্ষ থেকে তা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সোম দেবতা মূলে দ্যুলোকবিহারী চন্দ্র ছিলেন অথবা পার্বত্য লতামাত্র ছিলেন, বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে তা' বড় কথা নয়, সোমযাগের intention-টাই তাঁর কাছে বড়। সোম দেবতা মূলে যিনিই হোন, যাজ্ঞিক ও যজমান তাঁকে কোন্ চোখে কিরূপে দেখতেন, সেটাই বড় কথা। যাজ্ঞিকের নিকট এই সোম অমৃতস্বরূপ। সোমের স্তুতিগানে বেদসাহিত্য পরিপূর্ণ। সেই স্তুতিরই কয়েকটি অংশবিশেষ উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করে অতি সুন্দরভাবে এ প্রবন্ধের উপসংহার করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

পরবর্তী প্রবন্ধ 'খ্রীষ্ট-যজ্ঞ' একটি নতুন ধরনের রচনা। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর খ্রীষ্টানদের Eucharist-ভক্ষণের এবং খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যার একটা নিগূঢ় কারণ আছে। বেদপন্থী ও খ্রীষ্টীয় সমাজের সাদৃশ্য বের করতে ইচ্ছুক বলেই রামেন্দ্রসুন্দর এভাবে আলোচনায় এগিয়েছেন। প্রথমে এসেছে Eucharistic Sacrifice-এর প্রসঙ্গ। এই Sacrifice উপলক্ষে খ্রীষ্টানরা যে রুটি ও মদ উৎসর্গ করে, তা' হল খ্রীষ্টের মাংস ও রক্ত। তা' খেলে খ্রীষ্টকেই খাওয়া হয়। তা'র দ্বারা খ্রীষ্টের সঙ্গে খ্রীষ্টানের একাত্মতা সাধিত হয়। খ্রীষ্টান খ্রীষ্ট হয়। মানুষ পায় দেবত্ব। গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা মনে করেন, এটা তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। অন্য কোনো সমাজে এরূপ কোনো অনুষ্ঠানের কথা শুনতে পেলে তাঁরা তাকে 'শয়তানের কারসাজি' বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এখানে মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা সংগৃহীত নানাদেশের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন, দেবতার সঙ্গে একাত্মতা লাভের এই উপায়টি কেবল খ্রীষ্টানের আবিষ্কার নয়। দেবতাকে আত্মস্থ করার এ ধরনের উপায় বহু দেশের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। রামেন্দ্রসুন্দর প্রশ্ন তুলেছেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের বেদপন্থী সমাজেও ছিল কি না? 'যজ্ঞকথা'র 'খ্রীষ্টযাগ' ও 'পুরুষ-যজ্ঞ' শীর্ষক আলোচনায় আমরা দেখব, খ্রীষ্টান সমাজের অনুরূপ অনুষ্ঠান আমাদের বেদপন্থী সমাজের মধ্যেও ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে যেন রাখি, রামেন্দ্রসুন্দর বৈদিক ও খ্রীষ্টান ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে বৈদিক ধর্মের মাহাত্ম্য বাড়াবার চেষ্টা করেন নি। তিনি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য ভালভাবে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে তিনি বৈদিক ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন মাত্র। বেদপন্থীদের পুরোডাশ ভক্ষণের তাৎপর্য কি এবং খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে এর কোনো মিল আছে কি না, তা' বুঝাতে গিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্যই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; এবং দেখিয়েছেন, অধিকাংশ স্থলেই 'খ্রীষ্টানের ও বেদপন্থীর ভাষায় অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে'। আমাদের শাস্ত্রে যাঁকে জীব বলা হয়, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে তিনিই খ্রীষ্ট। খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক যা, জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কও ঠিক তাই। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন, আমাদের দেশে এই সম্পর্ক

বুঝাতে গিয়ে যেমন অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, খ্রীষ্টান সমাজেও তেমনি সেই সম্পর্কের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে নানারূপ মতবাদ গড়ে উঠেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে প্রতিপন্ন করেছেন, খ্রীষ্টান সমাজ শেষ অবধি যে সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছেন, তা' একেবারে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ না হলেও অদ্বয়বাদের খুবই কাছাকাছি একটা কিছু। তিনি স্পষ্টই দেখিয়েছেন, খ্রীষ্টে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব একাধারে মিশে রয়েছে, 'খ্রীষ্ট একাকী পূর্ণ ঈশ্বর ও পূর্ণ জীব'। এখানেই অদ্বয়বাদের সঙ্গে সাদৃশ্য নজরে পড়ে। এ ছাড়া খ্রীষ্টও নিজমুখে বলেছেন, 'আমি আর আমার পিতা অভিন্ন'। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, এ যেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যেরই প্রতিধ্বনি। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে লেখক সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন, এই যে ঈশ্বর, ইনি অনাদি, নিত্য, কালাতীত। চিরমুক্ত হয়েও ইনি বদ্ধ হয়েছিলেন, ভূমা হয়েও ক্ষুদ্র হয়েছিলেন; নিজেকে দেশ-কালের মধ্যে টেনে এনে জন্মমৃত্যুর অধীন হয়েছিলেন; তিনি নরদেহ ধারণ করে দুঃখতাপের অধীন হয়েছিলেন; কিন্তু সেই নরদেহেও, সেই বদ্ধ অবস্থাতেও তাঁর ঈশ্বরত্বের অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। এই হল খ্রীষ্টানদের মত। আমরাও বলি, জীব চিরমুক্ত, তাঁর বন্ধন একটা অভিনয় মাত্র। আলোচনার পরবর্তী পর্বে রামেন্দ্রসুন্দর ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবদের চতুর্ব্যূহবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টসমাজের Trinity বা ত্রিব্যূহবাদের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। লেখক প্রতিপন্ন করেছেন, খ্রীষ্টানদের জনকেশ্বরের স্থলে বাসুদেবকে ও তনয়েশ্বরের স্থলে সঙ্কর্ষণকে বসালে পাঞ্চরাত্র মতে আর খ্রীষ্টীয় মতে কোনো ভেদ থাকে না। এইভাবে খ্রীষ্টের স্বরূপ বুঝিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বেদপন্থীর ভাষায় খ্রীষ্টানের ভাষার অনুবাদ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ খ্রীষ্ট-সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। যাবতীয় খ্রীষ্টান একবাক্যে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেন, তিনি Word of God; এই উক্তির মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও অনুরূপ উক্তি আছে। খ্রীষ্টানের উক্তি, ঈশ্বর অগ্রে বাক্‌ ছিলেন; এ কথার অর্থ যা, আমাদের চিরপরিচিত সেই শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতার অর্থও ঠিক তাই। অর্থাৎ আমাদের বাগ্‌দেবতাই খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্ট। 'খ্রীষ্টানের মতে খ্রীষ্ট শব্দস্বরূপ, বাক্যস্বরূপ,—বেদপন্থীর ভাষায় তিনি শব্দব্রহ্ম এবং বাগ্‌দেবতা। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, আবার তিনি স্বয়ং জীব। তিনি একাধারে ঈশ্বর এবং জীব'। মুক্ত জীবে এবং ঈশ্বরে কোনো ভেদ নেই। এইভাবে খ্রীষ্টের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশ খ্রীষ্টযাগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন,

> খ্রীষ্ট মানবলীলায় ক্রুশের উপরে মরণাভিনয় করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি মরণাভিনয় দ্বারা মরণজয়ের অভিনয় দেখাইয়াছেন; মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সেই যজ্ঞকে অঙ্গীকার করিয়া সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ তাহাকে ভক্ষণ করিতে হইবে। এই যজ্ঞটা, এই মৃত্যু স্বীকারটা একটা অভিনয়, মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন অভিনয়, উহা অবিদ্যা। বিদ্যা বা সত্যজ্ঞান লাভে মৃত্যু থাকে না। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্ন তে"—অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুর পারে আসিয়া বিদ্যার দ্বারা অমরতা পাওয়া যায়। এ খ্রীষ্ট যে যজ্ঞীয় পশু সাজিয়াছিলেন, সেই পশুর রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা—Communion প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই জন্য প্রত্যেক খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের রক্ত মাংস

খায়—eucharist খায়, খ্রীষ্টের অন্তিম আদেশ অনুসারে উৎসৃষ্ট রুটি ও মদ লইয়া খ্রীষ্ট-সম্পাদিত যজ্ঞের পুনরভিনয় করে—যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণ দ্বারা খ্রীষ্টকে আত্মসাৎ করে, আত্মস্থ করে, খ্রীষ্টের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। বদ্ধ জীব এইরূপে মুক্তির পথে প্রেরিত হয়।

অনুরূপ মুক্তিপথের নিশানা মেলে বেদপন্থীদের যজ্ঞকর্মে। পূর্বেকার কয়েকটি অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ দিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বিভিন্ন প্রকার হবিঃশেষ ভক্ষণের কথা বলেছেন। এই হবিঃশেষ যজমান একা খেলে চলে না; ঋত্বিক ও যজমান একযোগে খেয়ে থাকেন। রামেন্দ্রসুন্দর বুঝাতে চেয়েছেন, এই একযোগে খাওয়াই Communion; এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ছাড়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, 'এই অনুষ্ঠান এক হিসাবে মানব-সাধারণ অনুষ্ঠান'। নানা জাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টীয় সমাজে এই হবিঃশেষ ভক্ষণ অনুষ্ঠান eucharist ভক্ষণ। খ্রীষ্টানের নিকট যার নাম eucharist, বেদপন্থীর নিকট তার নাম ইড়া। সংকীর্ণ অর্থে এই ইড়া-ভক্ষণে যজ্ঞের সমাপ্তি; কিন্তু ব্যাপক অর্থে এই ইড়া-ভক্ষণে মানবজীবনের সম্পূর্ণতা। এখানেই আমাদের religion এবং এতেই আমাদের ethics; এই ইড়া-ভক্ষণের তাৎপর্য বুঝিয়ে বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি কোথায়, গাঁথনি কোথায়, রামেন্দ্রসুন্দর তা' নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন পরবর্তী প্রবন্ধ 'পুরুষ-যজ্ঞে'।

এ কারণেই 'পুরুষ-যজ্ঞ' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে রামেন্দ্রসুন্দরের 'যজ্ঞ-কথা'র উপসংহার বলা চলে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে তিনি 'খ্রীষ্ট-যজ্ঞের' কথা বলেছেন। বলেছেন, খ্রীষ্ট-যজ্ঞে হবিঃশেষের নাম ইউকেরিষ্ট। মন্ত্রোচ্চারণের পর রুটিতে ও মদে দেবতার আবির্ভাব হয়; ঐ রুটি ও মদ খেলেই দেবতাকে খাওয়া হয়। দেবতাকে আত্মস্থ করলে দেবতার সঙ্গে ঐক্য ঘটে। এই যে দেবতা, ইনি স্বয়ং ঈশ্বর; ঈশ্বরের অগ্রে জাত পুত্র হলেও 'অনাদি নিত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বর'। তিনি শব্দব্রহ্ম বা বাগ্‌দেবতারূপে 'অনাদি, নিত্য ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর। তিনি আবার পরিপূর্ণ জীব—যিনি ঈশ্বর, তিনিই জীব।' তিনিই যজমানরূপে যজ্ঞ করেছেন; এবং সেই যজ্ঞে আপনাকেই পশুরূপে—মেষরূপে কল্পনা করে জীবহিতার্থ আত্মসমর্পণ করেছেন। ইউকেরিষ্ট সেই পশুর রক্ত ও মাংস—তা' খেলে ইতর যজমান দেবতার সঙ্গে একত্ব পায়, মৃত্যু জয় করে অমর হয়। 'কেন না, খ্রীষ্টের রক্ত ও মাংস অমৃতস্বরূপ।' এই অবধি গেল খ্রীষ্ট যাগের প্রসঙ্গ। আলোচ্য প্রবন্ধে বেদপন্থীর যজ্ঞ নিয়ে আলোচনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বেদপন্থীর যজ্ঞে পশুমাংস দেওয়া হত—ইষ্টিযাগে মাংসের বদলে পুরোডাশ বা রুটি দেওয়া হত। সোমযজ্ঞে সোমরস দেওয়া হত; কোথাও বা সোমরসের বদলে সুরা বা অন্য কিছু দেওয়া হত। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে প্রশ্ন তুলেছেন, ঐ সকল দ্রব্যে কোনো দেবতার অধিষ্ঠান হয় কি না? যদি হয় তো, সে কোন্ দেবতা? সে দেবতার সঙ্গে যজমানের সম্পর্কই বা কি?

এ প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই তিনি সোমরস নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। খ্রীষ্টপন্থীর সুরাপানের সঙ্গে বেদপন্থীর সোমপানের, আর তন্ত্রপন্থীর সুরাপানের

সম্পর্ক বুঝিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ বাগ্‌দেবীর সঙ্গে সোমের সম্পর্কও আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অমৃতস্বরূপ সোমকে পূর্বে কেউ জানত না ; স্বয়ং বাগ্‌দেবতা তাঁকে দেবগণের জন্যে এনেছিলেন। তারপর মানুষরাও তাঁকে পেয়েছে। খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টও স্বয়ং বাগ্‌দেবতা। তিনিও স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে অমৃত এনেছিলেন। এ কারণেই খ্রীষ্টপন্থী যজমান যেমন সুরা পান করে অমরতা লাভ করেন, বেদপন্থী যজমানও সেরূপ সোম পান করে অমরতা পান। এইভাবে সোমের কথা বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এরপর এসেছে পুরোডাশের কথা। পুরোডাশ আহুতির পর যা' অবশিষ্ট থাকে, তা' খেতে হয়। কয়েক খণ্ডে ভাগ করে খেতে হয়। পুরোডাশের একটা খণ্ড যজমান ও ঋত্বিকেরা একযোগে খেয়ে থাকেন। এই ভাগের নাম ইড়া। এই ইড়া ভক্ষণই যজ্ঞের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান। ইড়া-ভক্ষণেই যজ্ঞ সমাপ্তি লাভ করে ও সার্থক হয়। এই ইড়া-ভক্ষণের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের ইউকারিষ্ট ভক্ষণের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। খ্রীষ্টানের ইউকারিষ্ট ভক্ষণের নানাবিধ খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি হল breaking of the bread ; খ্রীষ্ট শিষ্যদের সঙ্গে ভোজনকালে রুটি ভেঙ্গেছিলেন ও সেই ভাঙ্গা রুটির টুকরা শিষ্যদিগের মধ্যে বেঁটে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টানদের মতে, এই অনুষ্ঠানের অর্থ হল, জীবহিতের জন্যে খ্রীষ্ট আপনাকে ভেঙ্গে খণ্ডিত করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণেই খ্রীষ্টান যাজক বেদির উপরে রুটিকে ভেঙ্গে ফেলেন ও সেই ভাঙ্গা রুটির টুকরা যজমানদের দেন। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, বেদপন্থীর যজ্ঞেও অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। প্রধান দেবতার উদ্দেশ্যে পুরোডাশ আহুতি দিয়ে যা' অবশিষ্ট থাকে, তা' খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করতে হয়। এই অনুষ্ঠানটি খ্রীষ্টানদের breaking of the bread-এর সঙ্গে তুলনীয়। এরপর এসেছে খ্রীষ্টানদের ইউকেরিষ্ট ভক্ষণের আর একটি অনুষ্ঠান Consecration ও Invocation-এর কথা। খ্রীষ্টানরা ভক্ষণের পূর্বে মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করে রুটি উৎসর্গ করে থাকে। বেদপন্থীর যজ্ঞেও অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে। আগেই বলা হয়েছে, বৈদিক যজ্ঞে যজমান ও ঋত্বিক, সকলের একযোগে ভক্ষণের জন্য পুরোডাশের একটা ভাগ থাকে। এই ভাগের নাম হল ইড়া। যজমান ও ঋত্বিকেরা ইড়াপাত্র স্পর্শ করে থাকেন। হোতা কতকগুলো মন্ত্র পাঠ করেন। এই মন্ত্রের মাধ্যমে ইড়া-দেবতাকে নিকটে আহ্বান করা হয়। মন্ত্র পাঠের নাম ইড়ার উপাহ্বান। এই আহ্বানের পর ইড়াদেবীর পুরোডাশ-খণ্ডে আবির্ভাব হয়। তারপর আর কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর সকলে মিলে ইড়া ভক্ষণ করেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইড়া-দেবতাকেই ভক্ষণ করা হয়। এইভাবে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, খ্রীষ্টানদের Consecration ও Invocation-এর অনুরূপ অনুষ্ঠান বেদপন্থীদের মধ্যেও আছে। এরপর তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এই ইড়া-দেবতাটি কে ? জবাব দিয়েছেন, ইড়াদেবী স্বয়ং বাগ্‌দেবতা। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন খ্রীষ্টরূপী পশুর মাংস, এই ইড়াও সেরূপ যজমান-রূপ পশুর মাংস। ইড়াদেবী যেমন বাগ্‌দেবতা, ইউকেরিষ্টের খ্রীষ্টও ঠিক তাই। 'ইউকেরিষ্টের খ্রীষ্টও স্বয়ং যজমান, স্বয়ং পশু, স্বয়ং দেবতা—বাগ্‌দেবতা—Word of God.'

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বৈদিক সাহিত্য থেকে মন্ত্র উদ্ধার করে ইড়াদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে ইড়াদেবীর বিভিন্ন নাম অদিতি, সরস্বতী, মনুষতী ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন। শেষ অবধি 'বাক্' শব্দের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন ইড়াদেবীর

নামের চরম তাৎপর্য। এই বাক্ বা বেদবাক্যই ব্রহ্ম। বেদপন্থীরা বলেন, ঈশ্বর এই বেদবাক্য দ্বারাই অখিল জগৎ নির্মাণ করেছেন। খ্রীষ্টানরাও বলেন, পিতা ঈশ্বর শব্দরূপী পুত্র খ্রীষ্টের দ্বারা সমস্ত লোক সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, খ্রীষ্টান ও বেদপন্থী উভয়ে একই কথা বলেন। উভয়েরই প্রত্যয়, শব্দ থেকেই সমস্ত জগৎ নির্মিত হয়েছে। জীবরূপে অবতীর্ণ শব্দরূপী খ্রীষ্ট বলেছিলেন, আমি ও আমার পিতা এক। এর বহু শত বৎসর পূর্বে অম্ভৃণ-কন্যারূপে অবতীর্ণা বাগ্‌দেবীও স্পষ্ট বাক্যে বলেছিলেন,—আমিই বিশ্বভুবনের নির্মাণকর্ত্রী—অহং ব্রহ্মাস্মি। এইভাবে খ্রীষ্টান ও বেদপন্থীর ধর্মানুষ্ঠানের সাদৃশ্য নিরূপণ করে রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিপন্ন করেছেন, ইড়াদেবী হলেন বেদপন্থীর সনাতনী বাগ্‌দেবী। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বাগ্‌দেবীর মাহাত্ম্যকে বেদপন্থী ভারতীয় সমাজ যুগ যুগ ধরে স্বীকার করেছে। তন্ত্রশাস্ত্র বেদপন্থীর বাগ্‌দেবীকে শ্রেষ্ঠ দেবতা-রূপে গ্রহণ করেছেন। তন্ত্রে তাঁর নাম মাতৃকা সরস্বতী। কিন্তু খ্রীষ্টানরা শব্দব্রহ্মতত্ত্বকে বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি। ইড়া-ভক্ষণের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে এইভাবে ধর্মতত্ত্বের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। যা'ই হোক, এই প্রসঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্য হল, ইড়াভক্ষণে বাগ্‌দেবতাকে আত্মস্থ করা হয়, বাগ্‌দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন করা হয়, অমৃতভোজন ঘটে। 'সোমপানে যে ফল, ইড়া ভক্ষণেও সেই ফল।'

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে ব্যাপক অর্থে যজ্ঞের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, 'এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ ব্যাপারই একটা যজ্ঞ'। স্বয়ং বিরাট পুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞ করেছেন। যাজ্ঞিকেরা বলেন, 'কোন দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ'। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে বিরাট পুরুষ আপনাকেই ত্যাগ করেছিলেন, যজ্ঞদেবতার উদ্দেশ্যে আপনাকে আহুতি দিয়েছিলেন। প্রজাপতি নিজেই যজ্ঞপুরুষ, নিজেই যজ্ঞদেবতা। বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর কোনো ইষ্টলাভ থাকতে পারে না। তিনি সৃষ্টির জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন ; ত্যাগের জন্যই ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এ হল লীলাকৈবল্য। একেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, জগৎজোড়া সৃষ্টিযজ্ঞ। এই সৃষ্টিযজ্ঞ চলেছে অনাদি-অনন্তকাল ধরে। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর এর অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন,

> বস্তুতই এই সৃষ্টিযজ্ঞ কখনও সমাপ্ত হইবার নহে। কাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। সমস্ত জাগতিক ব্যাপার এই যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। দেবগণ, পিতৃগণ এবং নরগণ এই যজ্ঞ ব্যাপারেই লিপ্ত রহিয়াছেন ; এই সৃষ্টিযজ্ঞে সাহায্য করিবার জন্যই তাঁহারা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অস্তিত্বের আর কোন সার্থকতাই নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা বিরাট পুরুষ স্বয়ং এই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন। সেই মুক্ত পুরুষই স্বেচ্ছায় আপনাকে যূপে বদ্ধ করিয়া আপনাকে যজ্ঞীয় পশুতে পরিণত করিয়াছেন ; তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্বজগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন। সমস্ত বিশ্বজগৎটাই সেই যজ্ঞীয় পশুর দেহ ; যাবতীয় জীবের হিতার্থ ইহা যজ্ঞে নিযুক্ত রহিয়াছে। যাবতীয় জীবের পক্ষে ইহা ভোগ্যরূপে—অন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যাবতীয় জীব হবিঃশেষরূপে ইহাকে আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিয়া সেই বিরাট পুরুষের শরীরে আপনার শরীর মিশাইতেছে। বিরাট্

পুরুষ কেবলই আপনাকে ত্যাগ করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছেন, কেবলই আপনাকে নিহত করিতেছেন ; অথচ তিনি নষ্ট—নিহত হইতেছেন না। তাঁহার এই যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাহা এক দিনের অনুষ্ঠান নহে, মহাকাল ব্যাপিয়া ইহা চলিতেছে। এই যজ্ঞের প্রয়াণও নাই, উদয়নও নাই, আরম্ভও নাই, সমাপ্তিও নাই ; কেন না, এই যজ্ঞই ত বিশ্বব্যাপার।

রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, সৃষ্টিকর্তা নিজের দেহ দিয়ে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টি ব্যাপারটাই পুরুষ-যজ্ঞ। বেদপন্থী যজ্ঞকে কিরূপ ব্যাপক অর্থে দেখতেন, এইভাবে রামেন্দ্রসুন্দর তা' ব্যাখ্যা করেছেন। আলোচনার পরবর্ত্তী অংশে পুরুষ-যজ্ঞের সঙ্গে খ্রীষ্ট-যজ্ঞের সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ; এবং খ্রীষ্ট-যজ্ঞের তুলনায় বেদপন্থীর পুরুষ-যজ্ঞের তাৎপর্য যে আরও ব্যাপক, তা' প্রতিপন্ন করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, খ্রীষ্টানের মতে ঈশ্বর স্বয়ং জীবহিতের জন্য যজ্ঞের পশুরূপে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন —সেই যজ্ঞের হবিঃশেষ ভক্ষণে ইতর জীব ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব লাভ করে। আচার্য ত্রিবেদীর মতে, 'সাধারণ খ্রীষ্টানের কাছে এই একত্ব সালোক্য বা সামীপ্য মাত্র', এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু বেদপন্থীর মতে, পুরুষ-যজ্ঞের তাৎপর্য আরও ব্যাপক। ঈশ্বর আত্মাহুতি দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ; এই সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি নিজেই যজ্ঞের পশু হয়েছিলেন। অর্থাৎ, যিনি মুক্ত, তিনি বদ্ধ হয়েছেন ; যিনি অমৃত, তিনি মৃত্যু স্বীকার করেছেন। ইতর জীব জানে না যে, সে নিজে সেই ঈশ্বর থেকে অভিন্ন। সে নিজেই ঈশ্বর—তা'র বাইরে আর কোনো ঈশ্বর নেই। অতএব সে চিরমুক্ত। অথচ তাকে বদ্ধ সেজে সংসারযাত্রা চালাতে হচ্ছে, অমৃত হয়েও মৃত্যু স্বীকার করতে হচ্ছে ; সেও জীবন ধরে পশুর মত যূপবদ্ধ থেকে 'পুরুষযাগে আত্মাহুতির জন্য নিযুক্ত আছে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাটাই যজ্ঞানুষ্ঠান'।

এই যজ্ঞানুষ্ঠান, পুরুষ-যজ্ঞের এই তাৎপর্য ঋক্‌মন্ত্রের প্রচারকালেই কতটা ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছিল, বেদের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে অজস্র প্রমাণ সংগ্রহ করে রামেন্দ্রসুন্দর তা' বুঝিয়েছেন। এবং এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত হল 'জীবনের কর্ম মাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ'। ত্যাগের পর যা' অবশিষ্ট থাকবে, তা'রই ভোগ কর্তব্য—সেই অবশিষ্টাংশই হল হবিঃশেষ-ভোজন, অতএব অমৃতভোজন। জীবনের প্রত্যেক কর্মকেই এই যজ্ঞরূপে দেখতে চেয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। জীবনকে একটা সমুন্নত পটভূমির উপর উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, অতি প্রাচীন কালে বেদপন্থী সমাজে কর্মকাণ্ড যখন জটিল ও যন্ত্রবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, সে সময় থেকেই জীবনকে এভাবে এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার প্রয়াস, নীচের পরদা থেকে উঠিয়ে জীবনকে উঁচু পরদায় উপস্থাপনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এখনও যে আমরা জীবনযজ্ঞের সেই তত্ত্বটি ধরে আছি, পঞ্চ মহাযজ্ঞের দৃষ্টান্ত দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর তা' বুঝিয়েছেন। দেবতা, পিতা, ঋষি, বন্ধু-প্রতিবেশী এবং পশু-পক্ষী—এদের সকলের কাছেই আমরা ঋণী। এই পাঁচ প্রকার সহযোগীর কাছে পাঁচটি ঋণের বোঝা নিয়েই মানুষকে জন্মাতে হয়। ঋণের বোঝা ফেলে রেখে জীবনযাত্রাটা দুষ্কর্ম। সমগ্র জীবন ধরে এঁদের কাছে ঋণশোধের চেষ্টা করতে হবে। 'এক একটা

ঋণশোধের চেষ্টার অভ্যাস এক একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু-না-কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। দেবতার উদ্দেশে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিধ্ ফেলে দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ততঃ এক গণ্ডূষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ করা হয়। পশু-পক্ষীর উদ্দেশে সামান্য অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ-অতিথিকে অন্ন দিলে হয় মনুষ্যযজ্ঞ, আর বেদাধ্যয়নে হয় ঋষিযজ্ঞ। বেদপন্থী সমাজের বহু গৃহস্থ এখনও এই পাঁচটি যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন। রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, 'গৃহস্থ মাত্রেরই এই যজ্ঞ কয়টি কর্ত্তব্য কর্ম্ম'। কেননা জগতে কেউ একাকী আসেন নি, একা যাবেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গেই প্রতিটি জীবের সম্পর্ক বাঁধা আছে। এ কারণেই জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকট ঋণ স্বীকারে প্রতিটি জীব বাধ্য। প্রত্যহ কোনো না কোনো অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করে, জীব যে ঋণী, এ কথা মনে রাখতে হবে। এই ঋণ-স্বীকার না করলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। এ কারণেই প্রত্যেককে প্রতিদিন কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার অভ্যাস করতে হবে। মনে যেন রাখি, 'ব্যাপক অর্থে এই ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এ স্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা। জগতে যা' কিছু আছে, সবই দেবতা। মানুষ প্রত্যেকের নিকট ঋণী'। এ ছাড়া এই যে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের কথা এখানে বলা হল, শাস্ত্রে এদের বলা হয়েছে পঞ্চ মহাযজ্ঞ। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই যজ্ঞের সম্পাদনে জীবনের ক্ষুদ্র কর্মও বৃহৎ হয়ে ওঠে; মানুষের ক্ষুদ্র জীবন বিশ্বের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে মিলনের অবকাশ পায়। এইভাবে এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন বলেই ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষ যে অন্ন ভোজন করে, তা'কে কেবলমাত্র একটা biological need বলে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতে, এই অন্ন-ভোজন হল অগ্নিহোত্রের আহুতি। এর নাম প্রাণাগ্নিহোত্র। এইভাবে পাশবিক কর্মকে মানবিকতার গৌরবে মণ্ডিত করতে চেয়েছেন তিনি। অন্ন-ভোজনের ব্যাপারটাকে নিতান্ত উদর পূরণের ব্যাপার বলে মনে না করে, 'প্রজাপতির উদ্দিষ্ট যজ্ঞে বৈশ্বানর অগ্নিতে 'অর্পিত হবিঃশেষ-ভক্ষণ'রূপে মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিশ্বহিতার্থ নিযুক্ত আপনার দেহটাকে পুরুষযজ্ঞ সম্পাদনে সমর্থ' রাখবার উপায়রূপে মনে করলে, কর্ম পাশবিকতার স্তর থেকে মানবিকতার স্তরে উঠে পড়ে।

কিন্তু এ হল একটা উদাহরণ। আসল কথা হল এই যে, বেদপন্থী জীবনযজ্ঞের তত্ত্বটাকে খুব বড় করে দেখেছেন। তাই বেদপন্থী রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠেও সেই মহত্তর জীবনাদর্শেরই প্রতিধ্বনি :—

> আমার এই যে জীবন, ইহা বৈশ্বানর অগ্নির চয়ন ব্যাপার মাত্র। সারা জীবন ধরিয়া ইটের পাশে ইট গাঁথিয়া, ইটের উপর ইট বসাইয়া আমি পুরুষ-যজ্ঞের চিতি নির্ম্মাণ করিতেছি, তাহার কেন্দ্রস্থলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে কেবলই আত্মাহুতি দিতেছি। এ কেবল ত্যাগের ব্যাপার; ভোগের এখানে কোন অবসর নাই। এই ত পুরুষ-যজ্ঞ, এ ত বিশ্বযজ্ঞের অনুকরণ; কেন না, বিশ্বযজ্ঞে বিশ্বকর্ম্মা আপনাকে ত্যাগই করিয়াছেন। এখানে আমিই যজমান, আমিই ঋত্বিক্ এবং আমিই দেবতা এবং আমার সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ বা আত্মাহুতি।…

…জীবনযজ্ঞ পুরুষ-যজ্ঞেরই প্রকারভেদ, এবং ইহা ভোগের ব্যাপার নহে, ত্যাগের ব্যাপার। প্রত্যেক কর্ম্মকে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর প্রতি অর্পণ করিতে হইবে; বেদপন্থীর প্রতি তাঁহার শাস্ত্রের এই চূড়ান্ত আদেশ।…

…কিন্তু এই মুক্তিলাভের পূর্ব্বে বন্ধন আবশ্যক—বিশ্বজগতের যাবতীয় দ্রব্যের সহিত মিলনের সম্বন্ধ পাতাইয়া সহস্র বন্ধনে আপনাকে জড়াইতে হইবে—যমনিয়মের সহস্র বন্ধনে ভিতরের নৈসর্গিক পশুটাকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে—সংসারের যূপস্তম্ভে সেই পশুটাকে বদ্ধ করিয়া তাহাকে পুরুষ-যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে।

এইভাবে বেদপন্থীর পুরুষ-যজ্ঞের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর; এবং সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন, মানবজীবনের থিয়োরি সম্পর্কে বেদপন্থীর সঙ্গে খ্রীষ্টপন্থীর গোড়ায় আশ্চর্য মিল আছে বটে, কিন্তু ইউরোপের খ্রীষ্টানেরা মানুষের জীবনকে দু'টো কুঠরিতে ভাগ করে ফেলেছেন; একটা secular, temporal, আর একটা religious, spiritual—এবং এই দুই কুঠরির মধ্যে একটা দেওয়াল গেঁথে রেখেছেন। 'সাবেক রোমানের জীবন ছিল এক কুঠরিতে নিবদ্ধ; খ্রীষ্টানের জীবন ছিল অন্য কুঠরিতে'। খ্রীষ্টীয় সমাজ আত্মরক্ষার জন্যে রোমান রাষ্ট্রতন্ত্রের আশ্রয় নিতে গিয়ে এই বিরোধের সৃষ্টি করে ফেলেছেন এবং আজ 'ভোগমত্ত রতিকামের উপর' দাঁড়িয়ে তার ফলভোগ করছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষে বেদপন্থীর জীবনে এরূপ দু'টো কুঠরি থাকতে পারে না। 'বেদপন্থীর থিয়োরিতে সমস্ত জীবন একটা ব্যাপার, একটা যজ্ঞ'। শতসহস্র বৎসর ধরে বেদপন্থীর এই যজ্ঞীয় আদর্শ দেশ-বিদেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়,

আপনারা পুরাণে ঋষিগণের বহুবর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী শুনিয়াছেন। ভারতবর্ষের বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসকে আমি একটা বহুসহস্র বর্ষব্যাপী সত্রানুষ্ঠানের কাহিনী বলিয়া জানি। এই ধারণা আমার জীবনযাত্রায় ধ্রুবতারা। ভারতবর্ষের যজ্ঞভূমি জুড়িয়া একটা প্রকাণ্ড চিতি নির্ম্মিত রহিয়াছে; বেদপন্থী সমাজের যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সেখানে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—সেই অগ্নির প্রভায় অর্দ্ধ পৃথিবী প্রভান্বিত হইয়াছে। সিংহল হইতে সাইবীরিয়া পর্য্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট পর্য্যন্ত অর্দ্ধ পৃথিবী সেই অগ্নির প্রভায় প্রভান্বিত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন;—মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পৃথিবীতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন।

এইভাবে মাতৃভূমির জয়গান করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বেদপন্থীর সত্যদৃষ্টি দিয়ে সনাতন ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনার ইতিবৃত্ত অঙ্কন করেছেন।

৬

'যজ্ঞকথা'র রচনাগুলো লেখা হয়েছিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকা হিসেবে। রামেন্দ্রসুন্দর যখন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন বৈদিক যাগযজ্ঞগুলির তাৎপর্য বিশেষভাবে বুঝাবার জন্যে সেই অনুবাদ-গ্রন্থের একটি বিস্তৃত ভূমিকা লিখে মূল গ্রন্থকে

স্পষ্ট করবার বাসনা করেছিলেন। ভূমিকা লেখার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সেই কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি তিনি। যতদূর লেখা হয়েছিল, তারই একটা অংশ সিনেট হলে পাঠ করা হয় এবং 'যজ্ঞকথা' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। ভূমিকার অবশিষ্টাংশ আবিষ্কারের ও তা' প্রকাশের কৃতিত্ব জগদীশ বাজপেয়ীর। রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থাগারে তাঁর স্বহস্তলিখিত কতকগুলো বৈদিক প্রবন্ধের সন্ধান পান তিনি। ঐ প্রবন্ধগুলিকেই তিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকার অবশিষ্টাংশ বলে অনুমান করেছেন। তারপর তাঁরই উদ্যোগে ঐসব প্রবন্ধ 'বেদকথা' নাম দিয়ে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে এই 'বেদকথা' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। যজ্ঞকথার সঙ্গে এই গ্রন্থের বহু জায়গাতেই মিল আছে। তবে যজ্ঞকথায় প্রাধান্য পেয়েছে যজ্ঞের তাত্ত্বিক অংশ ; আর এখানে বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া-কর্ম অংশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অতএব অনেক নূতন কথার সন্ধান মিলবে এখানে। যজ্ঞকথা ও বেদকথার প্রবন্ধগুলোকে পড়ে নিয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ পড়লে অনুবাদ বুঝার সুবিধা হবে।

বেদকথার প্রারম্ভে বেদের বিভাগ বুঝাতে গিয়ে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভেদে বেদবাক্য যে দ্বিবিধ সে কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ উদাহরণ সহযোগে সুন্দর-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর মন্ত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণের সম্পর্ক বুঝান হয়েছে সুনির্বাচিত দৃষ্টান্ত সহযোগে। বেদের অন্তর্গত তিন প্রকার মন্ত্র—ঋক্, যজুঃ ও সাম নিয়ে আলোচনাও সুন্দর ও সহজবোধ্য। এর পরবর্তী অংশের আলোচ্য বিষয় হল বিভিন্ন প্রকার বৈদিক সংহিতা এবং বেদের শ্রেণীবিভাগ। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, বেদ কয়খানি, এরূপ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। বেদ কয় প্রকার, এ প্রশ্ন বরং করা যেতে পারে। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, বেদ দ্বিবিধ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের ব্যাখ্যা করবার জন্যে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। অতএব, তাঁর মতে, ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয়েছে মন্ত্রের পরে। রামেন্দ্রসুন্দরের এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র-সম্মত। বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র নিয়ে আলোচনায়ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয়তা আমাদের নজরে পড়ে। তিনি বলেছেন, ঋক্ গান করলেই সাম হয়, অতএব সাম ঋকের সমকালীনও হতে পারে, আবার পরবর্তীও হতে পারে। যজুঃ ঋকের পূর্বে, কি পরে, তা' বলা কঠিন। তবে এখনও অবধি বর্তমান বিভিন্ন যজুর্মন্ত্র সম্বন্ধে রামেন্দ্র-সুন্দরের অনুমান হল, এদের কতক,—হয়তো বা অধিকাংশ, ঋকের অপেক্ষাও পুরনো, কতক হয়তো সমকালীন, আর কিছু হয়তো বা আধুনিক। তবে পূর্বে যে আরও অনেক ঋক্‌মন্ত্র ছিল, ছিল আরও অনেক যজুর্মন্ত্র এবং তাদের অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হয়েছে, সে সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর নিঃসংশয়। যে সব মন্ত্র এখনও অবধি বর্তমান আছে, সেগুলোর পৌর্বাপর্য বিচার কিভাবে চলতে পারে, তা' নিয়েও তিনি এখানে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। আচার্য ত্রিবেদীর মতে, মন্ত্রের ভাষা বিচার করে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ইতিহাস দেখে, মন্ত্র যে অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেই অনুষ্ঠানের প্রাচীনতা দেখে, ঋক্ ও যজুর পৌর্বাপর্য স্থির হতে পারে। এছাড়া বেদ-কথায় আর একটি নূতন প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। প্রশ্ন তুলেছেন ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদসংহিতার অর্থ নিয়ে। তাঁর মতে

ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদসংহিতা—এই দু'টি নাম সমানার্থক নয়। বেদের দুই অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, একথা বুঝিয়ে তিনি বলেছেন, 'ঋক্‌মন্ত্র ও ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যানপর ব্রাহ্মণ'—এই নিয়েই হল ঋগ্বেদ। আর ঋক্‌মন্ত্রগুলির ব্রাহ্মণ বর্জন করে কেবল ঋক্‌মন্ত্রগুলির অধিকাংশ একত্র সংকলিত করে যে গান প্রস্তুত হয়েছিল, তার নাম ঋগ্বেদসংহিতা। যজুর্বেদসংহিতার আলোচনায়ও নূতন কথা বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। অনেকে মনে করেন, ঋক্‌মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত করে যেমন ঋগ্বেদসংহিতা, তেমনি যজুর্মন্ত্রগুলির সংকলনে যজুর্বেদসংহিতা উৎপন্ন হয়েছে। এই যুক্তিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি রামেন্দ্রসুন্দর। তিনি দেখিয়েছেন, যজুর্বেদসংহিতায় অধিকাংশ যজুর্মন্ত্র নিবিষ্ট হলেও সেখানে অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্রও স্থান পেয়েছে। ঐ সকল ঋকের অনেকগুলি ঋগ্বেদসংহিতায় আছে, কতকগুলি মন্ত্র আবার নূতন—ঋগ্বেদসংহিতায় নেই। এ ছাড়া দু' শ্রেণীর যজুর্বেদসংহিতা, কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ নিয়েও এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বেদ-কথার অবশিষ্ট অংশে বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

এইভাবে বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্টতা প্রদর্শন করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর; বৈদিক ভারতবর্ষের মহিমময় ধ্যান-ধারণার সত্য চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। এ ছাড়া স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়েও অনেক চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ঐ সকল প্রবন্ধ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি

রামেন্দ্রপ্রতিভা বহুমুখী। কখনো বিজ্ঞানচিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত তিনি। কখনো বা বেদপন্থীর ক্রিয়া-কর্ম নিয়ে আলোচনায় নিরত। আবার কখনো তিনি স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি-চিন্তায় নিমগ্ন। সুতীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালী, সুগভীর ঐতিহাসিক জ্ঞান, ঐকান্তিক স্বজাতিপ্রীতি ও একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমে রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাগুলো সমুজ্জ্বল। এই পর্যায়ের রচনাকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। কোথাও (১) বৃহত্তর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমাজের মূলগত পার্থক্য নির্ণয় করে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। আবার কোথাও (২) সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপোষক কোনো কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে গভীর ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো রচনায় (৩) স্বদেশ ও স্বজাতির খুঁটিনাটি ইতিহাস রচনার প্রবণতা দেখা যায়। স্বদেশের ইতিহাস রচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে কোথাও। আবার কোথাও (৪) দেশীয় কোনো কোনো দেবদেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। (৫) দেদীপ্যমান স্বদেশপ্রেম বহু রচনার মূল সুর। এই শ্রেণীর কোনো কোনো রচনায় সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি প্রতিকারের পথ-নির্দেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এ ছাড়া (৬) সমাজ-বিজ্ঞান ব্যাখ্যায় জীববিদ্যার প্রয়োগ সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বহু রচনাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক রামেন্দ্রসুন্দরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো 'নানা-কথা'য় (১৯২৪) সংকলিত হয়েছে। তবে 'পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা' (১৩০[illegible]), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৩১২) ও 'বিচিত্র প্রসঙ্গ—২য় পর্যায়'ও (১৩৩৪) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত তাঁর বহু প্রবন্ধে, সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে এবং অপরের রচিত গ্রন্থের ভূমিকায় স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব জানা যায়। তবে সাহিত্যিক মূল্য ও বক্তব্যের গভীরতার দিক থেকে 'নানা কথা'র প্রবন্ধগুলোই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কারণেই এখানে 'নানা কথা'র রচনাগুলোর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১

'নানা কথা'র প্রথম রচনা 'আনি বেসান্ট' (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০১) একটি নতুন ধরনের প্রবন্ধ। আনি বেসান্ট এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য তাঁর জীবন ও কর্মসাধনাকে কেন্দ্র করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনের মূলগত পার্থক্য নির্ণয়। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, ইউরোপের উপরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাকচিক্য ও ঐশ্বর্য-আড়ম্বর রয়েছে

বটে, কিন্তু ভিতরে রয়েছে ভয়াবহ দারিদ্র্যের হিংস্রকুটিল রূপ। এই হল ইউরোপের জীবনমরণ সমস্যা। এ নিয়ে ওখানকার রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি—সব কিছুই বিব্রত। তাই সমস্যার সমাধান ওখানে মিলছে না। আনি বেসান্টের জীবনের অনেকটা অংশ কেটেছে এই সমস্যা-পূরণের জন্যে। লণ্ডনে দারিদ্র্যের সঙ্গে বহুদিন তিনি সংগ্রাম করেছেন। অবশেষে নিরাশ হয়ে তাকিয়েছেন 'শান্তরসাস্পদ পুরাতন' ভারতবর্ষের দিকে। বলেছেন, এমন স্থির ও সহিষ্ণু দেশ আর হয় না। ভারতবর্ষের প্রতি আনি বেসান্টের এই সশ্রদ্ধ মনোভাবকে উপলক্ষ্য করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের চরিত্রগত পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য, ইউরোপ কর্মপ্রবণ আর ভারতবর্ষ বৈরাগ্যপ্রবণ। কর্ম থেকে ইউরোপ লাভ করেছে ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও গৌরব। আর বৈরাগ্য থেকে ভারতবর্ষ তৃপ্তি, শান্তি ও অনাসক্তি লাভ ক'রে ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও গৌরব বিসর্জন দিতে বসেছে। তাই হিন্দুজাতির তৃপ্তি ও শান্তি স্থিতিশীলতায় হিমাচলের মত। আর ইউরোপের জ্ঞান, গৌরব ও পরাক্রম উল্কার মতো ক্ষণকালের কিরণশোভা প্রদর্শন করে নির্বাণ হতে পারে। অনুপম দেশপ্রেম এবং জায়গায় জায়গায় সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরস এই রচনাটির বৈশিষ্ট্য। তবে মূলতঃ এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জীবনের আদর্শগত পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'নানাকথা'র 'পরাধীনতা' (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০৪) ও 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩০৮) শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টিতে এই পার্থক্যের বিচার করা হয়েছে বৃহত্তর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

'পরাধীনতা'য় লেখকের প্রগাঢ় ঐতিহাসিক জ্ঞান এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সমাজ সম্বন্ধে সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গীর অভি-নবত্বই প্রবন্ধটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশেষ একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্যটি তুলে ধরেছেন ; এবং ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে নতুন কিছু কথা বলেছেন ; বিচাররীতিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বক্তব্যের এই নূতনত্ব এবং চিন্তাধারার এই মৌলিকতার জন্যই প্রবন্ধটি বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন। হিন্দু জাতির পরাধীনতা কেন ঘটল, এ প্রশ্নের নানারকম জবাব ঐতিহাসিকেরা দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, এজন্য দায়ী হিন্দু রাজারা। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এই যুক্তিকে মেনে নেন নি। তাঁর মতে, দু'একজন মাত্র লোকের দোষে এতবড় একটা ঐতিহাসিক বিপ্লব হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত কারণ জানতে হলে আরও মূলে অনুসন্ধান করতে হবে। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য নির্ণয় করতে হলে জাতীয় প্রকৃতির আলোচনা প্রয়োজন। রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধের ভূমিকাতেই বলেছেন, অতীতে আভ্যন্তরীণ কোনো মূল কারণে নিশ্চয়ই ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয় চরিত্র অধঃপতিত হয়েছিল। বিদেশীর আক্রমণ প্রতিহত করবার শক্তি তখনকার হিন্দু জাতির ছিল না। সে কারণেই এসেছিল পরাধীনতা ; মুসলমানরা সহজেই ভারতবাসীকে পদানত করতে পেরেছিল। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে তখনকার যুগের জাতীয় অবনতির কারণ নির্দেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ; এবং তা' করতে গিয়ে সাধারণ ঐতিহাসিকদের মত ব্রাহ্মণদের দায়ী করেন নি। দায়ী করেছেন ভারতীয়দের মানস-

প্রকৃতিকে। বলেছেন, আধুনিক ভাষায় যাকে রাজনৈতিক জীবন বলে, অর্থাৎ, স্বদেশ-ভক্তি, জাতীয় ভাব প্রভৃতি যার লক্ষণ ভারতবাসীর সে জীবনটা একেবারে নেই। কোনো কালে যে ছিল, তারও প্রমাণ নেই। রাজা অত্যাচার করলে তার প্রতিবাদ করি নি আমরা। রাজার বিপদ উপস্থিত হলে তাকে সাহায্য-দান অনাবশ্যক বোধ করেছি। কারণ, ভারতবর্ষের রাজা থাকেন প্রজা থেকে অনেক দূরে। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, অন্য দেশের ইতিহাস এমন নয়। সেখানে রাজা-প্রজায় সম্বন্ধ অন্যরকম। রাজায়-প্রজায় সখ্য নেই সেখানে। কথায় কথায় প্রজা রাজার কৈফিয়ৎ চেয়ে থাকে। কিন্তু যখন বিদেশীরা রাজ্য আক্রমণ করে, তখন তারা রাজার ও রাজ্যের বিপদকে নিজের বিপদ বলে মনে করে। তখন তারা দল বেঁধে রাজাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে যায়। রাজার ও তার বেতনভুক্ সৈন্যদের অপেক্ষায় বসে থাকে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে কেন বসে থাকে না এবং ভারতবর্ষেই বা কেন বসে থাকে, সে প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ, ইউরোপের প্রজা চিরকাল পরাধীন ও ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল স্বাধীন। এখানে 'প্রচলিত মীমাংসার একটা বিরুদ্ধ কথা' বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণার সঙ্গে এখানে অনেকে হয়ত একমত না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর ধারণার সমর্থনে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন, বাংলার মননধর্মী সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে তা' এক স্মরণীয় সংযোজন। আলোচ্য প্রবন্ধে 'পরাধীন' ও 'স্বাধীন' এই দু'টি শব্দকে তিনি একটু বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর অভিমত, আমি হিন্দুর রাজ্যে কি খ্রীষ্টানের রাজ্যে বাস করি, তা' দেখে আমার স্বাধীনতার পরিমাপ হবে না। "আমার নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের কতখানি রাজার অধীন ও কতখানি আমার নিজের অধীন," জীবনের কি পরিমাণ কাজ রাজার হুকুমে সম্পাদিত হয়, আর কি পরিমাণ কাজ আমার নিজের ইচ্ছামত সম্পাদন করতে পারি, তা' দেখেই আমার স্বাধীনতার মাত্রা স্থির করতে হবে। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, এই হিসেবে সেকালের ভারতবাসী একালের ইউরোপীয়দের অপেক্ষাও অধিকতর স্বাতন্ত্র্য ভোগ করেছে। কেননা, ইউরোপের প্রজার পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সমস্ত কাজেই রাজা হস্তক্ষেপ করতে চান ; এবং এ কারণেই সেখানে রাজায়-প্রজায় সনাতন দ্বন্দ্ব, ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্লব। এ কারণেই ইউরোপের খণ্ড জাতিগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব এত প্রবল। সেখানে বাইরে জাতির সঙ্গে জাতির, রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের চিরন্তন কলহ, আর ভিতরে রাজার সঙ্গে প্রজার সনাতন বিরোধ। ফলে সেখানকার প্রজারা কর্মঠ হয়ে উঠে অস্ত্রধারী সৈনিকে পরিণত হয়েছে। এ দিক থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে সমগ্র জাতি কখনও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে নি। এক মহাসাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এখানকার সকলে স্থান লাভ করে নি। সমগ্র ভারতবর্ষ কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 'কিন্তু এক একটি রাজ্যের অধিবাসীরা কখনো একজাতীয়ত্ব প্রাপ্ত' হয় নি। ইউরোপে যেমন ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি কয়েকটি দৃঢ়বদ্ধ জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যা'দের স্বার্থ পরস্পরের প্রতিকূল, যা'দের পরস্পরের মধ্যে কোনোরূপ সহানুভূতির বন্ধন নেই, ভারতবর্ষে সেরূপ কয়েকটি খণ্ড জাতি গড়ে উঠতে

পারে নি। এজন্যে রামেন্দ্রসুন্দর সঙ্গত কারণেই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থাকে কতকটা দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে যে কিছু বর্ণগত বা ধর্মগত বা সম্প্রদায়গত বিরোধ আছে, তা' রাজনৈতিক বিরোধ নয়, সামাজিক বিরোধ। তা' প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেই বর্তমান। তা' সংহত হয়ে এক একটা নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি। ফলে ভারতবর্ষে রাজায় রাজায়, রাজবংশে রাজবংশে যুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে মর্মঘাতী যুদ্ধ কখনও ঘটে নি। ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক দল বেঁধে অন্য প্রদেশের লোকের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত হয় নি। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, ভারতবর্ষের প্রজার 'এই প্রকৃতিগত অসম্পূর্ণতাই' এদেশের পরাধীনতার প্রকৃত কারণ। ভারতবাসী পরাধীন, কেন না, বাইরের শত্রু এসে স্বদেশ আক্রমণ করলে যে প্রতিবাদ করতে হয়, তা' এরা জানে না। রাজার শাসনে কোনো অন্যায় ঘটলে যে হস্তক্ষেপ করতে হয়, তা' এদের অজানা। অর্থাৎ, রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চান, প্যাট্রিয়টিজম্ ভাবটা ভাবতীয়দের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে নি। ভারতবর্ষে কখনও জাতীয়তার বিকাশ হয় নি।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে যুক্তি ও অনুসন্ধান-বাজ্যের আরও গভীবে অনুপ্রবেশ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। জাতীয় ভাব কেন এ দেশে বিস্তার লাভ করে নি, সমগ্র হিন্দু জাতি কেন একটা মহাজাতিতে পরিণত হয় নি, লেখক তা'র কয়েকটি কারণ প্রদর্শন করেছেন। প্রথম কারণ হল, সমগ্র ভারতবর্ষকে এক রাজার অধীনে রাখতে কোনো রাজবংশই সমর্থ হয় নি। সমগ্র দেশ তখন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব স্ব প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ঘটনাকে রামেন্দ্রসুন্দর জাতীয় ভাব বিকাশের প্রতিকূল একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। জাতীয়তার অভাব বোঝাতে গিয়ে আরও কয়েকটি সুচিন্তিত কথা বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, ভারতবাসী যে এক জাতিতে পরিণত হয় নি, তার কারণ ভারতবর্ষ এক অতি প্রকাণ্ড দেশ। এখানে নানা জাতি ও নানা বর্ণেব লোক বাস করে। এদের নানা ভাষা, নানা রকম ধর্ম। রাজনৈতিক বা সামাজিক, ধর্মগত বা ভাষাগত কোনো একটা সাধারণ সম্বন্ধ এদেব ঐক্যের বাঁধনে বাঁধতে পারে নি। এই সাধারণ বন্ধনের অভাবে এখানকার সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এমন আকর্ষণ ঘটতে পায় নি, যা'তে সকলে একত্রিত হয়ে সাধারণ উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবনের গতি পরিচালিত করতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, এ দিক থেকে ভাবতবর্ষেব সঙ্গে বরং ইউরোপের মিল আছে। ভারতবাসী একত্র হয়ে যেমন মহাজাতিতে পরিণত হয় নি, ইউরোপবাসীও সেরূপ মহাজাতিতে পরিণত হতে পারে নি। ভারতবর্ষের মতো ইউরোপেও অনেক রকম জাতির বাস। আবার ভারতবর্ষের দুর্দিনে যেমন ভারতবাসীর প্রাণ কাঁদে না, ইউরোপবাসীরও সেরূপ ইউরোপের জন্যে প্রাণ কাঁদে না। কিন্তু সাদৃশ্য এই অবধি। এর পরেই আর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। "ইউরোপবাসীর ইউরোপের জন্য প্রাণ কাঁদে না বটে, কিন্তু ফ্রান্সের জন্য ফরাসীর প্রাণ কাঁদে"। অপরদিকে বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গলার জন্যে বা পাঞ্জাবীর প্রাণ পাঞ্জাবের জন্যে কাঁদে নি। রামেন্দ্রসুন্দর দেখাতে চেয়েছেন, এখানেই ইউরোপীয় ও ভারতবাসীতে তফাৎ। এক মহাদেশ বা মহাজাতি প্রতিষ্ঠায় ইউরোপের আগ্রহ নেই বটে, কিন্তু সেখানকার এক

একটা রাজ্যে এক একটা দৃঢ়বদ্ধ সবল জাতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ভারতবর্ষে যে হয় নি, তা'র কারণ, সামাজিক ও নৈতিক সকল দিক দিয়েই ভারতের প্রজারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এ কারণেই এখানে রাজার সঙ্গে প্রজার বিরোধ ঘটে নি। কিন্তু ইউরোপে রাজা প্রজার চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছেন। যাজক সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ধর্মের ব্যাখ্যা না মানলে জনসাধারণকে সেখানে রাজদণ্ড ভোগ করতে হ'ত। সেজন্যেই সেখানে রাজায়-প্রজায় সনাতন দ্বন্দ্ব। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন ঘটে নি। এদেশে রাজা প্রজার স্বাধীনতায় যখন-তখন হস্তক্ষেপ করতেন না। প্রজাও রাজশক্তি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। রাজশক্তির অত্যাচারকে প্রতিরোধের জন্যে প্রজাশক্তি এদেশে সংহত হয়ে ওঠে নি। সে কারণেই মুসলমানরা যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল, তখন ভারতবর্ষের প্রজারা আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হয়।

'নানা কথা'র আর একটি প্রবন্ধ 'রাষ্ট্র ও নেশন' (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩০৮) বিষয়বস্তু ও রচনারীতির দিক থেকে উপরে আলোচিত 'পরাধীনতা' শীর্ষক রচনাটির সগোত্র। পূর্ববর্তী প্রবন্ধের ন্যায় এখানেও রামেন্দ্রসুন্দর ভারতে রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের মূল কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধ 'পরাধীনতা'য় যেমন, এখানেও তেমনি ভারতের রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের মূল কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ইয়োরোপ ও তথাকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। বলতে কি, এ প্রবন্ধ ও পূর্ববর্তী প্রবন্ধের বক্তব্য প্রায় একই। 'পরাধীনতা'য় ভারতে জাতীয় ভাবের অবিকাশ বোঝাতে গিয়ে যে কথাগুলো বলা হয়েছিল, এখানে ভারতবর্ষ কেন রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে নি এবং ভারতবাসী কেন 'নেশন' হয়ে ওঠে নি, তা' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। এতে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে, সন্দেহ নেই ; কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, এ থেকে সে কথাও প্রমাণিত হয়। তবে নেশন-এর লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে এখানে রামেন্দ্রসুন্দর কিছু নতুন কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের কারণগুলোও এখানে অপেক্ষাকৃত সংহত আকারে উপস্থাপিত। নেশন অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর 'সুগঠিত, সংহত ও শরীরবদ্ধ' মানব-সমাজকেই বুঝেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হ'ল, ঐ সমাজ-শরীর সর্বদা জাগ্রত থেকে আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সচেষ্ট, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা ক'রে পরের বিরুদ্ধে আত্মপ্রসারে সর্বদাই উন্মুখ। এর প্রত্যেক অঙ্গ সমাজের সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্যে একযোগে কাজ করে। এর কোনো অঙ্গে আঘাত পড়লে অন্য অঙ্গেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রবন্ধে সমগ্র নেশনের শক্তিকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন, "নেশনের রাজশক্তির মূল প্রজাশক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" এবং প্রজাশক্তিকে আশ্রয় করে দণ্ডায়মান। যেখানে নেশন আছে, সেখানে সর্বদাই দেখা যায়, প্রজাশক্তি রাজশক্তির মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে তৎপর ; এবং নেশনের শরীররূপ "প্রজাশক্তির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনার্থই রাজশক্তি বর্তমান।"

আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, "ভারতবর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড পুরাতন হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু হিন্দু নেশনের অস্তিত্ব ছিল না, হিন্দু সমাজের এক অঙ্গের

ব্যথা অপর অঙ্গ অনুভবে সমর্থ ছিল না।" এর কারণ, ভারতবর্ষে রাজশক্তি প্রজাশক্তির আশ্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। রাজশক্তিকে ক্ষমতাশালী করার জন্যে প্রজাশক্তি কখনো এসে তার পাশে দাঁড়ায় নি। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিপন্ন করেছেন, "ধর্মগত, জাতিগত, আচারগত ও ভাষাগত একতা নেশন্ বন্ধনে সাহায্য করে"। ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্মান জাতির নেশন-বন্ধনে এই একতা সাহায্য করেছে। সে সব দেশে রাষ্ট্রের ঐক্য অন্যান্য বিষয়ের অনৈক্যকে নষ্ট করে নেশন-শরীর গড়ে তুলেছে। কিন্তু "যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের আকর্ষণ, ধর্মগত বা আচারগত বা ভাষাগত অনৈক্যের বিকর্ষণে পরাভূত হয়, সেখানে নেশনের উৎপত্তি ঘটে না।" এই প্রসঙ্গে জার-শাসিত তৎকালীন রাজতান্ত্রিক রাশিয়াব কথা উল্লেখ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়েছেন, সেখানে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সঙ্গে সংযোগ ও সহযোগিতার অভাব বলেই রুশরা নেশনে পরিণত হয়নি। এবপর এসেছে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ। সুপ্রাচীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের রাজনৈতিক আলেখ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে অতি অল্প কথায়। যথার্থই বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে সেখানে খণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বেশি নজরে পড়ে। কিন্তু সেই সব রাষ্ট্রের মধ্যে কোনোরূপ সমবেদনা বা সহানুভূতির বন্ধন ছিল না। সমগ্র ভারত-জোড়া ঐক্যবদ্ধ এক অখণ্ড রাষ্ট্র-স্থাপনের চেষ্টা অনেকবার হযেছিল, কিন্তু তা' স্থায়ী হয় নি। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হল, ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র ছিল না, নেশন্ও ছিল না। কেননা, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির কোনোরূপ স্বার্থসম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি এদেশে। রাজাব জয়-পরাজয়ে প্রজারা চিবকালই এদেশে উদাসীন ছিল। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষেও রাজা-প্রজায় কোনোরূপ বন্ধন ছিল না। তাই তৎকালীন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে রামেন্দ্রসুন্দব সঙ্গত কাবণেই বলেছেন, ইংবেজের আমলে ভাবতবর্ষে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু নেশন্ গড়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ভারতবর্ষে নেশনালিজম্ জন্মলাভ করেছিল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, '৪২-এব ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে যে নেশনালিজম্ বা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠল, এবং যা'র ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, রামেন্দ্রসুন্দব তা'র পরিপূর্ণ চিত্র দেখে যান নি। তিনি যতটুকু দেখেছেন তা'র পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তই হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুকেই সাময়িক একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার পক্ষপাতী নন তিনি। দেশ-কালের ক্ষুদ্র প্রাচীর অতিক্রম করে বৃহত্তর কোনো পটভূমিতে বসে সত্যসন্ধান করতেই তিনি বরাবর অভ্যস্ত। এখানেও দেখি, ইংরেজ আমলের কথাই শুধু আলোচনায় স্থান পায় নি, এসেছে মুসলমান আমলের কথা, তার আগেকার হিন্দু-যুগের প্রসঙ্গ। রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষ যখন দেশীয় হিন্দু রাজাদের শাসনে ছিল, তখনও রাজায়-প্রজায় মমত্বের বন্ধন ছিল না। ভারতবর্ষে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। প্রজা এখানে চিরদিনই উদাসীন দর্শক মাত্র। যে পক্ষ জয়ী হয়, তার কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। ভারতবাসীরা এক হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হয় নি। তাই বলে ইংরেজ, জার্মান বা ফরাসীর সঙ্গে তুলনা ক'রে ভারতবাসীকে দোষারোপ করার পক্ষপাতী নন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর

অভিমত, সমগ্র ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা চলতে পারে, ইয়োরোপের কোনো একটা বিশেষ রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়। আয়তনে বা লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের সঙ্গে ইয়োরোপ মহাদেশেরই তুলনা হয়; ইয়োরোপের অন্তর্গত কোনো রাষ্ট্রের তুলনা হয় না। রোম সম্রাট সমগ্র ইয়োরোপকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন নি, ভারতবর্ষকেও তেমনি কোনো সম্রাট একচ্ছত্র করতে পারেন নি। কিন্তু ইয়োরোপের অন্তর্গত এক একটা ক্ষুদ্র খণ্ড রাষ্ট্র এক একটা শক্তিশালী নেশনে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষও যদি এক মহারাষ্ট্রে পরিণত না হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকত, তবে ভারতবর্ষের পতন এমন অনিবার্য হত না। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষের পতনের কারণ, এর অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলি নেশনে পরিণত হয় নি। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই প্রজাশক্তি রাজশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। রাজশক্তি কোথাও প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। রাজার সুখ-দুঃখে প্রজা সমবেদনা দেখায় নি। রাজশক্তির জয়-পরাজয়ে প্রজা ছিল উদাসীন। রাজার পিছনে দাঁড়িয়ে প্রজা এখানে রাষ্ট্র-রক্ষার জন্যে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করে নি। রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি যেখানে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন, সেখানে নেশন জন্মগ্রহণ করতে পারে না এবং ভারতবর্ষে নেশনের অস্তিত্ব ছিল না বলেই ভারতবাসী পরাধীন হয়েছে, বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে নি।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলো ছাড়াও রামেন্দ্রসুন্দর 'নানা কথা'র আরও দু'টি রচনায় পাশ্চাত্ত্য সমাজের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩০৮) এবং 'ব্রাহ্মণ কি পৃষ্ট' (ভারতী, চৈত্র ১৩০৮) প্রবন্ধ দু'টি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রবন্ধটি থেকে আমাদের দেশের বর্ণধর্ম সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বিশিষ্ট দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধটি রচনার মূলে আছে আলোচনা-সমিতিতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পঠিত প্রবন্ধ। ব্রহ্মবান্ধবের প্রবন্ধ শুনে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের যা' মনে হয়েছিল, এখানে তা' লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ কালে বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যবস্থা পূর্বের মতো অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে কি না, এ নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে। এ প্রশ্নের উত্তরে রামেন্দ্র-সুন্দরের বক্তব্য হল, কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই চিরকাল সমানভাবে চলতে পারে না। সমাজ যখন পরিবর্তনশীল, তখন সমাজস্থিতির ব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল হবে, এ কথা তিনি স্বীকার করেন। একালে যে মনুর সময়ের বর্ণাশ্রম ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। এমন আশাও কেউ করেন না। তাই বলে বিপ্লবেরও সমর্থক নন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর প্রার্থনা, পুরাতন আদর্শ পুরাতন ভিত্তির উপর বজায় থাকুক। তবে, সেই আদর্শ যদি কালানুযায়ী মূর্তি গ্রহণ করে, তবে তা' থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এই বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন এবং এর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বলেছেন, ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মের অঙ্গ দু'টি—প্রথম বর্ণধর্ম। এই ধর্মকে নিয়ে আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়টি আশ্রমধর্ম,—আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রতিষ্ঠা।

অর্থাৎ, সমাজজীবনে বর্ণভেদ—ব্যক্তির জীবনে আশ্রমভেদ। রামেন্দ্রসুন্দর আলোচ্য প্রবন্ধে বোঝাতে চেয়েছেন, বৈদিক কালে এই দুই ধর্মের যে মূর্তি ছিল, এখন তা' নেই। পরিবর্তন ক্রমশঃ ঘটছে,—শ্রুতির ভিত্তি বজায় রেখে পরিবর্তন ধীরে ধীরে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ঘটছে। শ্রুতির ভিত্তিকে ঠেলে ফেলে যেখানে আকস্মিক পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই ফল হয়েছে শোচনীয়। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত, বর্তমান কালেও সেরূপ কালোচিত পরিবর্তন ঘটছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। কিন্তু তাই বলে শ্রুতির ভিত্তি ঠেলে ফেলা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে লেখক দেখিয়েছেন, প্রাচীন যুগের কোনো কোনো সমাজব্যবস্থা একালে কিভাবে ও কতখানি পরিবর্তিত হয়েছে। দেখিয়েছেন, কিভাবে প্রাচীন কালের চার আশ্রম এখন কেবল গৃহস্থাশ্রমে পরিণতি পেয়েছে। ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ একালে নেই। তবে বর্ণধর্ম পূর্ণমাত্রায় আছে। একালের বর্ণগত প্রভেদ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথম শোণিতগত, দ্বিতীয় ব্যবসায়গত, তৃতীয় দেশগত। কিন্তু ইয়োরোপের সমাজে এ ধরনের বর্ণগত প্রভেদ নেই। প্রসঙ্গতঃ ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের তুলনা করে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, "ইউরোপের সমাজের বন্দোবস্ত প্রতিভার বিকাশের অনুকূল ; আমাদের দেশের সমাজের বন্দোবস্ত প্রবৃত্তির দমনের অনুকূল।" ইয়োরোপে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো পদ পেতে পারে। সেখানে অতি সাধারণ একজন মজুরও জানে যে, তার প্রধানমন্ত্রী হবার অধিকার আছে। ফলে দাঁড়ায় এই, দু'চার জন হয়তো উঁচু পদে ওঠে, কিন্তু অধিকাংশেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় ; এবং এর ফলে একটা দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টতঃই বলেছেন, আমাদের দেশের ব্যবস্থা কতকটা অন্যরূপ। এই প্রসঙ্গে মনে যেন রাখি, রামেন্দ্রসুন্দর আজ থেকে প্রায় ৬০।৭০ বৎসর আগেকার সমাজের কথা বলেছেন। তখন অবধি চাষীর ছেলে বা তাঁতীর ছেলে স্বপ্নেও ভাবত না যে কোনোদিন সে দেশের কর্ণধার হতে পারে। সে জানতো, পৈতৃক জাতিধর্ম ও ব্যবসায়কে আঁকড়ে ধরে কায়ক্লেশে জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্যই তার জন্ম হয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র ছিল না তার। যা'ই হোক, এই দু' প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টা ভাল, তা' নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে খোলসা করে কিছু বলেন নি। শুধু বলেছেন, সব কিছুরই ভাল মন্দ দু'টো দিক আছে। পাশ্চাত্ত্য সমাজের ন্যায় আমাদের সমাজেও এক দিক ভাল, অপর দিক মন্দ। পাশ্চাত্ত্যদের অবস্থা উন্নতির অনুকূল, কিন্তু স্থিতির অনুকূল নয়। অপরপক্ষে আমাদের অবস্থা স্থিতির অনুকূল, কিন্তু উন্নতির ঠিক অনুকূল নয়। তবে আমাদের ব্যবস্থার পক্ষে একটা কথা রামেন্দ্রসুন্দর এখানে স্পষ্ট করেই বলেছেন। কথাটা হল এই যে, আমাদের দেশের লোকেরা Dignity of labour বা পরিশ্রমের মূল্য বোঝে। সচরাচর কিন্তু বলা হয়, এ দেশের লোকেরা Dignity of labour বোঝে না। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বাস ঠিক উল্টো। তিনি মনে করেন, আমার নিকট আমার কর্ম পরম গৌরবের,—এই কর্ম যদি আমার জীবনে সম্পাদন করে যেতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক হবে,—এই ভাবটা আমাদের দেশের অতি ইতর লোকের মধ্যেও আছে। রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমজীবী এই নিষ্কাম ধর্মের আদর্শের প্রতি যতটা এগোতে পেরেছে, পৃথিবীর আর

কোনও দেশের কোনো লোক ততটা পারে নি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের আপন আপন কর্মের প্রতি এই অবিচলিত নিষ্ঠাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন তিনি। সেই শ্রদ্ধার পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধটির উপসংহারে সুস্পষ্ট। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলেছেন,

> যথন দেখিতে পাই, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শীত যাইতেছে, প্রকৃতির যাবতীয় অত্যাচার অকুণ্ঠিতভাবে সহ্য করিয়া দরিদ্র কৃষক বৎসরের পর বৎসর তাহার ক্ষেতের টুকরাটিতে পরিশ্রম করিতেছে—কোন বার ফল পায়, কোন বার পায় না; কোন দিন উদর পূর্ণ হয়, কোন দিন হয় না,—কোনরূপ রাজদরবারে বসিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উহাকে উত্তেজিত করিতেছে না, গ্লাড্স্টোন্ হইবার সে কখনও স্বপ্ন দেখে না, তাহার অবসাদ দূর করিবার জন্য ও উত্তেজনা বিধানের জন্য চা নাই, মদ নাই, খবরের কাগজ নাই, রাজনীতিবিষয়ক, ধর্মনীতিবিষয়ক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, কোন বক্তৃতার ব্যবস্থা নাই—অথচ সে খাটে, কিন্তু অবসন্ন হয় না—সে খাটে, কিন্তু নিজের জন্য নহে, আপন বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য, পত্নীর জন্য, পুত্রকন্যার জন্য, হয়ত পিসী মাসী, ভাই ভগিনীর জন্য চিরজীবন খাটে ও যথন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বিরাম পায়—তখন আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে নিষ্কাম ধর্ম্ম পালনের উদাহরণ.যদি কোথাও থাকে, সে এখানে।

'নানা কথা'র সর্বশেষ প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মণ কি প্রীষ্ট'[১] (ভারতী, চৈত্র ১৩০৮) সমাজ ও ধর্ম নিয়ে লেখা আর একটি উৎকৃষ্ট রচনা। ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্যদের কয়েকটি ভুল ধারণার খণ্ডন করার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। পাশ্চাত্ত্যেরা ব্রাহ্মণ বোঝাতে ইংরেজী priest শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ভারতবর্ষকে বলেন priest-ridden দেশ। ব্রাহ্মণদের পুরোহিতের জাতি বলা কতদূর সঙ্গত এবং ব্রাহ্মণের অনুবাদে priest শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত কি না ও priest-এর যাবতীয় অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণকে দায়ী করা ঠিক কি না, এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর তা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইংরেজী priest ও ভারতীয় ব্রাহ্মণের কর্ম, ধর্ম ও আচারগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, ইংরেজী priest অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের হাতে ভারতবর্ষের ধর্মের চাবি রয়েছে, এমন কথাও মেনে নেওয়া চলে না। তা' ছাড়া ভারতবর্ষকে priest-ridden country আখ্যা দেওয়াও অসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, priest-এর অত্যাচারে ভারতবাসী হিন্দুরা ধর্মগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত, এরূপ নির্দেশ অযৌক্তিক। তাঁর মতে, ব্রাহ্মণের অত্যাচারকে ভারতবর্ষের অবনতির মূল কারণরূপে নির্দেশ করা চলে না। কেন চলে না, তা' বোঝাতে গিয়ে প্রথমেই তিনি খ্রীষ্টানদের পুরোহিতের সঙ্গে আমাদের পুরোহিতের পার্থক্য কোথায়, তা' স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হল, পার্থক্য আকাশ-পাতাল। খ্রীষ্টান

১. রামেন্দ্রসুন্দরের জামাতা শীতলচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'নানা কথা'র প্রথম সংস্করণে (১৯২৪) এই প্রবন্ধটি স্থান পায় নি। তবে সম্পাদক 'নিবেদন'-এ এর কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন, সন্ধান না পাবার ফলেই এই রচনাটি 'নানা কথা'য় সংকলন করা সম্ভবপর হয় নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের পরিশিষ্টে এই প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে।

পুরোহিতের মতো এদেশে পুরোহিতের সমাজসম্মত কোনো পদ নেই। সত্য বটে, ব্রাহ্মণরা সমাজের সম্মতিক্রমে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ মাত্রই পুরোহিত নন। যাজক ব্রাহ্মণরা অন্য ব্রাহ্মণের চেয়ে বেশী সামাজিক সম্মান পান না; বরং শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সম্মান যাজক-ব্যবসায়ী পুরোহিত ব্রাহ্মণের চেয়ে অধিক। খ্রীষ্টানদের দেশে পুরোহিত বা প্রীষ্ট্ কোনো সমাজসম্মত প্রভুশক্তি কর্তৃক নিযুক্ত হয়। সেখানে যে ব্যক্তি একের পুরোহিত, সে অন্যের কাছেও পুরোহিত। কিন্তু আমাদের দেশের কোথাও এ ধরনের প্রভুশক্তি নেই। হিন্দু সমাজে পোপ নেই, চার্চের অধ্যক্ষ নেই; সকলেই এখানে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কাজেই এ সমাজে পুরোহিত সমাজ থেকে বা কোনো প্রভুশক্তি থেকে নিযুক্ত হন না। আমাদের দেশে যিনি আমার পুরোহিত, তিনি অন্যের পুরোহিত নন। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশে clergy ও lay—এই দুই সম্প্রদায় নেই। ব্রাহ্মণ মাত্রেই এখানে layman; clergyman নন। এ দেশে যে কোনো ব্রাহ্মণ যে কোনো ব্যক্তিকে যখন খুসী যজমানরূপে গ্রহণ করতে পারেন; আবার যে কোনো যজমান যে কোনো ব্রাহ্মণকে খুসীমত পুরোহিতরূপে গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ, রামেন্দ্রসুন্দর দেখাতে চেয়েছেন, পুরোহিত-যজমানের সম্পর্কের মধ্যে এদেশে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা নেই, স্বাধীনতা খর্ব করার কোনোরূপ প্রচেষ্টা নেই। কারণ, খ্রীষ্টানদের মধ্যে পুরোহিতের সমাজ-প্রতিনিধিত্ব আছে; কিন্তু এ দেশের পুরোহিত কোনো সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তিনি কেবল তাঁর যজমানেরই প্রতিনিধি। সেই যজমান কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি হতে পারে, এক গৃহস্থ পরিবার হতে পারে। কিংবা অনেক পরিবার হতে পারে। এইভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টান সমাজের পুরোহিতের তুলনামূলক আলোচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে তাঁর বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মের ব্যাপারে উভয় সমাজের পার্থক্যের মূল সূত্রটিকেও অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যথার্থই বলেছেন, খ্রীষ্টানদের দেশে গৃহস্থ মাত্রই পুরোহিতের মধ্যস্থতা দ্বারা উপাস্যের সম্মুখীন হন। দেবতার নিকট তাদের পূজা পৌঁছে দেবার সময় মধ্যস্থ চাই। কিন্তু আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-বৈশ্য নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তি পুরোহিতের সাহায্য ছাড়াও স্বধর্ম পালন করে জীবন কাটাতে পারেন। নৈমিত্তিক ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন অনুযায়ী কেউ ব্রাহ্মণকে ডাকতে পারেন; কিন্তু না ডাকলেও অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি হয় না। অপর দিকে পাশ্চাত্ত্য দেশে ব্যবস্থা অন্য রকম। সেখানে পাপ-পুণ্য বিচারের ভার পোপের উপর। পোপ যাঁকে পুণ্যের ছাড়পত্র দেবেন, পুণ্যলাভ শুধুমাত্র তারই ভাগ্যে ঘটবে। কিন্তু এ দেশে কোনো ব্রাহ্মণ বা কোনো পুরোহিতের এ ধরনের ছাড়পত্র দেবার অধিকার নেই। ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে পোপের মতো কোনো ধর্মগুরু এদেশে বসে নাই। এদেশে মানুষ মাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিজ নিজ কর্মের ফলভাগী। কর্মফল থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। এদেশে মুক্তির দ্বার সকলের কাছেই অবারিত। খ্রীষ্টানদের Salvation বোঝাতে অনেক সময় 'মুক্তি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, Salvation বলতে পাপ থেকে মুক্তিলাভ মাত্র; এর ফল স্বর্গলাভ। যে ব্যক্তি বিধান অনুযায়ী যীশু-

খ্রীষ্টের শরণ নিয়েছে, একমাত্র সে-ই এই স্বর্গলাভের অধিকারী। খ্রীষ্টান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীর পক্ষে Salvation একেবারেই অসম্ভব। খ্রীষ্টানদের এই Salvation-এর সঙ্গে হিন্দুদের মুক্তির তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, হিন্দু-শাস্ত্রে মুক্তির পথ এ ধরনের বাধানিষেধে কণ্টকিত নয়। হিন্দুদের মুক্তির অর্থ যা'ই হোক, স্বর্গ-প্রাপ্তিই হোক আর সালোক্য বা সাযুজ্যই হোক, এখানে সকলেরই দ্বার অবারিত। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বর্ণবিচার নেই এখানে, পুরোহিতের হাতে স্বর্গের চাবিকাঠি নেই। এ সমাজে যথাযথ উপায় অবলম্বন করলে সকলেই যথাসময়ে মুক্তিলাভ করতে পারে। আর কেবল হিন্দু নয়, হিন্দুসমাজের বাইরে আছেন যারা, তারাও স্বর্গলাভের বা মুক্তিলাভের অধিকারী হতে পারেন।

এইভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টান সমাজের পুরোহিতের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে রামেন্দ্র-সুন্দর এখানে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, priest বলতে ব্রাহ্মণ বোঝায় না, সকল ব্রাহ্মণই পুরোহিত নন। তা'ছাড়া এদেশের অবনতির জন্যে গোঁড়ামীর অপবাদ দিয়ে ব্রাহ্মণদের দায়ী করা অযৌক্তিক। হিন্দুধর্মকে রক্ষণশীল প্রতিপন্ন করা অন্যায়। বরং খ্রীষ্টানধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্ম অনেক বেশী প্রগতিশীল। খ্রীষ্টানদের মতো পুরোহিতের মাতব্বরি নেই এদেশে। ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠানে ব্যক্তির স্বাধীনতা এদেশে বরাবরই স্বীকৃত। ধর্মীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মানুষ পাশ্চাত্যদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

২

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, কিভাবে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে প্রাচ্য ভারতবর্ষের সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। এবার আমরা দেখব, বৃহত্তর জীবনধর্ম নিয়ে লেখা এবং সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপোষক কোনো কোনো প্রসঙ্গেও রামেন্দ্রসুন্দর কিভাবে ভারতের জীবনসাধনা ও সমাজ-সংস্কৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'নানা কথা'র 'আমিষ ভোজন' (পুণ্য, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) নামক প্রবন্ধটি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। এটি হল মানুষের আদিম জীবনধর্ম নিয়ে লেখা একটি অভিনব প্রকৃতির রচনা। আমিষ ভোজনের কর্তব্য-অকর্তব্য নিয়ে অনেক দেশেই অনেক রকমের বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। ঊনবিংশ শতকের বাংলায়ও এ নিয়ে কম বাক্-বিতণ্ডা হয় নি। কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই একদেশ-দর্শিতায় দুষ্ট। তা'ছাড়া এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ প্রাধান্য দিয়েছেন বিজ্ঞানকে। আবার কারও আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে ধর্মাধর্মের প্রসঙ্গ। কিন্তু রামেন্দ্র-সুন্দর বিষয়টির বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন তিন দিক থেকে। শরীর-রক্ষার কথাকে উপলক্ষ্য করে তাঁর আলোচনায় প্রথমে এসেছে বিজ্ঞানের বিষয়। তারপর এসেছে অর্থশাস্ত্রের প্রসঙ্গ। সবশেষে ধর্মাধর্মের প্রসঙ্গ নিয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা' হল এই যে, মাংস উদ্ভিদের অপেক্ষা পুষ্টিকর; মাংস মানুষের নির্দিষ্ট খাদ্য; তা' ছাড়া কৃষিজাত উদ্ভিদ্ কোনো সমাজের পক্ষেই যথেষ্ট ও প্রচুর নয়। সুতরাং মানুষের প্রবৃত্তি মাংসের দিকে। মানুষ প্রাকৃত নিয়মে জীবনরক্ষার জন্যে ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে মাংস ভোজনে বাধ্য।

এরপর অর্থশাস্ত্রের দিক থেকে আমিষভোজন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ের আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর নতুন কথা কিছু বলেন নি বা নতুন কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেও আলোচনায় এগোন নি; বরং প্রচলিত মতকেই গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত মত হল, জীবনরক্ষা যখন অত্যাবশ্যক ব্যাপার এবং স্বাভাবিক কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যখন দরিদ্র এবং যত মানুষ আছে, তত খাদ্য নেই, তখন মাংস যেখানে সস্তা, মানুষ সেখানে মাংসই খাবে। সাধারণভাবে স্বীকৃত অর্থশাস্ত্রের এই মতের বিরুদ্ধে এখানে রামেন্দ্রসুন্দর কোনোরূপ যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত করেন নি।

যুক্তিতর্ক ও সন্দেহ-সংশয় এসেছে পরবর্তী প্রসঙ্গে—আমিষ আহার ধর্মসঙ্গত কি না, এ প্রশ্নের আলোচনায়। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, মানুষ অভাবের তাড়নায় জীবন-রক্ষার জন্যে চিরকাল পশুমাংস ভোজন করে আসছে। এক হিসেবে এতে অধর্ম নেই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আর সব মানুষের মতই নির্বিকারচিত্তে মাংস ভোজন করতেন। কেননা এই হল প্রকৃতির ব্যবস্থা; এবং এ ব্যবস্থাই মানুষের প্রাচীন ধর্ম। প্রাচীন যুগে দেবতার প্রীতির জন্যে পৃথিবীর সর্বত্র পশুবলি দেওয়া হত। বৈদিক যজ্ঞেও পশুবলির বিধান আছে। কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতবাসীদের অনেকেই জীবের প্রতি দয়াপরবশ হলেন। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, এদেশে জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছিল; কারণ শস্য-শ্যামলা ভারতভূমিতে কৃষিবৃত্তিপরায়ণ আর্যদের আর তেমন জীবহিংসার প্রয়োজন হয় নি। ফলে ধর্মপ্রবৃত্তি অন্তঃকরণে নতুন ভাবের উদ্বোধন করল। সকলের মনে এখনও যে সেই ভাব জাগে নি, তার কারণ, দয়াবৃত্তিকে ধর্ম বলে গ্রহণ করার সময় এখনও আসে নি। তবে রামেন্দ্রসুন্দর এ ব্যাপারে আশাবাদী। তাঁর দৃঢ় ধারণা, মানুষ বিজ্ঞানবলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হবে, যে দিন আর নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হবে না, যে দিন সমগ্র পৃথিবীতে অহিংসা পরম ধর্ম বলে গৃহীত হবে। রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, মানুষের জ্ঞান ও শক্তির অভাবের জন্যই অহিংসা আজও পরম ধর্ম বলে গৃহীত হয় নি। আজও তাই মানুষকে আদিম হিংসাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কেননা, আজও মানুষ ক্ষুধার্ত, দুর্বল এবং প্রকৃতি কর্তৃক বঞ্চিত। অতএব জীবহত্যা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে আমিষাশীদের অহিংসাধর্মের উপদেশ দিতে গেলে আজ·তা ফলপ্রদ হবে না বলেই রামেন্দ্র-সুন্দরের ধারণা।

৩

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ্য রেখে রামেন্দ্র-সুন্দর কিভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু মনে যেন রাখি, আন্তর্জাতিক নয়, জাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে নিয়েই রামেন্দ্রসুন্দর বেশী ভেবেছেন। সে কারণেই তাঁর বহু বিক্ষিপ্ত রচনায় স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-রচনার প্রবণতা দেখা যায়। স্বদেশের যথাযথ ইতিহাস-রচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে বহু রচনায়। অনেক জায়গায় আবার দেখি, তিনি নিজেই স্বদেশ ও স্বজাতির খুঁটিনাটি ইতিহাস-রচনায় ও পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে

প্রথমেই ১৩০৬ সালের ৩য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 'একখানি প্রাচীন দলিল' শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখের একটি দলিলের মর্মকথা বর্ণনার পর মূল দলিলটি প্রকাশিত হয়েছে। দলিলটি স্বকীয়া ও পরকীয়া ভজনকে কেন্দ্র করে লেখা। একই বিষয় নিয়ে রচিত অন্য এক তারিখের আর একটি দলিল রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে এসেছিল। ঐ দলিলটি 'আর একখানি প্রাচীন দলিল' এই শিরোনামায় ১৩০৮ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এ ছাড়া ছোটখাট পুরাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়েও রামেন্দ্রসুন্দরের ইতিহাস-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। 'রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ' ১৩০৭ সালের ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সুলিখিত পুরাতাত্ত্বিক প্রবন্ধ। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি গ্রামটিই যে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী, এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর তা' প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন; এবং এ ব্যাপারে তিনি সাহায্য নিয়েছেন দীঘাপতিয়ার রাজবংশধর শরৎকুমার রায় সংগৃহীত একটি হিতোপদেশ বিষয়ক পুঁথির। এ ছাড়া 'পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা' (১৩০৭) রচনা করেও রামেন্দ্রসুন্দর স্ববংশ ও স্বধর্মনিষ্ঠার এবং ইতিহাস-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা হল একটি গৃহস্থবংশের ইতিবৃত্ত। রামেন্দ্রসুন্দর এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সবিতা রায় রাজা মানসিংহের সময়ে পশ্চিম থেকে এসে এদেশে বাস করেন। তারপর তিন শত বৎসরের অধিককাল ধরে তাঁর বংশধরেরা নানা ধরনের সদাচার ও লোকসেবা ক'রে স্থানীয় সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। পুণ্ডরীক বংশীয়েরা নানা হিতকর কার্যে অংশ গ্রহণ ক'রে জনসাধারণের সম্মান লাভ করেন। প্রধানতঃ এ কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর এই বংশের ইতিবৃত্ত রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে এর পিছনে আরও বৃহত্তর আদর্শবোধ কার্যকরী ছিল বলে মনে হয়। মনে হয়, স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস রচনার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে এই কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

> "শুনিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য দেশে অতি ক্ষুদ্র গ্রামেরও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; ক্ষুদ্র গৃহস্থ পরিবারও আপনার ইতিবৃত্ত সযত্নে রক্ষা করিয়া স্পর্দ্ধা বোধ করে। বাঙ্গালাদেশে সে রীতি নাই।"

অতএব, অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা চলে, এই বংশপঞ্জী রচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালী জাতিকে স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-রচনায় অনুপ্রাণিত করে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বহু প্রবন্ধে ও অভিভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-রচনার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার কোথাও বা তিনি ভারতীয় ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস-রচনার উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩১২) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, ভারতবর্ষের ইতিহাস মূলতঃ রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাস নয়, তা' হল সমাজতন্ত্রের ইতিহাস। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য-রাশির মধ্যেই এই সামাজিক ইতিহাস-রচনার উপাদান ছড়িয়ে আছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে

আমাদের সেই উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। তাই বলে রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসকে একেবারে উপেক্ষা করলে ভারতবর্ষের ইতিহাসও যথাযথভাবে রচিত হতে পারে না। কেন পারে না, তা' বোঝাতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের রাজার সঙ্গে প্রজার বিশেষ ধরনের যোগসূত্রটির কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এ দেশের রাজা ধর্মের সংস্থাপক যেমন নন, তেমনি নন ব্যবস্থাপকও। কিন্তু রাজা ধর্মের রক্ষাকর্তা ; এ কথা শাস্ত্রেও স্বীকৃত হয়েছে। অতএব, ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা চলে না ; এই হল রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত।

আমাদের দেশের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য-নির্ধারণে যেমন, উপকরণ-সংগ্রহেও তেমনি রামেন্দ্রসুন্দরের অকৃত্রিম আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজসাহীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদত্ত তাঁর অভিভাষণটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৩১৫ সালের ১৮ই মাঘ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ঐ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি-তত্ত্ব নিরূপণের জন্য উত্তরবঙ্গ থেকে উপকরণ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে অনুরোধ জানান। বাঙ্গালীর ইতিহাস-রচনার আবশ্যকতা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য নিয়েও এখানে আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা আছে। অভিভাষণের এক জায়গায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,

> আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেশের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ এখনও দেশের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে সেই উপকরণ সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে দেশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে।

স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস-রচনার জন্যে রামেন্দ্রসুন্দরের এই ঐকান্তিক আগ্রহ জাতীয়তাবোধ থেকে উদ্বুদ্ধ। ঐ অভিভাষণেরই অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে,

> এই ইতিহাস সংকলনে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আমরা অতিথি ও ভিক্ষুকরূপে আপনাদের দ্বারদেশে আজ আঘাত করিতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন যেথায়, যে জেলায় উপস্থিত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে করাঘাত করিবে, তখন সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া আমরা আমাদের প্রার্থনা জানাইব। সকলের সমবেত চেষ্টায় আমাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দমান বাঙ্গালী জাতির, জাতীয়তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি প্রকাশিত হইবে। সেই উৎস হইতে ধারাসেচনে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া আমাদের জাতীয়তা কলনাদিনী স্রোতস্বতী তরঙ্গিণী পদ্মার প্রাবৃট্‌কালের বিপুল কায় ধারণ করিবে, সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের জাতীয় ভাবের সুরম্য হর্ম্য গগনমূলে উঠিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে।

স্বজাতির ইতিহাস-রচনার আবশ্যকতাকে কেন্দ্র করে রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ অপর কোনো কোনো অভিভাষণেও সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত আচার্য ত্রিবেদীর অভিভাষণের অংশবিশেষ স্মরণ করা যেতে পারে। সম্মেলনটি ভাগলপুর সহরে ১৩১৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে

'রমেশ-ভবন'[১] স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন,

> আমরা আমাদের বঙ্গভূমির সহিত পরিচিত হইতে চাহি। যাঁহার অঙ্কে আমাদের সূতিকাগৃহ ও যাঁহার ক্রোড়ে আমাদের শ্মশান, যাঁহাকে জননী বলিয়া ডাকিয়া আমরা প্রাণের তিয়াষ মিটাইতেছি, তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে আমরা পরিচিত হইতে চাহি।

এই অভিভাষণেরই অপর এক জায়গায় রামেন্দ্রসুন্দর দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, স্বজাতির ধ্যান-ধারণা ও ইতিহাসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় না ঘটলে আমাদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম জাগতে পারে না। বহুযুগ সঞ্চিত জাতীয় দুঃখ-দৈন্যকে দূর ক'রে জাতীয়তার উৎস-সন্ধান করতে হলে সুকঠোর সাধনার প্রয়োজন। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়,

> যে স্বজাতির সহিত অন্তরঙ্গভাবে, একাত্মভাবে পরিচয় ব্যতীত আমাদের জাতীয়তা বুদ্বুদের ন্যায় অলীক পদার্থে পরিণত হইবে, সেই স্বজাতির সম্বন্ধে, সেই স্বজাতির ঘরের কথা ও বাহিরের কথা সম্বন্ধে আমরা কতটুকু সন্ধান রাখি ?
> সন্ধান রাখি না, কিন্তু এখন হইতে সেই সন্ধান রাখিতে হইবে। আমার বিবেচনায় সেই সন্ধানের জন্যই আমরা দল বাঁধিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের জন্য ভগীরথকে যেমন তপস্যা করিতে হইয়াছিল, আমাদের জাতীয়তার উৎস-সন্ধানের জন্য তেমনি কঠোর তপস্যার সময় আসিয়াছে ; যুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জনা ও পাপপঙ্ক যদি ধুইয়া ফেলিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ;

এখানে উল্লিখিত তপস্যা যে জাতির যথার্থ ইতিহাস-রচনার তপস্যা অভিভাষণের পরবর্তী অংশে তা' বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ভারতীয়দের ইতিহাস-বিমুখতার কথা রামেন্দ্রসুন্দর অন্যত্রও বলেছেন। বিনয়কুমার সরকার প্রণীত 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধে'র ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন, 'অন্য দেশে যাহাকে ইতিহাস বলে, এ দেশে তাহা নাই। অতীতের তত্ত্ব এ দেশ রাখিতে চাহে না।'

৪

এদেশীয়দের এই ইতিহাস-বিমুখতাকে মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই রামেন্দ্রসুন্দর চেয়েছিলেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌কে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীর সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে। দেশীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কোনো কিছুকেই উপেক্ষা করেন নি তিনি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেশীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়েও সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন দেশীয় কোনো কোনো দেব-দেবীর প্রসঙ্গ নিয়ে। উদাহরণ হিসেবে 'গণেশপূজা' (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১০), 'গণেশ প্রসঙ্গ' (বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১০) ও 'গ্রামদেবতা' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৩১৪) শীর্ষক প্রবন্ধ তিনটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। 'রমেশ-ভবন' এই শিরোনামায় এই অভিভাষণটি ১৩১৬ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব থেকে গণপতি আমাদের দেশে পূজা পেতেন ; ঋগ্বেদ-সংহিতা এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী উপনিষদ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে রামেন্দ্রসুন্দর 'গণেশ পূজা'য় একথা প্রতিপন্ন করেছেন। 'গণেশ প্রসঙ্গে' দেখি, পুরাতত্ত্বের বিচারে রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালী অনুসরণ করেছেন। 'গ্রামদেবতা' শীর্ষক প্রবন্ধে জেমো-কান্দি নামক গ্রামের গ্রাম্য দেবতার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেই সঙ্গে জেমো-কান্দির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রবন্ধটির ভূমিকা হিসাবে উপস্থাপিত।

৫

এই জেমো-কান্দির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (এপ্রিল ১৯০৬) রচনার ইতিহাস। এই রচনাটির এবং এই শ্রেণীর অপরাপর রচনার বৈশিষ্ট্য হল, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেম।

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনার একটি ইতিহাস আছে। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো-কান্দি গ্রামের পাঁচ শতাধিক নরনারী রামেন্দ্রসুন্দরের মায়ের আহ্বানে তাঁদের বাড়ীর বিষ্ণু-মন্দিরের আঙ্গিনায় সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে রামেন্দ্রসুন্দরের কন্যা গিরিজা দেবী 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ করেন।

দেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দরকে যাঁরা জানতে চান, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ করতে অনুরোধ করি তাঁদের। কী ভাষার প্রসাদগুণ, কী উদাত্ত ভাব, কী একনিষ্ঠ স্বাদেশিকতা, সব দিক দিয়েই এই রচনাটি রামেন্দ্র-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন।

গঙ্গাবিধৌত শস্যশ্যামলা বাংলা দেশের বন্দনা দিয়ে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা সুরু। তারপর বলা হয়েছে, কলিযুগে অধর্মাচার থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে আদিশূরের চেষ্টার কথা। পরবর্তী অংশে লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাংলায় মুসলমানের আগমন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা বলা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্যে হোসেন শাহ যে চেষ্টা করেছিলেন, তা'রও বর্ণনা আছে এখানে। আর আছে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কথা। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে হিন্দু-মুসলমানে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের প্রসঙ্গ। ব্রতকথার পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, আলমগীরের রাজত্বকালে কীভাবে বাংলায় আবার অশান্তি দেখা দিল ; কীভাবে সুরু হল বর্গীর হাঙ্গামা। তারপর ইংরেজদের আগমন ও বাংলা অধিকারের কথা, তাঁদের শোষণ-শাসনের কাহিনী এবং বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতা ও অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তির কথা অপরূপ সহজ-সুন্দর ভাষায় বর্ণিত। তারপর ইংরেজদের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবার কীভাবে ভেদাভেদ ও কলহ সুরু হল, সে কথা বলা হয়েছে। এই অবধি হল ব্রতকথার ভূমিকা-পর্ব। এরপর এসেছে মূল প্রসঙ্গ ; বিদেশী ইংরেজদের চক্রান্তে বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগ এবং বাঙ্গালীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করার দুরভিসন্ধির কথা। এই কথার পৃষ্ঠপটেই বাঙ্গালীর একতার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাঙ্গালী যে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হল, পরানুকরণ ভুলে স্বাদেশিকতার দীক্ষা নিল, সে কথা। এই প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত, বাঙ্গালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বলেই বঙ্গভঙ্গকে রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন, বাংলার মেয়েরা

অরন্ধন-ব্রত পালন করেছিল। সেদিনই হয়েছিল রাখীবন্ধন উৎসব। তারপর বঙ্গলক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে এবং স্বজাতিপ্রীতি ও আত্মনির্ভরশীলতার শপথ গ্রহণ করে ব্রতকথা শেষ হয়েছে। ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিনের অরন্ধন ও রাখীবন্ধন উৎসবকে রামেন্দ্রসুন্দর একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রতি বৎসর এই দিনে, শান্ত-শুভ্র অনাড়ম্বর পরিবেশে এই উৎসব হবে এবং এ থেকে বাঙ্গালী স্বাদেশিকতার দীক্ষা নেবে, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। নীচে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।

বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ব-বাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগ্‌ল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরমসুখে বাস করতে লাগ্‌ল।

এমন সময় মর্ত্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্মকর্ম ছাড়্‌তে লাগ্‌ল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙ্‌লা ছাড়্‌তে হ'ল।

কীরূপ সহজ-সুন্দর চলিত ভাষায়, সর্বসাধারণের বুঝবার উপযোগী করে রামেন্দ্রসুন্দর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখেছিলেন, তা' এই উদ্ধৃতাংশটি থেকেই স্পষ্ট হবে।

স্বদেশ ও সমাজ বিষয়ক কোনো কোনো রচনায় আমাদের সামাজিক দোষক্রটি প্রতিকারের উপায় নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৪) শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩১৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামক প্রবন্ধটি পড়ে রামেন্দ্রসুন্দর এই রচনাটি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে দেশের লোককে স্বাবলম্বী হয়ে কাজে নামবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। অপর দিকে ইংরেজ-শাসিত তৎকালীন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রশ্ন তুলেছিলেন, কাজ করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের আছে কি? এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের মূল বক্তব্য হল, পরের উপর কর্মের ভার অর্পণ করায় অথবা পরে আমাদিগকে কর্মভার থেকে অব্যাহতি দেওয়ায়, আমরা যে কেবল কর্মক্ষমতা ও কর্মপটুতা হারিয়েছি, তা' নয়; আমরা কর্মে প্রবৃত্তি পর্যন্ত হারাতে বসেছি। আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের পরিচালক পেশীগুলিই যে কেবল জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, তা' নয়; আমাদের স্নায়ুযন্ত্র পর্যন্ত বিকৃত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এই অসহায় ও পঙ্গু অবস্থা থেকে তৎকালীন সমাজজীবনকে মুক্ত করারও পথ-নির্দেশ করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছিলেন, ভাবের বৈদ্যুতীপ্রয়োগে সেই পক্ষাঘাত দূর করা আবশ্যক। এই ভাব হচ্ছে

জাতীয় ভাব। এরই অনুপ্রেরণায় মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়, অসাধ্য সাধন করে। সমাজে জাগে নূতন প্রাণের প্রবাহ।

৬

কিন্তু মনে যেন রাখি, আমাদের সমাজের বাস্তব-সমস্যা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর কোনোদিনই উদাসীন ছিলেন না। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর ইংরেজী সভ্যতার আকস্মিক আঘাত কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তা' নিয়ে তিনি বরাবরই ভেবেছেন। বরাবরই তিনি চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলোকে বোঝাতে। সে কারণেই জীববিজ্ঞানের প্রয়োগ করে সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজবিজ্ঞান ব্যাখ্যায় জীববিজ্ঞানের সূত্র প্রয়োগের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'বিচিত্র প্রসঙ্গ—২য় পর্যায়' (১৩৩৪)। তবে সাহিত্য-সাধনার প্রাথমিক পর্বেও যে রামেন্দ্রসুন্দর অনুরূপ রীতিতে সমাজবিজ্ঞান আলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন, তা'র প্রমাণ পাই 'বৈদেশিক সভ্যতা' (নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯৪) শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে। দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার প্রকাশ এই প্রবন্ধেই প্রথম দেখা গেল। তবে রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি তখনও বৈদিক সভ্যতার প্রতি আকর্ষিত হয় নি। দর্শনের কুয়াশাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে তখনও যাত্রা সুরু করেন নি তিনি। এ প্রবন্ধে তাঁর দৃষ্টি তাই পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকের। তাই বৈদেশিক সভ্যতা আমাদের গ্রহণীয় কি না, এ প্রবন্ধে তা' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিবর্তনবাদের সাহায্যে তিনি তাঁর নিজমতকে সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। দেখিয়েছেন, প্রাণিশরীরের ক্রিয়া যে যে সাধারণ নিয়মে সম্পাদিত হয়ে থাকে, সমাজ-শরীরও সেই সেই নিয়মের অনুযায়ী। আলোচ্য প্রবন্ধে জীবদেহের সাতটি নিয়ম ব্যক্ত করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। সমাজদেহের উপরেও যে এই নিয়মগুলো অক্ষরে অক্ষরে খাটে, তা' কিছু সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; এবং ব্যাখ্যার শেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা' হ'ল এই যে, কাঠিন্য ও তারল্যের সমবায়েই জীবশরীর ও সমাজশরীর গঠিত হওয়া আবশ্যক; পরিবর্তনের একান্ত অভাবও বিকাশের অন্তরায়। কিন্তু পরিবর্তন যদি ধীরগতিতে আসে, তবেই বিবর্তন ও বিকাশ। পরিবর্তনের বেগ প্রবল হলেই ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক; অর্থাৎ, বৈদেশিক সভ্যতার তরঙ্গ প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ভিত্তির উপর যে আঘাত করছে, তা' থেকে যদি আকস্মিক পরিবর্তন আসে, তবেই শঙ্কার কথা।

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-সাধনার মধ্যযুগে দেখি, সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় শুধুমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছেন না তিনি, দেশীয় সাহিত্য, দেবদেবী, ধর্ম-কর্ম এমন কি লোকসাহিত্যের মধ্য থেকেও আলোচনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন। 'ব্রতকথা'র (১৩১৯) ভূমিকায় লিখেছেন,

> বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের সঙ্কলনকার্যে এই ব্রতকথাগুলির স্থান কত উচ্চে, তাহা এখনও সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এইরূপ সঙ্কলন প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর গ্রাম্য-সাহিত্যের পুষ্টিসহকারে বাঙ্গালার সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে।

রামেন্দ্রসাহিত্য-সাধনার একেবারে শেষ-পর্বে দেখি, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পটভূমিকায় বৈজ্ঞানিকের চশমা চোখে পরে সাহিত্যিক-দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর সমাজতত্ত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করছেন। রামেন্দ্র-মনীষার এই বিস্ময়কর দিকটি বোঝাতে গিয়ে আমরা 'বিচিত্র প্রসঙ্গ—২য় পর্যায়' নিয়ে আলোচনা করব। ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিশেষ করে সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস-চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনার গুরুত্বও তিনি স্বীকার করতেন। ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে নিজস্ব এই বিশ্বাস ও অভিরুচি অনুযায়ী তিনি বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেন। কিন্তু আলোচনা শেষ হবার পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়। তবে সমাজ ও ইতিহাসের যে যে বিষয় নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, বিপিনবাবু সেগুলো লিখে রাখেন। পরে সেই আলোচনা 'বিচিত্র প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় পর্যায়' নামে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বিচিত্র প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায় অসম্পূর্ণ প্রকৃতির রচনা। কারণ, আগেই বলেছি, এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ হবার পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দর পরলোকগমন করেন। ভারতীয় সমাজের যে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, তুলনামূলক আলোচনার পর সে সম্বন্ধে কোনোরূপ সিদ্ধান্তে রামেন্দ্রসুন্দর পৌঁছুতে পারেন নি। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনার মাঝপথেই তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব, এ পর্যায়ের বিচিত্র প্রসঙ্গের বৈচিত্র্যকে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করা সম্ভব নয়। বৈচিত্র্যের খণ্ডিতাংশ নিয়েই পাঠককে এখানে পরিতুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, একদিকে সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব এবং অপরদিকে রাষ্টতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ও ইতিহাসে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও সুস্থ জীবন-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলার মননধর্মী সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে তা' এক স্মরণীয় সম্পদ।

বিচিত্র প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়ের প্রথম প্রসঙ্গটি হল জীববিজ্ঞান। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে সমাজতত্ত্বের আলোচনায় জীববিদ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। সমাজকে যন্ত্রবদ্ধ Organised Structure বলে ধরে নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেছেন। সমাজ যে জীবন্ত, গোড়াতেই একথা মেনে নিয়ে তিনি এখানে আলোচনায় এগিয়েছেন। আলোচনা সুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র ট্র্যাজেডীকে কেন্দ্র করে। গোরা আসলে এক আইরিশ-ম্যানের ছেলে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিল। নিজেকে সে ব্রাহ্মণ বলেই বরাবর জানত। হিন্দু-সমাজের আচার-আচরণের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। কিন্তু যেদিন গোরা তার বংশপরিচয় জানল, সেদিন তার জীবনের ভিত্তিমূলই শিথিল হয়ে পড়ল। সে জানল, হিন্দুসমাজে তার কোনো স্থান নেই। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য, গোরার এই ট্র্যাজেডী আধুনিক হিন্দুসমাজের একটা বড় সমস্যা। যে ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে আমাদের আপনার হতে চায়, আমাদের হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারে না। হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার প্রবল চেষ্টা, আমাদের এই

যে সামাজিক exclusiveness, একে রামেন্দ্রসুন্দর গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছেন। তারপর তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, কেন এমন হল? আমাদের এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে কি? রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা, সামাজিক-স্বাতন্ত্র্যের মূল অনুসন্ধান করতে হলে সমাজ কেমন করে গড়ে উঠল, তা' জানতে হবে। জানতে হবে সমাজের অতীত ইতিহাস। কি কি কারণে বিভিন্ন আচার-বিচার সমাজের অঙ্গীভূত হল, রামেন্দ্রসুন্দর তা' নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, এজন্যে প্রয়োজন Scientific Study of History; অন্যান্য সমাজেও এরকম ঘটেছে কি না, তা' তুলনা করে দেখা আবশ্যক বলেই তিনি মনে করেন। এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বিশিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি মনে করতেন, যদি দেখা যায়, অন্যত্রও এরূপ ঘটেছে, তা' হলে আমাদের মনকে কিছুটা প্রবোধ দিতে পারব; আর এ ধরনের ঘটনা সত্ত্বেও যদি অন্যান্য জাতি উন্নতি করে থাকে, তা' হলে বুঝতে হবে আমাদের উন্নতির আশা আছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই রামেন্দ্রসুন্দর নিজের মনকে প্রবোধ দিতেন।[১] মনে হয়, একদিকে বিজ্ঞান-চর্চায় অনুরাগ এবং অপরদিকে সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল থাকার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দরের এরূপ স্বভাব দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যা'ই হোক, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাস-চর্চার মাধ্যমে হিন্দুসমাজের স্বাতন্ত্র্যের মূল নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞান-চর্চার বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি এখানে কয়েকটি বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান-চর্চায় যে রাগক্ষোভের স্থান নেই,—মঙ্গল-অমঙ্গল, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত না দেখে বিজ্ঞান যে অন্বেষণ ক'রে কারণ-নির্দেশে রত থাকে, পূর্বাপর সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে কার্য-কারণ-সম্পর্ক নিরূপণ করাই যে বিজ্ঞানের কাজ, কি হলে ভাল হত, তা' নিয়ে প্রশ্ন নয়, যা' হয়েছে তা'র শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করাই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কাজ, এ ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে আমরাও একমত। এ ছাড়া স্পেনের রাজার জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়নের যে কাহিনীটি এখানে আছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তা' খুবই সুপ্রযুক্ত।

আলোচনার পরবর্তী অংশে রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্লেষণ-প্রণালী আমাদের মুগ্ধ করে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যে মানব-সমাজকে যন্ত্র হিসাবে দেখেন এবং জীবদেহের সঙ্গে তুলনা ক'রে মানবসমাজ-দেহকেও যে যন্ত্রবদ্ধ Organised Structure বলা হয়, সে কথা উল্লেখ ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, "জীবের ব্যক্তিগত জীবনটা যেমন তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস, তাহার জাতিগত জীবনটাও সেইরূপ পরিবর্তনশীল environment-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস।" এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সুস্পষ্ট অভিমত হল, যুগ-যুগান্তর ধরে এরূপ ঘটছে বলেই নূতন নূতন জাতির উদ্ভব হচ্ছে। যে জাতি অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারছে, সে জাতিই টিকছে। আর যে পারছে না, সে মরছে। সমাজ ও জাতির এই বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এবং জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের তুলনামূলক আলোচনার কালে রামেন্দ্রসুন্দর জীবনতত্ত্বের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন। হার্বার্ট স্পেন্সারের মত

১. রামেন্দ্র-রচনাবলী; ২য় খণ্ড। বিচিত্র প্রসঙ্গ—পৃঃ ৪৪৭।

অনুযায়ী জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন প্রথমে। তারপর জড়-জীবে নিরন্তর সংগ্রামের কথা উল্লেখ ক'রে অতি সুন্দরভাবে তিনি বুঝিয়েছেন যে, সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টাই জীবন এবং অসামঞ্জস্য থেকেই জরা, দুঃখ ও মৃত্যুর উদ্ভব। মানবদেহের পূর্ণ সামঞ্জস্যের অভাবই অমঙ্গলের হেতু, জীববিজ্ঞানী মেচ্‌নিককের এই অভিমত নিয়ে আলোচনায়ও রামেন্দ্রসুন্দর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে দার্শনিক নয়, জরা ও মরণ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। সে কারণেই দেখি, সুদীর্ঘ অন্ত্রনাড়ী যে জরার অন্যতম কারণ, তা' নিয়ে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে। যা'ই হোক, জীববিজ্ঞানের আলোকে সমাজদেহকে বুঝতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর জীবদেহ সম্বন্ধে এখানে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা' হল এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে জীবের আভ্যন্তরিক অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক নয়। জীব তখন রক্ষণশীল। বাইরের পরিবর্তন হলে এই রক্ষণশীলতার পরিবর্তন আবশ্যক হয়, Variation-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তা' না হলে সামঞ্জস্য-রক্ষা হয় না। প্রথমটিকে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, স্থিতিশীলতা। অপরটিকে বলেছেন সামঞ্জস্যপ্রয়াস। জীববিদ্যায় প্রথমটির নাম Heredity বা বংশানুক্রম। অপরটির নাম Variation বা ব্যতিক্রম। রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন, এই দু'টি principle-কে সত্য বলে মেনে নিয়ে আধুনিক কালের জীববিজ্ঞানীরা অভিব্যক্তিবাদের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন। এই Variation কেন হয়, তা' নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এখানে জীববিদ্যা-সংক্রান্ত কয়েকটি মতের উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। লামার্ক, ডারুইন্, গ্যালটন, ওয়াইজমান, ডি. ভ্রিস ও মেণ্ডেলের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। সন্দেহ নেই, এদের অভিমত কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী এবং অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই সকল অসম্পূর্ণ তত্ত্বকেই মানবজাতিতত্ত্বে, এমন কি সমাজতত্ত্বেও প্রয়োগ করা হয়েছিল। সে কারণেই উল্লিখিত বিজ্ঞানীদের অভিমত নিয়ে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয় নি। বরং মানুষের দেহের মতো সমাজদেহটাও একটা যন্ত্র—এ কথা আজ একটি স্বীকৃত সত্য বলে জীবদেহের ও জীবধর্মের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা এখানে যুক্তিযুক্তই হয়েছে। তা' ছাড়া এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন, সমাজ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে শাসনযন্ত্র, শিক্ষাযন্ত্র ইত্যাদির ন্যায় নানাপ্রকার organ আপনার থেকেই সৃষ্টি করে নেয়। এই সব যন্ত্রের প্রত্যেকটিরই যে এক বা একাধিক function থাকে, এই স্থূল সূত্রটি রামেন্দ্রসুন্দর মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েছেন। মেনে নেবার কারণ, সমাজবিদ্যা গোড়া থেকেই এই কথাটি স্বীকার করে নিয়েছে। এমন কি, হার্বার্ট স্পেন্সারের মত মনীষীও সমাজদেহের বহুবিধ অংশের সঙ্গে যে জীবদেহের মিল আছে, তা' সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখিয়েছেন। যা'ই হোক, সমাজ তার স্বাতন্ত্র্য রাখবার জন্য বাইরের অবস্থার কতটুকু সার বলে গ্রহণ করবে, এবং কতটুকু অসার বলে দূরে রাখবে, এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করাই এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বাতন্ত্র্য কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন জীববিজ্ঞানের সাহায্যে। স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত হল, জীবজগতে স্বাতন্ত্র্যের মাত্রাভেদ দেখা যায়। জীববিজ্ঞানীর বিচারভূমিতে বসে তিনি যথার্থই বলেছেন, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা

কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবনের অনুকূল। আবার কোথাও বা পরের সঙ্গে মিশ্রণই জীবনের অনুকূল। উচ্চ পর্যায়ের জীবে স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়; নিম্ন পর্যায়ে সেটা অপরিস্ফুট—রামেন্দ্রসুন্দরের এই বিজ্ঞাননির্ভর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরাও একমত। কেননা, নিম্নতম শ্রেণীর জীবের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার বড় অস্ত্র Nervous Systemও নেই, চেতনাও নেই। উচ্চ পর্যায়ের জীবের মধ্যেই এই দু'টিকে পাওয়া যায়। সেখানে আমরা দেখি, চেতনার কাজ হল জানা। এর চরম পরিণতি Self-Consciousness অর্থাৎ আপনাকে জানা। দার্শনিক পরিভাষায় একেই বলা হয় অহঙ্কার। মানুষের মধ্যেই দেখা যায় এই অহঙ্কারের বা 'অহং জ্ঞানের' পূর্ণ পরিণতি। এরই বলে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র ক'রে সেই জগৎটাকে "নিজেরই জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় এবং কর্মক্ষেত্র" বলে মনে করে। জীববিজ্ঞানীর চশমা চোখে পরে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, "এই অহং-জ্ঞানটাই জীবের স্বাতন্ত্র্যের চরম পরিণতির পরিচায়ক।" আচার্য ত্রিবেদী এখানে দার্শনিক বিচারপ্রণালী অনুসরণ করেন নি বলেই গোড়ায় 'আমি'কে স্বীকার করে ,নিয়ে তা' থেকে বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করেন নি। সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণে জীববিদ্যাকে প্রয়োগ করাই এখানে তাঁর উদ্দেশ্য। সে কারণেই যেটা জীবনের সাধারণ লক্ষণ,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার চেষ্টা, এবং "এই আত্মরক্ষার ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উদ্দেশ্যে জীবনসংগ্রাম ও তাদ্বারা জীবনের ক্রমবিকাশ, ক্রমোন্নতি ও অভিব্যক্তি," সেটাকে আমরা নির্ভয়ে সহায়রূপে গ্রহণ করে সমাজবিদ্যার আলোচনায় প্রয়োগ করতে পারি বলে তিনি মনে করেন। তবে এই সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মানুষের ইতিহাস আলোচনার কালে কেবল তার স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা দেখলেই চলবে না; তার উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সামাজিক ইতিহাস-চর্চা সম্বন্ধে এই হল রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত। তিনি জীববিদ্যার আশ্রয় নিয়ে য়ুডীয়, গ্রীক, রোমক ও ইসলাম-সভ্যতার আলোচনার পর এদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ আলোচনা সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে গ্রীক, হিব্রু বা ইহুদী সভ্যতা নিয়ে যতটুকু আলোচনা তিনি করেছেন, তা' থেকে আমরা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি, কি ভাল, কি মন্দ, কি উচিত আর কি অনুচিত তা' নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি তিনি, কোন্ পথে গেলে জীবসমাজের কল্যাণ হবে, তা' নিয়েও কিছু উপদেশ দেন নি; নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জগৎ-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার চিত্রটিকেই তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই সমাজ-ধর্ম চিত্রণে সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত।

বিচিত্র প্রসঙ্গের পরবর্তী প্রসঙ্গ 'হিব্রু'তে জীববিজ্ঞানীর বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদী জাতির ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। অনেকগুলো স্বতন্ত্র যাযাবর-সম্প্রদায় কেমন করে একটা জাতিতে পরিণত হল, সেই জাতি জগৎকে কি দিয়ে গেল, কেমন করে সে জাতি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল, কেমন ক'রে সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বিরোধ করতে বাধ্য হয়েও একটা সামঞ্জস্য-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল, এবং কেমন করেই বা বিভিন্ন হিব্রু tribe-গুলি সংহত হয়ে একটা নেশনে পরিণত হতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন

হয়ে গেল, প্রধানতঃ জীববিজ্ঞানের সূত্র ধরে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে তা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। হিব্রু জাতি ও সমাজের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হল, সর্বত্রই হিব্রু তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে নিজেকে অচলায়তনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। প্রবল খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে থেকেও প্রায় দু' হাজার বৎসর ধরে সে আপনাকে রক্ষা করতে পেরেছে। সে কারণেই হিব্রু তার দেবতা ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে আজও উন্নত শির নিয়ে বেঁচে আছে। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন, হিব্রু-সমাজের জীবনীশক্তি তার অচলায়তনের মধ্যেই পুঞ্জীভূত।

বিচিত্র প্রসঙ্গের সর্বশেষ প্রসঙ্গ 'ইহুদি ও গ্রীক'-এ রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বক্তব্যকে বৃহত্তর ঐতিহাসিক পটভূমির উপর উপস্থাপিত করেছেন। তবে এখানে দেখি, শুধুমাত্র জীব-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো ধরেই তিনি মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য-বিচার করেন নি। মানুষের জীবধর্মের পশ্চাতে "Will to live" নামে যে জিনিসটি আছে এবং যা' সাধারণ জীববিজ্ঞানে ধরা পড়ে না, তা' কোথা থেকে এল ও কিভাবে উৎপন্ন হল, সে কথা বুঝতে চেয়েছেন। কারণ, রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মানুষের সামাজিক ইতিহাসের চরম কথা এই "Will to live"-এর মধ্যেই নিহিত। একে না বুঝলে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম-জীবনের সত্যিকার পরিচয় লাভ করা সম্ভব হবে না। যা'ই হোক, মানবসমাজধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যে গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, গ্রীসীয় বা হেলেনীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে যে সত্যদ্রষ্টার ভূমিকায় তিনি এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন, উচ্চাঙ্গের মননশীল আলোচনার তা' এক বিশিষ্ট নিদর্শন।

রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশ ও সমাজ বিষয়ক রচনাগুলো নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, সাহিত্যিক মূল্য তো এদের আছেই, তা' ছাড়া আছে রাষ্ট্রনৈতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য। এ রচনাগুলো পাঠ করলে একদিকে যেমন জাতীয় ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি আমাদের অধঃপতিত মাতৃভূমির মুক্তি-পথেরও নিশানা মেলে।

সপ্তম অধ্যায়

আচার্যের শিক্ষা-চিন্তা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাধারার কথা বলা হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, সংস্কৃতিরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ শিক্ষা।

আদর্শ শিক্ষাব্রতী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন তিনি। কিন্তু ছকে বাঁধা যান্ত্রিক শিক্ষা কোনোদিন তাঁকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা-ধরা শিক্ষাক্রমকে শিক্ষার আদর্শ বলে কোনোদিনই তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। যে শিক্ষা সত্যিকারের মানুষ তৈরী করে, জাতীয় জীবনের কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্ধকার দূর ক'রে জাতিকে নূতন আলোর সন্ধান দেয়, তিনি ছিলেন সেই শিক্ষার পক্ষপাতী। ইংরেজী শিক্ষার অসম্পূর্ণতার চিত্র বারবার তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আদর্শ শিক্ষা কী এবং কিভাবে তা' বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তাঁর সমসাময়িক সমাজজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা' নিয়ে অনেক প্রবন্ধেই তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার দোষত্রুটি কোথায়, এবং সে সব ত্রুটি দূর করার উপায়ই বা কী, তা' নিয়েও কয়েকটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ তিনি তৎকালীন সাময়িক-পত্রে লিখেছিলেন। সেই সকল প্রবন্ধের কয়েকটি 'নানা কথা'য় সংকলিত হয়েছে। সাময়িক-পত্রে ছড়ান শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য রচনাগুলো সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ঐ সকল প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, রামেন্দ্রসুন্দর চেয়েছিলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যন্ত্রের মতো প্রাণহীন না হয় যেন। সেখানে যেন থাকে প্রাণশক্তির পরিচয়। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার মানে এই নয় যে, তিনি শিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সম্মিলনই তাঁর কাম্য ছিল। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিই হল তাঁর শিক্ষাদর্শের বৈশিষ্ট্য। সে কারণেই লোকশিক্ষার সমর্থক ছিলেন তিনি। কিন্তু শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার না ক'রে লোকশিক্ষা চালু করার সুফল সম্বন্ধে সংশয় ছিল তাঁর। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষাদান-পদ্ধতির ব্যর্থতাই তাঁকে প্রথমে ভাবিয়ে তোলে।

১

বিদেশী শিক্ষার ব্যর্থতার মর্মান্তিক চিত্র আছে 'নানা কথা'র কোনো কোনো প্রবন্ধে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম' (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০২) শীর্ষক রচনাটি। সরস ও তীব্র ব্যঙ্গোক্তি এই রচনাটিকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙতে শিখেছি, কিন্তু

গড়তে শিখি নি। শিক্ষার সামগ্রী আমাদের প্রচুর মিলেছে। কিন্তু সেগুলো গ্রহণ করে কাজে লাগাতে পারি নি আমরা। আমরা শুধু অন্ধভাবে অনুকরণই করেছি ; নিজেরা নতুন কিছু গড়তে শিখি নি। এজন্যে রামেন্দ্রসুন্দর ইংরাজী বিদ্যাকে দায়ী করেন নি। এমনকি আমাদের জাতীয় চরিত্রকেও দোষী সাব্যস্ত করেন নি। দায়ী করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীকে। তাঁর অভিমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর মূলে যে দোষ বর্তমান আছে, তা'র সংস্কার না হলে কোনোরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নেই। তবে কোন্ দিকে সংস্কার চলতে পারে, এ প্রবন্ধে তা' নিয়ে তিনি কিছু বলেন নি। ইংরাজী শিক্ষার অসম্পূর্ণতার চিত্রকেই তিনি এখানে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন এবং তা' করতে গিয়ে খুব প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যর্থতার কথা। বিজ্ঞানশিক্ষার নামে আমরা কী শিখছি, এ শিক্ষায় আমাদের পিছিয়ে থাকার কারণ কী, বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতিই বা কেমন করে করা যেতে পারে, অতি অল্প কথায় রামেন্দ্রসুন্দর এখানে তা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি স্মরণীয়। এ থেকে আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির স্বরূপ ও আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর কিভাবে চিন্তা করতেন, তা' খুব স্পষ্টভাবে জানা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,

> আমরা বিজ্ঞান শিখিতেছি সত্য ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ধাতু আমাদের শোণিতে এখনও আসে নাই। বিজ্ঞানের নামে আমরা আটখানা হই ; কিন্তু আমরা যাহা শিখি, তাহা মোটের উপর উপবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞান। মানুষের চুল তাড়িতের পরিচালক নহে শুনিবামাত্র আমরা লম্বা লম্বা টিকি রাখিতে আরম্ভ করি ; এবং চন্দ্রের অবস্থান-ভেদে জোয়ার ভাটা হয়, পাঠ করিবা মাত্র কোষ্ঠী গণাইতে বসি। এমন শোচনীয় অবস্থা কি হয়!
>
> বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না। মস্তিষ্কে কতকগুলো মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া যথাবিন্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি ও তাহা হইতে লম্বা চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। খাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয় ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া' লাগাইয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক লম্ফে সাগর পার হইতে চাই, সেতু-বন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবা মাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ভবের দেরী সহে না।

২

আদর্শ শিক্ষা কী, এবং কিভাবে তা' বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, তা' নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা আছে 'নানা কথা'র কোনো কোনো প্রবন্ধে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'শিক্ষাপ্রণালী' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) শীর্ষক প্রবন্ধটি। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে হাল্কা সুরে

গভীর কথা বলেছেন। সরস বর্ণনারীতি, জায়গায় জায়গায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি এবং সুন্দর বিজ্ঞান-নির্ভর উপমা এ প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য। আমাদের শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত এবং কিভাবে সেই আদর্শকে কার্যকরী করা যায়, তা' নিয়ে আচার্য ত্রিবেদী এখানে গভীর ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার ভূমিকা হিসেবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি ধারণার কথা প্রথমে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন, আমাদের বিদ্যালয়ে ধর্মহীন ও নীতিহীন শিক্ষা দেওয়া হয় এবং সেজন্য আমাদের চরিত্র ভালভাবে গড়ে ওঠে না। অনেকের আবার ধারণা, শারীরিক পরিশ্রমকে বাদ দিয়ে কেবল মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকার ফলে বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ সকল যুক্তিকে রামেন্দ্রসুন্দর অস্বীকার করেন নি ; কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, শিক্ষার পরিবেশ যেখানে নেই, যেখানে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি, সেখানকার মানুষ শিক্ষালাভ করবে কেমন করে ? উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে বটে ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো শিক্ষা দেন না, পরীক্ষা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন শুধু। আর এই পরীক্ষায় সহায়তার উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়গুলো ছাত্র তৈরী করে। তাই ছাত্ররা সত্যিকারের কোনো কিছু শিখবার সুযোগ পায় না। মুখস্থ করে পরীক্ষা-বৈতরণী উত্তীর্ণ হওয়াটাই তাদের অধিকাংশের লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে আচার্য ত্রিবেদী যথার্থই বলেছেন, আমাদের দেশে শিক্ষা চলছে যান্ত্রিক উপায়ে। যন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই এদেশের আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ বা সহানুভূতি গড়ে ওঠে নি। তা' ছাড়া শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামেন্দ্রসুন্দর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যথার্থ ভালবাসার সম্বন্ধ না থাকলে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ কেবল পণ্য-বিনিময়ের ন্যায় হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। এই ধরনের পণ্য-বিনিময় মনুষ্যত্বের পুষ্টি করতে পারে না, এই ছিল তাঁর ধারণা। এর কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বাল্য-কালের উপযোগী যথার্থ শিক্ষা বলতে বিশেষ একটি মাত্র বস্তুকেই বুঝে থাকেন। "সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি"। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত, কেবল বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা সাহিত্য শিক্ষা দিলে চলবে না, যেমন করেই হোক, বালকের মনুষ্যত্ব যা'তে বিকশিত হয়, সে চেষ্টা করতে হবে। কারণ, শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন নয়, বালক যা'তে আপন চেষ্টায় শিখতে সমর্থ হয় এবং যাতে তার শিখবার আগ্রহ জাগে, সে ব্যবস্থা করার নামই শিক্ষা। এ পদ্ধতির শিক্ষাকে ধর্ম বা নীতি-বর্জিত শিক্ষা বলে রামেন্দ্রসুন্দর মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য হল, ঠিক যে উপায়ে বালকের শরীরে ও মনে বলের সঞ্চার করতে হবে, ঠিক সেই উপায়েই এক সঙ্গে ধর্মের ও নীতির বিকাশেরও চেষ্টা করতে হবে। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, যান্ত্রিকভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা বা ধর্মশিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মসঙ্গত করে তোলাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। এই ধর্ম ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা কিভাবে দেওয়া যেতে পারে, প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্দ্রসুন্দর তা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি শিক্ষকদের কাছে আবেদন করেছেন এই বলে যে, মানবসন্তান যতই দুর্বল হোক, তা'কে যেন একটা গতিহীন যন্ত্র বলে বিবেচনা না করা হয়। শিক্ষকেরা যেন মনে রাখেন, ছাত্রদের জীবন বলে একটা

জিনিস আছে। আছে মন বলে একটা পদার্থ। আর আছে কতকগুলো স্বাধীন বৃত্তি। তাই বলে এমন কথা তিনি বলেন নি যে নিয়ম বা শাসনের কোনো আবশ্যকতা নেই। তাঁর বক্তব্য হল, শাসন ও সংযম আবশ্যক হতে পারে, কিন্তু "স্বাধীন বৃত্তির একবারে সংহার"-সাধন ঠিক নয়। শিক্ষার্থীর অন্তঃকরণে যে সকল শক্তি অঙ্কুরিত হতে থাকে, সেই সকল শক্তিকে একেবারে আবদ্ধ ও সংযত না করে স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে। যতক্ষণ সে স্বাধীনভাবে চলতে থাকবে, ততক্ষণ শিক্ষক একটু দূরে ও অন্তরালে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যদি সেই শিক্ষার্থী পথ ভুলে ধ্বংসের পথে চলে, কেবলমাত্র তখনই তাকে সাবধান করে দিতে হবে। এমনকি প্রয়োজন হলে তখন কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু শিক্ষক যদি সব সময় বেত হাতে নিয়ে ছাত্রের স্বাভাবিক-চিত্ত-বিকাশের পথে গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মুক্ত জগৎ থেকে শিক্ষার্থীকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি তাঁর "নিজের কাল্পনিক জগতের একটা মিথ্যা ছবি" বাক্যের উপাদানে গড়ে তুলে তা'র সামনে উপস্থাপিত করেন, তবে তিনি শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করবেন। সেই সঙ্গে তাঁর কর্তব্যেও ঘটবে গুরুতর ত্রুটি। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত হল, শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে জগতের মধ্যে বিচরণ করতে দিতে হবে। নিত্য নূতন সামগ্রী আহরণ করে তার সামনে তুলে ধরতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর হয়ে দেখবেন না বা দেখিয়ে দেবেন না। শিক্ষার্থী নিজে চেষ্টা করে দেখবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যা'তে শিক্ষার্থীর প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও স্নায়ু জগতের বিভিন্ন পদার্থের সংস্পর্শে এসে স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয় ও পরিপুষ্টি লাভ করে। শিক্ষার্থীকে এভাবে চলতে দিলে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তা'র আগ্রহ বাড়বে ; তার জানবার কৌতূহল ক্রমশঃ প্রবল হবে। জানতে গিয়ে বারবার হয়তো বিফল হবে সে, হয়তো প্রতারিত হবে। কিন্তু এভাবে প্রতারিত হবার মধ্য দিয়েও জানবার সত্যিকারের প্রবৃত্তি জেগে উঠবে তা'র মধ্যে ; এবং এভাবে সে যে শিক্ষা পাবে, তা'কেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন যথার্থ শিক্ষা। বিজ্ঞানশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা বা হাতে-কলমে শিক্ষাকে রামেন্দ্রসুন্দর আলাদা করে দেখেন নি। যথার্থ ও সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার মধ্যেই সকল আদর্শ শিক্ষার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন তিনি। এই শিক্ষাকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষকের কর্তব্য কি হবে ও ছাত্রকে কোন্ পথে চলতে দিতে হবে, তা' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,

> তুমি গুরুমহাশয়ের ও উপদেষ্টার কঠোর মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া সহচরের মত ও বন্ধুর মত তাহার পাছে পাছে চলিতে থাক। তাহার চিত্ত যেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে না পারে ; খাদ্য সামগ্রীর অভাবে যেন তাহার পাকস্থলীর নিষ্কর্ম্মা হইবার অবসর না ঘটে, অথচ দুষ্পাচ্য ও গুরুভার পদার্থের ভারে যেন পাকস্থলী অবসন্ন হইয়া না পড়ে। সে স্বয়ং দেখিবে, স্বয়ং শুনিবে, স্বয়ং স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিবে ; এবং পরীক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বিবিধ পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে থাকিবে।

আচার্য ত্রিবেদীর মূল বক্তব্য হল, বিদ্যার্থীকে যদি স্বাধীনপথে চলে স্বাভাবিকভাবে চিত্তবিকাশের সুযোগ না দেওয়া হয়, স্নেহ ও প্রীতির মাধ্যমে যদি তার মধ্যে জানবার কৌতূহল উদ্রিক্ত না করা হয় এবং আগ্রহ ও উৎসাহ যদি শিক্ষার আনুষঙ্গিক না হয়, তবে

শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, কেবল শাসনের দ্বারা অথবা ভয়-প্রদর্শন ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করে যান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যার্থীর মানসিক উৎকর্ষ জন্মান সম্ভব নয়। শিক্ষাকে সফল করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষার্থীর প্রতি সহৃদয়তা ও সহযোগিতার মনোভাব। স্নেহের বাণী ও আশার বাণী বিদ্যার্থীকে অনুপ্রাণিত করবার ক্ষমতা রাখে।

প্রবন্ধটির উপসংহারে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, উপরের যে শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেই পদ্ধতিই প্রযোজ্য জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও। তবে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি তিনি।

৩

জাতীয় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা আছে 'নানা কথা'র অপর দু'টি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' (সাহিত্য, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৬) এবং 'অরণ্যে রোদন'এ (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০৯)।

শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে জাতীয় শিক্ষার পটভূমিকায় আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ নিয়ে এবং বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানপদ্ধতির ত্রুটি নিয়ে গভীর ও সুচিন্তিত আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে পাঠ করা হয়। ঐ অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। শিক্ষাপদ্ধতির দোষত্রুটি ও তা' দূর করবার উপায় নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যে আলোচনা করেছেন, তা' শেষ অবধি অরণ্যে রোদনের ন্যায়ই নিষ্ফল হবে, এই অনুমানে জীবনরসিক ও সত্যদ্রষ্টা লেখক প্রবন্ধটির নামকরণ করেছেন 'অরণ্যে রোদন।' আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, অন্যদেশে শিক্ষানীতি যাই হোক, আমাদের দেশে সে সকলের প্রয়োগের একান্ত অভাব। 'অন্যদেশে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চা করেন, সত্যাবিষ্কার করেন,' মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষমতাবিকাশের চেষ্টা করে তাকে 'রাষ্ট্রের কর্মঠ ভৃত্যে পরিণত করেন,' মানুষের 'চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি সাধন করেন।' বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে যথার্থই শিক্ষা দেন, কিন্তু অনেক যত্নেও যদি কেউ শিক্ষা না পায়, তবে তা'কে শিক্ষিতের চিহ্ন না দিয়ে জীবিকার জন্যে অন্য পন্থা আশ্রয় করতে বলেন। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার সে সব উদ্দেশ্য নেই। রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাই দেন না। তাঁরা কেবল পরীক্ষা করেন। যারা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়ে পরীক্ষা দিতে যান, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য জীবিকার্জন ; চিত্তবৃত্তির উন্নতি, মনুষ্যত্বের বিকাশ বা পাণ্ডিত্য অর্জন নয়।

এই প্রবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশসমূহ নিয়েও রামেন্দ্রসুন্দর কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ আলোচনা করেছেন। যথার্থই বলেছেন, কমিশন আমাদের পরীক্ষালয়গুলোকে বিদ্যালয়ে পরিণত করতে বলেন নি ; পরীক্ষা-ব্যবস্থাকেই আরও কঠিন করে তুলতে বলেছেন। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ-সাহায্যের জন্যে সরকারকে বলেন নি ; প্রতিভাবান অধ্যাপক সংগ্রহ করার কথা তোলেন নি, শিক্ষক ছেঁকে নেবার জন্য নূতন একটা পরীক্ষা চালু করবার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া 'দেশব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে নগরাবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা'ও কমিশন তোলেন নি ; উপরন্তু মাতৃভাষায় জ্ঞান-

বিজ্ঞান-চর্চার সুপারিশ না করে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর গোড়ায় গলদ রেখে দিয়েছেন। সে কারণেই, এ প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হল, বিদেশী শাসকদের মুখাপেক্ষী হয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির কোনো আশা নেই। আমরা যদি স্বাবলম্বন অভ্যেস করি,—পরিশ্রম, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ত্যাগ নিয়ে আমরা যদি যথার্থ শিক্ষার সাধনা করি, তবেই আমাদের উন্নতি সম্ভব। তার কারণ, আচার্য ত্রিবেদী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন, 'বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।' ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় আশ্রয় স্বাবলম্বন।

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অন্যত্র রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, শুধুমাত্র শিক্ষার আদর্শকে দুরূহ ও পরীক্ষা-পদ্ধতিকে কঠিন করলেই শিক্ষাদান পূর্ণাঙ্গ হয় না। সর্বাগ্রে ভাল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে 'আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ' (ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২) নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়া এই ভাল শিক্ষাদান কিভাবে হতে পারে, কিভাবে প্রশ্ন করলে পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে কিছুটা ত্রুটিহীন করা যায়, তা' নিয়েও ভেবেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই প্রসঙ্গে ১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভাণ্ডার পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর রচিত 'প্রশ্ন'-পত্রটি উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের ছয়টি ও শাস্ত্রগ্রন্থের তিনটি প্রশ্ন আছে এখানে। আদর্শ প্রশ্ন-পত্র কেমন হওয়া উচিত, তা' এখানে দেখান হয়েছে। দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর সত্যিকার জ্ঞানের পরিচয় যা'তে পাওয়া যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই প্রশ্ন-পত্রটি রচিত। তবে বিশেষ কোনো স্তরের শিক্ষা নয়, আমাদের দেশের সকল স্তরের শিক্ষা নিয়েই রামেন্দ্রসুন্দর ভাবতেন। 'স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়' (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৩১২) নামক প্রবন্ধে দেখি, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার দোষত্রুটি বর্ণনার পর সেগুলো পরিহারের উপায় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ আলোচনায় বক্তব্যকে সোজাসুজি উপস্থাপনের উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের স্বভাবসুলভ চিত্তাকর্ষক বর্ণনারীতি এখানে অনুপস্থিত। বর্ণনারীতি ও রামেন্দ্রসুন্দবের শিক্ষাদর্শনের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষা-প্রণালী' (মানসী, আশ্বিন ১৩১৭) নামক প্রবন্ধটি। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শের প্রতি আচার্য ত্রিবেদীর যে কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল, এই প্রবন্ধটি থেকে তা' জানা যায়। তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার যন্ত্রবদ্ধ উদ্যমকে লক্ষ্য করে তিনি এখানে বলেছেন, এই যন্ত্রমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা যেন এদেশের প্রাচীন উদ্যম অনুষ্ঠানগুলিকে অবজ্ঞা না করি। সনাতন ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান আচার্য ত্রিবেদী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালী তৎকালীন সমাজ-জীবনের উপযোগী ছিল। আধুনিক যুগের জীর্ণ, শীর্ণ চতুষ্পাঠীর মধ্যে তিনি সেই প্রাচীন ভারতের বৃহৎ আদর্শের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। তাই বলে এমন কথা তিনি বলেন নি, প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষাদর্শের যে ধ্বংসাবশেষটুকু আজও বর্তমান আছে, সেখানে আবার 'সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করা সম্ভবপর'। তাঁর মতে, বরং একালের প্রবর্তিত ও অনুমোদিত যন্ত্রবদ্ধ প্রণালীই একালের উপযোগী হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু যতদিন এর মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত না হবে, হৃদয়ের স্পন্দন এর মধ্যে যতদিন অনুভূত না হবে, ততদিন যন্ত্রবদ্ধ আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষে সমাজের কল্যাণ-বিধান করা অসম্ভব।

৪

যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী যে আমাদের সমাজ ও জীবনের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে না, 'নানা কথা'র 'সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর তা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তৎকালীন সমাজজীবনের পটভূমিকায় শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও দোষত্রুটি নিয়ে উচ্চাঙ্গের আলোচনা আছে এখানে। সামাজিক গলদ ও শিক্ষাসমস্যা সমাধানের উপায় কী, এই প্রবন্ধে তা' নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তবে সেই আলোচনায় অনুপ্রবেশের পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধটি রচনার সময়ে আমাদের সামাজিক পরিবেশ কেমন ছিল, তা' নিয়ে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধটি রচনা করেন উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। তখন আমাদের সমাজ-জীবনের সর্বত্রই একটা হতাশা ও বিষাদের ভাব সুপরিস্ফুট। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমাদের সমাজ-জীবনে যে নূতন আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হয়েছিল, তা' তখন অবলুপ্ত। বরং সে সময়ে এক নৈরাশ্য জাতিকে ঘিরে ধরেছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্পর্শে সঞ্জীবিত জাতি অনেক আশা নিয়ে বিদেশী শিক্ষার দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বছর না পেরোতেই দেখা গেল, সে আশা পূর্ণ হয় নি। সেই আশাহত জাতির হৃদয়বেদনার ইতিবৃত্ত প্রবন্ধটির গোড়ার দিকে রামেন্দ্রসুন্দর স্পষ্টভাবে চিত্রিত করেছেন। তারপর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন প্রধানতঃ শিক্ষার উপর লক্ষ্য রেখে। বলেছেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে সফল হয় নি। কারণ, আমাদের জাতীয়তার ভিত্তির উপর এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত নয়; এবং সে জন্যই তা অস্বাভাবিক; অর্থাৎ জাতীয় জীবন ও স্বভাবের সঙ্গে এ শিক্ষার সংযোগ ঘটে নি। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন, যা' অস্বাভাবিক, তা' থেকে স্থায়ী কোনো ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। যুগ-যুগান্তর ধরে যে জাতীয় স্বভাব বিকশিত হয়ে আসছে, তা'র সঙ্গে যদি সম্পর্ক না থাকে, তবে শুধু শিক্ষাব্যবস্থা কেন, সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা যে পুরোপুরি সফল হতে পারে নি, তা'রও মূলে ঐ একই কারণ। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সুস্পষ্ট অভিমত হল, বিলেতী শিক্ষা আমাদের জাতীয় ভাবের সঙ্গে মিশতে পারে নি; অথচ একদিকে আমরা আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী বর্জন করেছি, অপরদিকে বৈদেশিক শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করতেও অক্ষম। আমাদের এই যে অবস্থা, এ নিতান্ত অস্বাভাবিক। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এই অস্বাভাবিক-তাই হল আমাদের একমাত্র ব্যাধি। অন্য সব কিছুই এর লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। অন্যান্য দেশে সমাজজীবন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে ও বিকাশ লাভ করছে। আর আমাদের দেশ জীবনরক্ষা করছে অপরের প্রদত্ত অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। এই যে অস্বাভাবিকতা, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এই হল আমাদের সামাজিক ব্যাধির মূল কারণ। এরই জন্যে শক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায় আমাদের মধ্যে। এ কারণেই সকল কাজে হাত দিয়ে আমরা বিফল হই এবং শেষ অবধি পরস্পরকে গালি দিতে শুরু করি। ফলে, ব্যর্থতার ব্যাধি জাতিকে ঘিরে ধরে। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের এই ব্যাধির প্রতিকারের কথাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আত্ম-সমাজের প্রতি 'অকপট শ্রদ্ধা ও অবিচলিত ভক্তি' যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, যদি

স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তবেই এই অস্বাভাবিকতা দূর হবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সামাজিক ব্যাধিরও হবে প্রতিকার। আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশবাৎসল্য জাগাতে হলে সমাজের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করা আবশ্যক। সমাজের কোথায় কী আছে, অনুরাগীর দৃষ্টি নিয়ে তা' খুঁজে দেখতে হবে। অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মতো মমত্বপূর্ণ হৃদয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক গলদের। তারপর সমাজের প্রাচীন ইতিহাস যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমাদের সমাজের বিকাশ ও পরিণতির খবর নিতে হবে। সমাজকে যদি এভাবে জানবার চেষ্টা করি আমরা, তবেই আমাদের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাবে। সমাজের প্রতি জন্মাবে ভক্তি। এই ভক্তি থেকেই আসবে প্রেম এবং এই প্রেম শেষ অবধি এক সুমহান ভাবাদর্শের মধ্যে পরিণতি লাভ করবে। রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত, শিক্ষা-দীক্ষায়, ধ্যান-ধারণায় সমাজের যাঁরা অগ্রণী, তাঁরাই এই ভাবাদর্শকে জাতীয় জীবনের সর্বত্র সঞ্চারিত করবেন। মহত্তর এই আদর্শচেতনা আমাদের সমাজে নতুন আশা, আনন্দ ও শক্তি আনয়ন করবে। এ থেকেই সমাজশরীর নবজীবন লাভ করবে ; জাতীয় জীবনে আসবে নতুন এক প্রাণ-প্রবাহ। উচ্ছ্বসিত এই প্রাণ-প্রবাহই দূর করবে আমাদের সকল বাধা-বিপত্তি। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, একমাত্র এভাবেই আমাদের সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা হতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, আচার্য ত্রিবেদী সামাজিক ও জাতীয় সমস্যার বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাসমস্যা নিয়ে ভেবেছেন। স্বদেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করা তাঁর মতে শিক্ষার চরম আদর্শ। এই যে শিক্ষা, এ থেকে কাউকেই বঞ্চিত করা চলে না। তাই সমাজের আপামর জনসাধারণকেও শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৫

সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়েও ভেবেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। লোকশিক্ষা নিয়ে লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'লোকশিক্ষা' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৭) শীর্ষক প্রবন্ধটি। শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার না করে লোকশিক্ষা চালু করার কী পরিণাম হতে পারে, তা' নিয়ে এখানে প্রশ্ন তুলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বলেছেন,

> শিক্ষার সহিত আমার বিরোধ নাই, শিক্ষাপ্রণালীর সহিত আমার বিরোধ ; শিক্ষা-বিড়ম্বনার সহিত আমার বিরোধ। অন্য দেশের কথা উপস্থিত করিবার দরকার নাই ; আমাদের দেশে বর্তমানকালে যে শিক্ষা-বিড়ম্বনা বর্তমান আছে, তৎসম্বন্ধেই আমি এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছি। যতদিন এই শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্করণ না হইতেছে, তত দিন আমি এই শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাবে কিছু আতঙ্ক অনুভব করিব।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করে, সমাজ ও জাতীয় জীবনের ইতিহাস, বিশিষ্টতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে, জাতীয় ভাব বিকাশের অনুকূল এবং স্বাভাবিক ও কৃত্রিমতা-মুক্ত শিক্ষার প্রসারই তাঁর কাম্য ছিল।

অষ্টম অধ্যায়

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রামেন্দ্রসুন্দরের শিক্ষা-চিন্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাঁর সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।

রামেন্দ্রসুন্দর শুধু সাহিত্যসাধক ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্য-সমালোচকও। তাঁর সাহিত্য-চিন্তার মধ্যে উচ্চাঙ্গের মননশীলতার ও সুগভীর জীবনপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-ভাবনাবিষয়ক প্রবন্ধগুলো বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। তথ্য-সম্ভারে নয়, গভীর জীবনবোধ, সূক্ষ্ম রসদৃষ্টি এবং অনুপম বিশ্লেষণ-কুশলতার গুণেই এই রচনাগুলো উজ্জ্বল। রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ক বহু রচনাই সাহিত্য-শিল্পের ধরা-বাঁধা ছকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি ; জীবন-রহস্যের অসীম-অনন্ত গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। জীবন, সমাজ ও সাহিত্যের ত্রিবেণীসঙ্গম রচিত হয়েছে 'নানা কথা'য় সংকলিত সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলোতে। স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-ভাবনার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে শুধুমাত্র আনন্দের সামগ্রী নয়, প্রয়োজনের বস্তুও বটে। জনসংযোগের এবং সমাজ উচ্চ-নীচের মধ্যে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সাহিত্যের উপযোগিতা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান-সংগ্রহের জন্য একটি সাহিত্য-তীর্থ প্রতিষ্ঠা করতে। এজন্যেই দেখি, বিভিন্ন সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উপযোগিতার কথা ব্যাখ্যা করছেন, বিভিন্ন রচনা ও অভিভাষণে সাহিত্য-পরিষদের আদর্শের কথা তুলে ধরছেন। আর, সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্যে তিনি যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে পুঁথি-বিচার বিষয়ক রচনাগুলো থেকে। বিরাট কোনো আবিষ্কার বা অভিনব কোনো গবেষণার পরিচয় হয়তো এদের মধ্যে নেই, কিন্তু প্রাচীন পুঁথি-বিচারে যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় আছে এখানে, যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রণালী এখানে অনুসৃত হয়েছে, তা' আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এছাড়া রামেন্দ্রসুন্দর বিভিন্ন গ্রন্থের যে সব ভূমিকা লিখেছিলেন, তা' থেকেও তাঁর অকৃত্রিম সাহিত্যপ্রীতি, ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেম ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১

জীবনের রঙ্-রসের সঙ্গে সাহিত্যের রূপ-লাবণ্য কেমন করে মিশে যায়, জীবন, সমাজ ও সাহিত্য কেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, 'নানা কথা'র কয়েকটি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর তা' অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'সাহিত্য-কথা' (ভারতী,

অগ্রহায়ণ ১৩০২) শীর্ষক প্রবন্ধটি। এখানে ম্যাক্‌বেথ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেছেন। এই প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য, মানুষের জীবন এমন একটা অবস্থায় পৌঁছুতে পারে, যখন তা'র আর উদ্ধারের আশা থাকে না। ম্যাকবেথ ও গোবিন্দলালের জীবনে এমন সময় এসেছিল। তাই তাদের উদ্ধারের আশা ছিল না আর। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য, অধঃপতন থেকে সঞ্জাত এই যে চরম ট্রাজেডী, এটা মানুষ মাত্রের পক্ষেই অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ সত্য। এই সত্যের সম্মুখে মানুষের হাসবার বা উল্লসিত হবার কোনো কারণ নেই। এ ধরনের সত্য আমাদের সামনে অহরহ উপস্থিত রয়েছে; আমরা ইচ্ছে করে তা' দেখি না, বা দেখেও স্বীকার করি না। অথচ জীবন সম্পর্কে এ একটা ধ্রুব তত্ত্ব। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, ইংরাজদের ম্যাক্‌-বেথে ও আমাদের কৃষ্ণকান্তের উইলে এই সত্য তত্ত্বকথাটা খুব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উভয় গ্রন্থের মধ্যে এ বিষয়ে মিল রয়েছে। প্রবন্ধটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছেন বলেই এবং সহানুভূতি নিয়ে কুটিল ও হিংস্র চরিত্রের বিচার করেছেন বলেই লেখকের পক্ষে জীবনসত্য সম্পর্কে এই নির্মম তত্ত্বকথাটি এমন অকপটভাবে স্বীকার করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রবন্ধটির ভূমিকায় সাহিত্যে তত্ত্বের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা'ও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-সমালোচনার পর্যায়ে পড়ে। কালিদাসের কাব্য-সৌন্দর্য বর্ণনার কালে যে সব সুললিত ও ঝঙ্কারময় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এই প্রসঙ্গে তা'ও বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর স্মরণীয় এই প্রবন্ধের কয়েকটি সুন্দর উপমা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, উভয় প্রকার সাহিত্যেই লেখকের পাণ্ডিত্য।

'নানা কথা'র আর একটি প্রবন্ধ 'মহাকাব্যের লক্ষণ' (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৯) সাহিত্য-বিষয় নিয়ে লেখা একটি প্রথম শ্রেণীর রচনা। তবে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের তথ্য অপেক্ষা জীবন ও সাহিত্যের চিরন্তন সত্যকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। সে কারণেই সাহিত্য নিয়ে লেখা গতানুগতিক প্রবন্ধের পর্যায়ে এটি পড়ে না। এ যেন সাহিত্য-সাধক রামেন্দ্রসুন্দরের এক মৌলিক ও অভিনব সৃষ্টি। মহাকাব্যের লক্ষণ কী, তা' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে প্রাচীন যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সমাজ ও সাহিত্যের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। যে ভাষায় তুলে ধরেছেন, তা'ও মহাকাব্যের মতোই গম্ভীর ও ভাবোদ্দীপক, কবিত্বময় ও সুললিত। সব দিক থেকে বিচার করলে এ প্রবন্ধটি রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধসাহিত্যের এক স্মরণীয় নিদর্শন।

রামায়ণ ও মহাভারত পর্যায়ের কাব্যকেই রামেন্দ্রসুন্দর এখানে মহাকাব্য বলে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ শুরু থেকেই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মহাকাব্য বিচারের পথকে পরিহার করা হয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ইত্যাদি কাব্যকে মহাকাব্যের পর্যায়ে ফেলে থাকেন। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী মহাকাব্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে মহাকাব্য শব্দটিকে আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করেন নি। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ইত্যাদিকে মহাকাব্য হিসাবে গ্রহণ না করে

রামায়ণ ও মহাভারত শ্রেণীর গ্রন্থকেই মহাকাব্য বলেছেন। কেন বলেছেন, তা' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সেকালের একটি উক্তিকে উদ্ধার করেছেন। মেকলে বলেছেন, সভ্যতার সঙ্গে কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ আছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে ফেলে অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয় না। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস না করলেও মহাকাব্যকে সশরীরে গ্রাস করে ফেলে। কারণ, পৃথিবীর সভ্যতা ও সাহিত্যের কোন্ সুদূর অতীতে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হয়েছিল। তারপর কত হাজার বছর পেরিয়ে গেল। কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হল না। কেন হল না, তা'র কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, মানব-সমাজের বর্তমান অবস্থা বোধ হয় এই শ্রেণীর মহাকাব্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। রামায়ণ, মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মানব-সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, সমাজের বর্তমান অবস্থায় তা' আর ঘটতে পারে না। ইতিহাস ও পুরাণ থেকে কয়েকটি সুনির্বাচিত উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, সেকালের ক্রূরতা, বর্বরতা ও পাশবিকতা ছিল, নিতান্ত নিরাবরণ ও নগ্ন। কোনোরূপ আচ্ছাদন বা পালিশ ছিল না তা'র উপর। কিন্তু একালের অবস্থা অন্যরকম। ক্রূরতা ও বর্বরতা একালেও আছে। তবে এখন এর উপর 'একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ' স্থাপিত হয়েছে। পাশবিকতার বীভৎস ভাব আজ সেই আবরণে আচ্ছাদিত। ইতিহাসের নজীর উপস্থাপিত করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, বিগত চার হাজার বছরে মানুষের চরিত্র অধিক বদলায় নি, তবে সমাজের মূর্তিটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আর সে কারণেই কাব্যের চেহারারও হয়েছে পরিবর্তন। কারণ, কাব্যে সমাজের প্রভাব কম-বেশি থাকবেই। এইভাবে সমাজ ও সাহিত্যের যোগ-সূত্র ব্যাখ্যা করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যা' বলতে চেয়েছেন, তা'র মূল কথা হল এই,—আধুনিক কালের সাহিত্যে মহাকাব্য-রচয়িতা বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের মত কবি আবির্ভূত হন নি, কখনও আবির্ভূত হবেন বলেও মনে হয় না। কারণ, সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ অতীত হয়ে গেছে। মহাকাব্যের মধ্যে যে অকৃত্রিম এক স্বাভাবিকতা আছে, তা' বোধ হয় আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে দেখি, মহাভারতকে আদর্শ মহাকাব্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং হিমালয়ের সঙ্গে এর তুলনা করে লেখক মহাকাব্যের একটা লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন। লেখকের মতে, যে কাব্য পড়তে হয় না, তা'রই নাম মহাকাব্য। না পড়েই আমরা মহা-কাব্যের রস-আস্বাদনের অনেকটা অধিকারী হতে পারি। রামায়ণ-মহাভারতের সহস্র সহস্র শ্লোকের অধিকাংশই আমাদের অপঠিত রয়েছে। কিন্তু তাই বলে পাঠকসমাজ এই দু'টি কাব্যের কাব্যরস আস্বাদন জানেন না, এমন কথা রামেন্দ্রসুন্দর মেনে নেন নি। কেন মেনে নেন নি, তা' বোঝাতে গিয়ে তিনি এখানে রামায়ণ-মহাভারতের কয়েকটি বিরাট চরিত্রের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, কাব্যপাঠের মাধ্যমে ঐ সব চরিত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় আমরা লাভ করি নি। রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্রকে, ভরত ও ভীষ্ম চরিত্রকে দূর থেকেই আমরা নিরীক্ষণ করেছি। কিন্তু তবু ঐ দূর থেকেই তাঁদের মাহাত্ম্যে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছি আমরা। শৈশব কাল থেকেই ঐ সব চরিত্র আমাদের মনে আশ্চর্য গভীর এক প্রভাব বিস্তার করেছে।

অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য, মহাকাব্যকে অক্ষরে অক্ষরে পড়বার দরকার নেই ; আর এই বিশিষ্টতাই হল মহাকাব্যের লক্ষণ। হিমালয়ের বিরাট মূর্তির শোভা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে যেমন দূর থেকে তা'র তুঙ্গ শিখররাজির দিকে তাকান দরকার, তেমনি সমগ্র মহাকাব্যের মহিমা উপলব্ধি করতে হলে, মহাকাব্য থেকে কতকটা দূরে থাকাই সঙ্গত। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, মহাকাব্য না পড়লেও চলতে পারে, কিন্তু যা' মহাকাব্য নয়, তা' না পড়লে একেবারেই চলে না। কালিদাস ও শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য তন্ন তন্ন করে না পড়লে চলে না। কারণ এঁরা একালের মহাকবি হতে পারেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনা করেন নি এঁদের কেউই।" কে বড়, মহাকবি না মহাকাব্যের কবি, তা' বড় নয় রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। শেক্‌স্‌পীয়র বড় না হোমার বড়, বাল্মীকি ও কালিদাসের মধ্যে কা'র কাব্য উৎকৃষ্ট, তা' নিয়ে আলোচনা করেন নি তিনি। তাঁর বক্তব্য হল, মহাকাব্যের মধ্যে এমন একটা গৌরব আছে, যা'কে দূর থেকে চেনা যায়, যা'র গল্প শুনলে মন অভিভূত হয়, যা'কে বুঝতে হলে সমঝদার হতে হয় না, শিক্ষানবিসী করতে হয় না, স্বভাবদত্ত চোখ দিয়েই যা'কে চেনা ও বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সুস্পষ্ট অভিমত, "এই অলঙ্কার-হীন পরিচ্ছদহীন মুক্ত স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ।...মানুষের বর্তমান কালের সভ্যতা অত্যন্ত কৃত্রিম। সেই জন্য মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিকতা, সেই স্বাভাবিক-তার অভাবে বর্তমান সভ্যতায় বোধ হয় মহাকাব্যের উৎপত্তির প্রতিরোধ করে। আধুনিক সভ্যতা কবিত্ব সৃষ্টির অন্তরায় নহে, কিন্তু মহাকাব্য সৃষ্টির বোধ হয় অন্তরায়।" এখনকার মানুষ বহু-বিচিত্র কর্মযন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ। এখন মানুষের অবসর অল্প। তাই তা'র সৌন্দর্য-তৃষ্ণা মেটাতে হয় খণ্ড কাব্যের খণ্ড সৌন্দর্য আস্বাদন করে। বৃহৎ পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে বিশাল সৌন্দর্যকে উপভোগের অবকাশ আজকের মানুষের নেই। সে কারণেই বোধ হয় আজকের সভ্যসমাজে শেক্‌স্‌পীয়র জন্মেছেন। কিন্তু হোমার বা বাল্মীকি জন্মান নি।

আলোচ্য প্রবন্ধটি পাঠ করে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশ্বাসীরা রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে একমত না হতে পারেন। কিন্তু লেখকের অপরূপ বর্ণনারীতি ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রবন্ধটিকে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে, সে বিষয়ে দ্বিমত হবার কোনো অবকাশ দেখি নে। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের তুলনামূলক আলোচনায়, হোমারের ইলিয়ডের কবিত্বময় বর্ণনায় এবং হিমালয়-উৎপত্তির কাল্পনিক বিবরণে লেখকের অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। উদাহরণ হিসেবে হিমালয়-উৎপত্তির বর্ণনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে,

> ভূতত্ত্ববিৎ তাঁহার মানস চক্ষু অতীত কালের পরপারে প্রসারিত করিয়া দেখিতে পান, বসুন্ধরার ইতিহাসে এমন এক দিন আসিয়াছিল, যখন মহাকাল স্বয়ং আপনার ভীম বাহু প্রসারণ করিয়া উত্তপ্ত ধরাগর্ভে বিপুল শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে সেই পুঞ্জীকৃত শক্তিসমষ্টি আপনাকে প্রসারিত করিয়া ভূবক্ষ বিদারণ করিয়া বহির্গত হইল। ভীষণ ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু আলোড়িত হইল। সাগরবক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া পুনরায় ভীতিভরে অপসরণ করিল। পূর্বসাগরের বেলাভূমি হইতে পশ্চিমসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া মহাকায় পাষাণ-কলেবর হিমাচল গাত্রোত্থান করিল। তাহার

তুহিনমণ্ডিত সূর্যকিরণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহ বেষ্টিত করিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু ঘোররাবে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ধূম্রবর্ণা কাদম্বিনীর বক্ষোদেশে সৌদামিনী স্ফুরিত হইতে লাগিল। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল; দ্রোণিদেশ অধিত্যকায় উত্থিত হইল ও অধিত্যকা দ্রোণিদেশে নামিয়া গেল; অরণ্যানী জ্বলিয়া উঠিল, জীবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তনের সহকারে অট্টহাস্যে দিগন্ত নিনাদিত হইতে লাগিল।[১]

২

উপরের দু'টি প্রবন্ধে সাহিত্য-রস তো বটেই, গভীর জীবন-রসেরও পরিচয় পেলাম আমরা। এই জীবন-রসিকতাই রামেন্দ্রসুন্দরকে স্বজাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্বদেশ ও স্বজাতির সাহিত্য ও ইতিহাস রচনার এক বিশিষ্ট তীর্থক্ষেত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি। প্রাচীন ভারতের, বিশেষতঃ আমাদের বাংলা দেশের প্রাচীন সাহিত্য, সমাজজীবন ও ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তাব কথা উল্লেখ করে রামেন্দ্রসুন্দর 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' (ভারতী, বৈশাখ ১৩১২) এই শিরোনামায় পরিষদের কর্মপন্থা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। 'নানা কথা'র 'মাতৃমন্দির' (উপাসনা ১৩১৫ ষষ্ঠ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখি, বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাসের পট-ভূমিকায় সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উপযোগিতার কথা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ১৩১৪ সালের ১৭ই কার্তিক কাশীমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোচ্য অভিভাষণে বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের নিজস্ব গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সাহিত্য-পরিষদের গৃহ,—যেখানে বসে বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে জানা যাবে, যেখানে বসে বঙ্গভূমির অতীত ও বর্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করে জানার সুযোগ মিলবে,—সেই গৃহকেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন মাতৃমন্দির। এই মন্দির মধ্যে মাতৃভূমি থেকে সংগৃহীত পুঁথি, তাম্রশাসন, মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদিকে তিনি বলেছেন মাতৃপ্রতিমা। সাহিত্য-পরিষদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বড় সুন্দরভাবে এই প্রবন্ধে অভিব্যক্ত। তা' ছাড়া বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে অল্পকথায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বর্ণনার রীতিটিও আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যা' বলেছেন, তা'র অনেক কিছুই আজকের দিনের পাঠকদের কাছে মূল্যহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যদি স্মরণে রাখি, রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধটি লেখার সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদানের অনেক কিছুই অনাবিষ্কৃত ছিল; তখনও চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ইত্যাদির সংবাদ আমরা রাখতাম না, তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-সূত্র বর্ণনায় রামেন্দ্রসুন্দরের দোষত্রুটি আমাদের নজরে পড়বে না। বরং মনে হবে, রামেন্দ্রসুন্দরের মতো

১। প্রাদেশিক Catastrophe-র যে বিবরণ রামেন্দ্রসুন্দর এখানে দিয়েছেন, তা' বিজ্ঞানসম্মত।

সত্যসন্ধানী ও ইতিহাসবৎসল সাহিত্য-সাধকদের জন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে আজ আমরা এতদুর অগ্রসর হতে পেরেছি। তা' ছাড়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকেও রামেন্দ্রসুন্দর কতখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতির চোখে দেখতেন, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি কী গভীর মমত্ববোধ থেকে তিনি পরিষদ-মন্দির নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন, এ অভিভাষণ থেকে সে পরিচয়ও মিলবে।

সকলেই জানেন, রামেন্দ্রসুন্দরের স্বপ্ন সফল হয়েছিল। কাশীমবাজারের মহারাজার অর্থানুকূল্যে অচিরকালের মধ্যেই পরিষদ-মন্দির নির্মিত হয়েছিল। আর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সে মন্দিরের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল অন্তরঙ্গ যোগ। কর্মী হিসেবে, সাহিত্য-সাধক হিসেবে এবং সর্বোপরি পরিষদের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে আমরণ তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করে গেছেন।

সাহিত্য পরিষদের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের এই গভীর ও অন্তরঙ্গ ভালবাসার মূলে ছিল স্বজাতিপ্রীতি ; দেশ ও জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ও তাদের ধ্যান-ধারণাব প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা। এ কারণেই দেখি, জনসংযোগ ও সমাজে উচ্চ-নীচের মধ্যে বোঝাপড়া স্থাপনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের উপযোগিতা তিনি বিশেষভাবে স্বীকার করতেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের মাধ্যমেই সমাজের উপবেব স্তবের লোকের সঙ্গে নীচের স্তবের লোকের যোগাযোগের চেষ্টা করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আজকালকার পব্লিক্ উদ্যোগগুলির সহিত প্রাকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি' ? (ভাণ্ডার, বৈশাখ ১৩১২) শীর্ষক ক্ষুদ্রকায় রচনাটি। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরেব বক্তব্য হল, অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করে শিক্ষিতের কথা অশিক্ষিতের মধ্যে প্রচার করা প্রয়োজন এবং দেশীয় প্রথায় প্রাচীন ভারতের পুরাণ ও ইতিহাসকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা দরকার। এই প্রসঙ্গে যেন স্মরণ রাখি স্বদেশ ও স্বজাতির জীবন ও সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাসকেই উদ্ধার করার পক্ষপাতী ছিলেন বামেন্দ্রসুন্দর। বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস রচনা হোক, এই ছিল তার চিরকালের আকাঙ্ক্ষা।

৩

বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস-রচনার উপাদান-সংগ্রহের ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেও কতখানি উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা'র প্রমাণ মিলবে পুঁথিবিচার বিষয়ক রচনাগুলো থেকে। হস্তলিখিত পুঁথির বিচারে আচার্য ত্রিবেদীর মনস্বিতার এক বিশিষ্ট প্রমাণ 'গৌরীমঙ্গল' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধটি। জেমোর রাজবাড়ীতে গৌরীমঙ্গল নামে এক পুঁথি পেয়েছিলেন লেখক। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই পুঁথির একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কবি-পরিচয় দিয়ে মঙ্গলকাব্য হিসেবে গৌরীমঙ্গলের বিশিষ্টতা, এর কাহিনী এবং ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য বর্ণনা করে পরিশেষে মূল পুঁথির কোনো কোনো অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

'কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৬ ২য় সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধেও পুঁথিবিচারে রামেন্দ্রসুন্দর আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

জেমোর পুঁথি ও বিশ্বকোষ কার্যালয়ের পুঁথির তুলনামূলক আলোচনায় এবং বিশেষ করে গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গলকে কেন্দ্র করে কাশীরামের বংশ-পরিচয় ও কাল-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এ ছাড়া ১৩০৮ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'কাশীরাম দাস' প্রবন্ধে গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গলের আর একটি পুঁথির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে।

'রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ' (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১২) নামক প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের প্রথম সাত অধ্যায় ও কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম আট সর্গের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের স্বরূপ বুঝিয়ে, এর মূল কোথায়, এ প্রবন্ধে তা' নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪

এ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা থেকেও তাঁর ঐকান্তিক সাহিত্য-প্রীতি, সুগভীর স্বদেশপ্রেম ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-ভাবনার পরিচয় পাই আমরা। 'খুকুমণির ছড়া' পুস্তকের ভূমিকায় (১৩০৬) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বর্ণনায় এবং ছড়ার বৈজ্ঞানিক মূল্য নির্ধারণে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-চিন্তার বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছড়ার বৈজ্ঞানিক মূল্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,

> মনস্তত্ত্ববিৎ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্যজীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মানুষের শৈশব জীবনের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক সময় এই সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হইবে।

এই সুদীর্ঘ ভূমিকাটির শেষদিকে লোকসাহিত্য এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি লেখকের সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয় আমাদের বিমুগ্ধ করে। বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতা সম্বন্ধে এই ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,

> মমতা ও করুণা, ভক্তি ও প্রীতি, বাৎসল্য ও পবিত্রতা যদি মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য আবশ্যক হয়, তবে বাঙ্গালীর জীবন জগৎসংসারে নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা না করা যাইতে পারে।

আর বাংলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত,

> ...এই অকৃত্রিমতার হিসাবে বাঙ্গালীর গ্রাম্য সাহিত্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর শিশু-সাহিত্য বা ছড়াসাহিত্য, যাহা লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যুগ ব্যাপিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কখন লিপিশিল্পের যোগ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, সেই সাহিত্য সর্বতোভাবে অতুলনীয়।

ঐ ছাড়া ছড়া বিষয়ক আর একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। 'ছড়া ও গল্পে'র ভূমিকাটি 'অভিভাবকদের জন্য' লেখা এবং কিছুটা গুরুগম্ভীর প্রকৃতির। ছেলে-ভুলান গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি প্রচারের ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দর যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন, এই রচনাটি থেকেও তা'র প্রমাণ মিলবে।

এ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যবিচার-শক্তির বিশিষ্টতার পরিচয় পাই 'মন্দিরে'র ভূমিকাটি (১৩২২) পড়ে। 'অভয়ের কথা'র (১৩২২) ভূমিকা থেকে জানতে পারি, রামেন্দ্রসুন্দর শুধু সাহিত্যরসবেত্তাই নন, অপরকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা-দানেও তিনি অদ্বিতীয়। তবে রামেন্দ্রসুন্দরের রচিত ভূমিকা ও মুখবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র মুখবন্ধটি। এখানে একদিকে যেমন আচার্য ত্রিবেদীর সুতীক্ষ্ণ সাহিত্য-বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে তেমনি তাঁর সাহিত্যরসিক হৃদয়টিও ধরা পড়ে। এই ভূমিকায় চণ্ডীদাস-সমস্যার আলোচনায় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনা-কাল, ভাষা ও রচনা-কার নিয়ে আলোচনায় তিনি আশ্চর্য সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তবে এই ভূমিকার সবচেয়ে বিশিষ্ট অংশ বড়ু চণ্ডীদাসের সাহিত্য-কীর্তির মনোরম প্রশস্তিটি। সাহিত্যের অক্ষয় আনন্দ-নিকেতনের সৌন্দর্য-রসলিপ্সু রামেন্দ্রসুন্দর এখানে লিখেছেন,

> কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত বংশীধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের রসবোধ যে কত গভীর ছিল, এ উদ্ধৃতিটি থেকেই তা' বোঝা যাবে।

নবম অধ্যায়

চরিতকার রামেন্দ্রসুন্দর

পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বিজ্ঞান, দর্শন, বেদ-ব্রাহ্মণ, স্বদেশ ও সমাজ, শিক্ষা এবং সাহিত্য-বিষয় নিয়ে রামেন্দ্র-চিন্তার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় জীবনী-লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দরের অবদানের কথা। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'চরিত-কথা' নামক গ্রন্থটি।

'চরিত-কথা' রামেন্দ্র-প্রতিভার এক স্মরণীয় নিদর্শন। স্বদেশী-বিদেশী আট জন মনীষীর জীবন-কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য জীবনসমূহের প্রকৃতি, মনীষা ও খ্যাতির ক্ষেত্র বহু-বিচিত্র। দেশবরেণ্য সাহিত্য-সাধক ও সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত-কথা আছে এখানে ; আবার আছে বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্তের কথাও। সাহিত্য সম্রাট, প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আছে, আবার আছে তরুণ সাহিত্য-পথিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ। স্বদেশী মনস্বী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও উমেশচন্দ্র বটব্যাল আছেন ; আবার আছেন বিদেশী মহাবিজ্ঞানী হর্মান হেলম্‌হোলৎজ ও জ্ঞানতাপস অধ্যাপক মোক্ষমূলর। দার্শনিক এসেছেন এখানে, এসেছেন বিজ্ঞানী। সমাজ-সংস্কারক এসেছেন ; এসেছেন সাহিত্য-সাধক। বহুখ্যাত ও অল্পখ্যাত, স্বদেশী ও বিদেশী—সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সমাজ-সংস্কারকের সম্মিলন ঘটেছে এখানে। সে কারণেই চরিত-কথা একদিকে যেমন বহু-বিচিত্র মনীষার সঙ্গমস্থল অপরদিকে তেমনি এটি প্রতিভা-দীপ্ত জীবনের অম্লান আলোকে ভাস্বর। একদিকে যেমন বহু-বর্ণ বৈচিত্র্যে দেদীপ্যমান, অপরদিকে তেমনি বর্ণাঢ্য জীবন-সাধনার সশ্রদ্ধ রূপায়ণে মহিমময়। ঊর্মি-মুখরিত প্রতিভা-সমুদ্র আছে এখানে, আবার আছে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী। আকাশস্পর্শী পর্বত আছে, আবার আছে প্রিয়দর্শী ক্ষুদ্র পাহাড়। এই ছোটয়-বড়য়, সমুদ্রে-নদীতে, পর্বতে-পাহাড়ে মিলে চরিত-কথাকে অনুপম করে তুলেছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের মনীষা ছিল বহুমুখী। দর্শনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও সমাজতত্ত্বে সমান পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। সে কারণেই তাঁর রচনা থেকে জ্ঞান-জগতের বহু-বিচিত্র অভিযাত্রীর যাত্রা-পথের নিশানা মিলেছে।

জগৎ ও জীবনকে বৃহত্তর এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন বলেও মনীষীদের জীবনালেখ্য রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন। কী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবোধ আলোচনায়, কী মনস্বী অধ্যাপক মোক্ষমূলরের পাণ্ডিত্য বিশ্লেষণে সর্বত্রই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিশিষ্টতা নজরে পড়ে।

চরিত-কথার রচনাসমূহের অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রামেন্দ্রসুন্দরের দেদীপ্যমান স্বদেশপ্রেম। কী বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত আলোচনায়, কী উমেশচন্দ্র বটব্যাল

ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনায়—সর্বত্রই এই দেশপ্রেমের পরিচয় সুস্পষ্ট। স্বাদেশিকতার মহত্তর আদর্শ সর্বত্রই যেন চরিতকারকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে চরিত-কথার রচনাগুলোকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) এদেশীয় কয়েকজন চিরস্মরণীয় মনীষীর পরিচয়। (২) অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত কয়েকজন স্বদেশী মনস্বীর কথা এবং (৩) বরণীয় বিদেশী প্রতিভার কাহিনী।

১

একমাত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া চরিত-কথার সবগুলো প্রবন্ধই বরণীয় মনীষীদের তিরোভাবের অনতিকাল পরে লেখা। প্রথম প্রবন্ধ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' (সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৩) রামেন্দ্রসুন্দরের একটি স্মরণীয় রচনা। ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ এমেরাল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর ইনস্টিটুট কর্তৃক আহূত স্মৃতিসভায় এই প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

তথ্য নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মতো ভাষার সরসতা ও প্রকাশভঙ্গীর ঋজুতাই আলোচ্য চরিত্ত-কাহিনীটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-তর্পণকে উপলক্ষ্য করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে আমাদের সমাজেরই একটি চিত্র এঁকেছেন যেন; যেন সেই চিত্রের মাঝখানে পুরুষ-সিংহ দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে, বিদ্যাসাগরের চরিত্রই শুধু নয়, তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনার স্বরূপটি এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। বিদ্যাসাগরের জন্মক্ষণ বা বংশপঞ্জী নেই এখানে, ছাত্র বা কর্মজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস নেই, এমনকি তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকাও এখানে অনুপস্থিত। বিদ্যাসাগরের মহিমময় জীবনের একটি চিত্তাকর্ষক পরিচয় তুলে ধরবার মধ্যেই এ প্রবন্ধটির সার্থকতা।

প্রবন্ধটির গোড়াতেই লেখক বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত আলোচনায় অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন তুলে রত্নাকরের নজীর আশ্রয় করেছেন। রত্নাকর বলতে তিনি বিদ্যাসাগরের স্মরণাভিলাষী বাক্‌সর্বস্ব, স্বার্থপর ও পৌরুষহীন বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিয়েছেন। বলেছেন, বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে তা'র তুলনা নেই। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে লেখক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, ইংরেজ শাসনের আমলে আমরা বড় বেশী অকর্মণ্য ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলাম। সে কারণেই আমাদের সমাজে বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যে পৌরুষ, দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের একান্ত অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তা' প্রভূত পরিমাণে বর্তমান ছিল। অথচ আশ্চর্য এই যে, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রের সঙ্গে এই প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁর নিজস্ব বিশিষ্টতা এত বেশী ছিল যে, পরানুকরণের প্রয়োজন তাঁর কখনো হয় নি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন কিছু পদার্থ ছিল, যা পাশ্চাত্ত্য মানুষদের থেকে তাঁকে পৃথক করে রেখেছিল; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে লেখক এখানে পাশ্চাত্ত্য দেশের ফিলানথ্রপি বা মানবপ্রীতি বিষয়ক

শাস্ত্রের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, পাশ্চাত্য জগতের নীতিসূত্র অনুযায়ী বিদ্যাসাগরকে ফিলান্থ্রপিস্ট বলা চলে না। বিদ্যাসাগরের মানবপ্রেম সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এই প্রেম কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করত না। ফিলান্থ্রপিস্টদের মতো কারণ অনুসন্ধান করে এবং নীতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নের মীমাংসা করে তিনি কারও দুঃখ-কষ্ট দূর করার কাজে এগোতেন না। মানবপ্রেম ছিল তাঁর জীবনধাতুর অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুঃখের অস্তিত্ব দেখবামাত্রই তিনি কোনোরূপ বিচার-বিশ্লেষণ না করে এবং কোনোরূপ কারণ অনুসন্ধান না করে তা' দূর করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন। প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ শুনে বালকের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠতেন তিনি। অপরের দুঃখের কথা শোনা মাত্রই তাঁর চোখে জল আসত। এই রোদন-প্রবণতার দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর একেবারে খাঁটি প্রাচ্য। কিন্তু তাঁর অসাধারণত্ব হল এই যে, তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ মনে করতেন; অথচ পরের দুঃখে রোদন না করে থাকতে পারতেন না। এইভাবে রামেন্দ্রসুন্দর দেখাতে চেয়েছেন, পরের দুঃখ দূর করাই বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। জগতের দুঃখের মূর্তিটিকে সদা-সর্বদা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। সে কারণেই জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে চাইতেন না তিনি। প্রবৃত্তি তাঁকে যে কর্তব্যপথে চালাত, তিনি সেই পথেই চলতেন।

প্রবন্ধটির পরবর্তী পর্বে সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এসেছে বিধবাবিবাহের কথা। বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে অতি নিপুণভাবে বিদ্যাসাগরের সামগ্রিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। দেখিয়েছেন, কোমলতা ও কঠোরতার মিশ্রণে বিদ্যাসাগর-চরিত্র কেমন করে মহিমময় হয়ে উঠেছিল। কেমন করে বালবিধবার দুঃখ দর্শনে তাঁর কোমল হৃদয় বিগলিত হয়েছিল আবার কেমন করেই বা তিনি দেশাচারের বাঁধ ভেঙ্গে, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজের সুকঠিন ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত রেখেছিলেন। গল্প বা কাহিনী নেই এখানে; অতি-বিস্তৃত বর্ণনাও নেই। অল্প কথায় লেখক এখানে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের দৃঢ়তা ও কমনীয়তাকে পরিস্ফুট করেছেন। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন, এই সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব কোথায়। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রে 'মরাল কারেজ' বলতে যা বোঝায়, বিদ্যাসাগর অন্ধভাবে তা'র অনুগামী হয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের কাজে এগোন নি। স্বাধীন আত্মাকেও স্থান, কাল ও পাত্র-বিশেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরাধীনতা স্বীকার করতে হয়, তা' তিনি জানতেন। বিদ্যাসাগরের এই বিশেষ ধারণার কথা দু'টি যুক্তি উপস্থাপিত করে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে প্রতিপন্ন করেছেন। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্বে বিদ্যাসাগর তাঁর পিতামাতার অনুমতি চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত একথা প্রমাণ করার জন্যে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন, বিধবাবিবাহ শেষ অবধি সাফল্যমণ্ডিত হয় নি; আমাদের সহৃদয়তার অভাবে দেশাচার শেষ অবধি জয়ী হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি দেশাচার নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তা যেন কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। প্রবন্ধটির

একেবারে শেষ দিকে লেখকের বিদ্যাসাগর-দর্শন-প্রসঙ্গ এবং বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত। সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এটি একটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য রচনা ; কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর নয় ; কারণ, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান নিয়ে কোনো প্রসঙ্গ এখানে নেই। তবে যতটুকু আছে এখানে, তা'রই মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের লোকোত্তর জীবনের মহিমময় দিকটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এই পরিচিতিতে সহায়তা করে রামেন্দ্রসুন্দরের তীক্ষ্ণ ভাষা ও সংহত প্রকাশ-ভঙ্গী। ভাষা ও প্রকাশরীতির এই বিশিষ্টতা প্রবন্ধটির আদ্যন্ত পরিরক্ষিত। আরম্ভেই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ বাঙ্গালী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরকে অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনারীতির এক বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে আরম্ভ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আচার্য ত্রিবেদী লিখেছেন,

> রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।
>
> এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তীটা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশির লড়াইয়ের কিছু দিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময় কুণ্ঠিত হইতে হয়।

'চরিত-কথা'র পরবর্তী প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১৩১৩)। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির মূলকথা এখানে অতি নিপুণভাবে আলোচিত। রচনারীতির উৎকর্ষের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধটির সঙ্গে এর তুলনা চলে। উভয়েই সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক পরিচয়কে উপস্থাপিত করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা কবিত্বময়, আর রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা যুক্তিধর্মী। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেন নি কোথাও ; সামগ্রিকভাবে এদের রসাস্বাদন করেছেন। অপরদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা বিশ্লেষণধর্মী। তবে রচনার উদ্দেশ্য উভয়েরই প্রায় এক। বঙ্কিমের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা থেকে উভয়েরই রচনা উৎসারিত। বঙ্কিমের স্মৃতিরক্ষার জন্যে আহূত সভায় উভয়েই প্রবন্ধ-পাঠ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি ক্লাসিক থিয়েটারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় পাঠ করা হয়েছিল। ঐ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৩১২ সালের ২৬ শে চৈত্র। সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুরাগীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হল, সেখানে মানবজীবনের ও জগৎসংসারের দু' একটা গোড়ার কথা সুন্দরভাবে দেখান হয়েছে। এই 'গোড়ার কথা' বলতে কী বোঝায়, প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে রামেন্দ্রসুন্দর তা' নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এ আলোচনায় তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্ট। হার্বার্ট স্পেন্সারের অনুসরণে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বলেছেন, "মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা এই যে, উহা আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা মাত্র"। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য-স্থাপনের নামই জীবন। যার জীবন আছে, তা'কে এই দু'দিকের টানা-টানির মধ্যে বাস করতে হয়। জীবনরক্ষার দুই উপায়,—আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। কিন্তু জীব নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে অনুক্ষণ জড়প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে নিরত। অতএব যা' মানুষের প্রবৃত্তির রাজ্য, যেখানে মানুষের পশুজীবন, সেখানে চলেছে জড়ে-জীবে নিরন্তর দ্বন্দ্ব। এর উপর সামাজিক জীবন মানুষের মধ্যে আর একটা নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। প্রবৃত্তি আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে। আর মানুষের ধর্মবুদ্ধি, যা' মুখ্যতঃ সমাজরক্ষার এবং গৌণতঃ আত্মরক্ষার অনুকূল, তা' মানুষকে অন্য পথের নির্দেশ দেয়। সামাজিক মানুষকে এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়ে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে কেবল চেষ্টা করতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, "এই সামঞ্জস্য স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতিক জীবন।" প্রবৃত্তি মানুষকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্মবুদ্ধি তাকে নিবৃত্তিমার্গের পথ দেখায়। এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়ে মানুষ হয়ে দাঁড়ায় কৃপার পাত্র। এখানেই মানুষের গোড়ায় গলদ। "এইখানেই অমঙ্গলের মূল, সংসার-বিষবৃক্ষের বীজ। ভগবানের সঙ্গে শয়তানের চিরন্তর বিবাদের মূল এইখানে।" মানুষের হৃদয় হল এই জীবনব্যাপী বিবাদের মহাক্ষেত্র, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ সেখানে অবিরাম চলছে। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের চারটি উপন্যাস—বিষ-বৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইলে এই গোড়ার কথাটা আলোচিত হয়েছে। ন্যায়-অন্যায় ও ধর্ম-অধর্মের মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে মানব-হৃদয় কিরূপ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র তা' সুন্দর করে দেখিয়েছেন। এজন্যেই তিনি উচ্চ-শ্রেণীর কবি। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য, উল্লিখিত চারটি উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রতাপ ও নগেন্দ্র, অমরনাথ ও গোবিন্দলাল সকলের হৃদয়ই ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধক্ষেত্র। ধর্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতার তারতম্য অনুসারে এদের কেউ বা ন্যায়ধর্মে জয়লাভ করেছেন, কেউ বা জয়লাভ করতে পারেন নি। এই চারজন মানুষের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে যখন আমরা পরিচিত হই, তখন কখনও বা মানব-চরিত্রের মহিমা আমাদের মুগ্ধ করে; আবার কখনও বা আমরা জাগতিক শক্তির কাছে মানুষের দুর্বলতা দেখে ভীত হই। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা—এই গোড়ার কথা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন এবং এজন্যে তিনি উচ্চ-শ্রেণীর কবি।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে ও মাসিকপত্র-জগতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণার কথা বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর থেকেই কিভাবে

বাংলা কথাসাহিত্য নবজীবন লাভ করল, রামেন্দ্রসুন্দর সংক্ষেপে তা' অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। উৎকৃষ্ট মাসিক-পত্রের প্রবর্তক এবং উৎসাহদাতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের কথাও এখানে সংক্ষেপে আলোচিত। রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গত সিদ্ধান্ত, বঙ্গদর্শনই প্রথম ভবিষ্যতের মাসিকপত্রের আদর্শ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণাতেই বাংলা দেশে নতুন নতুন উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য ও মাসিক-পত্রের সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র যশস্বী হয়েছেন, এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান বক্তব্য তা' নয়। তাঁর মতে, এর চেয়েও বড় কাজ বঙ্কিমচন্দ্র করে গেছেন। তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করে এদেশীয়দের 'আপন ঘরে' ফিরতে বলেছেন ; এবং এ বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য হয়েছেন, তেমন আর কেউ হন নি। বিদেশের ভাষাকে আশ্রয় করে আমরা যে বড় হতে পারব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্য সৃষ্টি করে বড় হবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, বঙ্কিমচন্দ্র তা' আমাদের বুঝিয়ে গিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, এ কাজই বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বড় কীর্তি। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে কার্যে অসমর্থ হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা' সহজেই সম্পাদিত করে গেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কার্য-সম্পাদনের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহপাশ ছিন্ন করেন নি, মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করে তার ভিতর আমাদের আহ্বান করেছিলেন ; এবং বাঙ্গালীরা একদিন সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল, ধর্মের সার্বভৌমিক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমুদয় বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য-বিধানকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা ধর্মের এই সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারি। এই ধর্ম-অন্বেষণের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নেন নি ; সাহায্য নিয়েছিলেন দেশীয় শাস্ত্রগ্রন্থ গীতার। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, সার্বভৌমিক ধর্মের বা প্রাদেশিক যুগধর্মের অন্বেষণের জন্যে আমাদের পরের সাহায্য নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা বাঙ্গালী একদিন গ্রহণ করেছিল। 'নবজীবন' ও 'প্রচার'কে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীকে যে দিন থেকে তিনি নিজ দেশের শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত করলেন, সে দিন থেকে সেই শাস্ত্র-কথা বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজে চলতে লাগল। ধর্মতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদেশ-পর্যটনে যেতে হয় নি। ঘরে বসেই তিনি ঘরে প্রত্যাবর্তনের ডাক দিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তিনি মাতৃমন্দিরে ফিরিয়ে আনলেন—এই হল রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য।

প্রবন্ধটির একেবারে শেষদিকে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত-সাগর মন্থন করে যে মূর্তিকে স্বদেশবাসীর সামনে স্থাপন করেছিলেন, তা যুগধর্মপ্রবর্তকের মূর্তি, তা' ধর্মরাজ্যসংস্থাপকের মূর্তি। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের সংঘর্ষ বাঁধলে যে মূর্তি নিয়ে তিনি আবির্ভূত হন, সেই মূর্তি। তিনি রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করে রাষ্ট্র রক্ষা করেন। জীবন-সংগ্রামে জীবন ধ্বংস করে তা' রক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর যথার্থই বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' আমরা যুগধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখতে পাই। তাঁর জীবনের শেষ দিকের প্রত্যেকটি কাজই বোধ করি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখে। বঙ্কিমচন্দ্রই

প্রথমে আমাদের কাছে যুগধর্মের আবশ্যকতা নির্দেশ করেছিলেন এবং যুগধর্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন, তাঁর মূর্তি আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের জীবনাদর্শের যে দিকটি অনুপস্থিত, রামেন্দ্রসুন্দর তা' নিয়েও এখানে আলোচনা করেছেন। এ দিক থেকে চিন্তা করলে অসংকোচে বলা চলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবনসাধনার একটি পরিপূর্ণ চিত্র এ প্রবন্ধে আছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১৩১১) চরিত-কথা পর্যায়ের একটি ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর কিছুদিন পরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে এক শোকসভার আহ্বান করেন। সেই সভায় রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ও ধর্মোপলব্ধির সামগ্রিক পরিচয় এখানে নেই। ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে কোনো কথা এ প্রবন্ধে বলা হয় নি। সনাতন ধর্মের বৃহত্তর দৃষ্টি-কোণ থেকেই তাঁকে এখানে দেখা হয়েছে; এবং এই সনাতন ধর্ম থেকে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করা হয় নি। কারণ, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, অন্যান্য দেশে ধর্মের সংজ্ঞা যা'ই থাকুক, আমাদের ভারতবর্ষে ধর্মের সংজ্ঞা 'আয়ত ও প্রশস্ত'। যা' ধরে আছে, তা'কেই ধর্ম বলা হয় এখানে। যা' মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে, এমনকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে আছে, আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তা'ই হল ধর্ম। সাহিত্য এর অঙ্গীভূত। ধর্মের ন্যায় সাহিত্যও এদেশে মানবজীবনের স্ফূর্তি ও লোকস্থিতির সহায়—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রামেন্দ্রসুন্দরের বক্তব্য হল এই যে, আমাদের পুরাতন সমাজ যখন স্বদেশের অজ্ঞানতায় ও বিদেশের অনাচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচীন ভারতীয় ধর্মাশ্রিত সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেন নিয়েছিলেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, মহর্ষি ছিলেন স্বাভাবিকতার পূজারী; অস্বাভাবিকতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। তিনি জানতেন, যার নাম ধর্ম, তা'ই হল স্বভাব এবং স্বভাবের অন্য নাম হল স্বাস্থ্য। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি এবং বিদেশী কু-প্রভাবের চাক-চিক্য আমাদের অস্বাভাবিকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছিল। লেখকের মতে, এই সত্যটি উপলব্ধি করার ফলেই দেবেন্দ্রনাথ অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে দেখাতে চেয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ সমাজে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন, তা আমাদের শিক্ষিত সমাজকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গসাহিত্যেও সে প্রভাব স্থায়িভাবে বিদ্যমান।

প্রবন্ধটির শেষদিকে রামেন্দ্রসুন্দর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা' হল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংযমই দেবেন্দ্রনাথের মহনীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল এবং এই স্বাতন্ত্র্য-সহকারে সংযমই ভারত-সমাজের প্রধান লক্ষণ। এ দিক থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদেরই উত্তরসাধক, রামেন্দ্রসুন্দর সে কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংযম দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ বলে লেখক নির্দেশ করেছেন,

এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহর্ষির পুত্রদের কৃতিত্বকে পিতার কৃতিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোনো উপায় নেই।

২

'চরিত-কথা'র দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাগুলোর মধ্যে পড়ে অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত এদেশীয় কয়েকজন মনস্বীর জীবনবৃত্তান্ত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'উমেশচন্দ্র বটব্যাল' (সাহিত্য, মাঘ ১৩০৫) শীর্ষক রচনাটি। কিভাবে প্রবন্ধ-লেখকের দৃষ্টি উমেশচন্দ্রের রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, আলোচ্য জীবন-কথার ভূমিকায় তা' সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। তারপর প্রদত্ত হয়েছে উমেশচন্দ্রের জন্মভূমি ও বংশ-পরিচয় এবং ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের তথ্যপূর্ণ বিবরণ। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে উমেশচন্দ্রের দার্শনিক দৃষ্টি, সাহিত্য-কীর্তি ও স্বদেশানুরাগের কথা বর্ণিত। এই বর্ণনার পূর্বে উমেশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কি ছিল, তা' অতি স্বল্প-পরিসরের মধ্যে নিপুণভাবে বলা হয়েছে। উমেশচন্দ্রের প্রতিভার যে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষমতাই ছিল না, ছিল তীক্ষ্নতাও, তিনি যে কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করতেন না, নূতন কথা বলতেন এবং পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলতেন এবং তার বর্ণনার গুণে স্বদেশের পুরাতন ইতিহাস যে রসের সামগ্রী হয়ে উঠত, সে কথা রামেন্দ্রসুন্দর অতি অল্প কথায় বুঝিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উমেশচন্দ্রের সমসাময়িক বাংলার অক্ষম লেখকদের সম্বন্ধে এবং আমাদের ইতিহাস-বিমুখতা ও স্বদেশানুরাগের অভাব সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর যে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উমেশচন্দ্র সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হল এই যে, এদেশের কৃতবিদ্যদের মধ্যে যে দু'চার জন মানুষ নিজের জাতিকে চিনতে চেষ্টা করেছেন, উমেশচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। আমাদের শিক্ষিত সমাজে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। কেন উচ্চে, তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধসমূহের কথা বলেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, উমেশচন্দ্র পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করে দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করতেন বটে, কিন্তু কেবল বৈদেশিক মতের অনুসরণ করতেন না, স্বাধীনভাবে নূতন পথে চলতেন। তাঁর এক একটি প্রবন্ধ বৈদিক কালের আর্য-সমাজের এক একটি চিত্র তুলে ধরত। এবং তা' থেকে পাঠকমানসে যে 'অস্পষ্ট স্মৃতি' এবং যে আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির সৃষ্টি হত, মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনার ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রবন্ধটির শেষ দিকে উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উমেশচন্দ্র যে সাংখ্যমতানুবর্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তিনি যে বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ—এই দুই স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, সে কথা বলা হয়েছে। উমেশ-চন্দ্রের দার্শনিক চিন্তাক্রমের অভিনবত্ব কোথায়, তা নিয়েও আলোচনা আছে এখানে। এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হল, সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তি বা দার্শনিক পারমার্থিক অভিব্যক্তি যে বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, একমাত্র উমেশচন্দ্রের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাতেই তা' স্পষ্টভাবে দেখান হয়েছে।

কিন্তু মনে যেন রাখি, উমেশচন্দ্রের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় উপকৃত হলেও রামেন্দ্রসুন্দর

তাঁর দার্শনিক মতবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। কেন পারেন নি, তার কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে এখানে। বলা হয়েছে, দার্শনিক দ্বৈতবাদ তার কাছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ হয় নি বলেই পারেন নি। বৈদান্তিক "সোঽহং" বাদটিই বিজ্ঞানদৃষ্টিতে সমীচীন বলে রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা। এ ছাড়া বেদের বহুদেববাদের মধ্যে উমেশচন্দ্র একেশ্বরবাদের আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন। উমেশচন্দ্রের এই মত নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে বলে রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা। কিন্তু সামাজিক ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত, তা' নিয়ে উমেশচন্দ্রের মতবাদে কোনোরূপ অস্পষ্টতা বা বিতর্কের অবকাশ ছিল না। এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র কী ধারণা পোষণ করতেন, তা' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর সিদ্ধান্ত করেছেন, "সমাজধর্ম পালনে তিনি চাতুর্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত সামাজিক ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন"।

সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয়,—দেশপ্রেমিক, সুপণ্ডিত ও সুলেখক উমেশচন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এখানে আছে।

'চরিত কথা'র দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাগুলোর মধ্যে উমেশচন্দ্র বটব্যালের পরেই উল্লেখযোগ্য রজনীকান্ত গুপ্ত সম্বন্ধে লেখা দু'টি প্রবন্ধ। এই দু'টি প্রবন্ধে আদর্শ সাহিত্যসাধক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক রজনীকান্তের জীবন-সাধনা ও চরিত্র-স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

প্রথম প্রবন্ধটি রজনীকান্তের মৃত্যুর পর সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করা হয়। এই রচনাটি পরে 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যা)। প্রথম প্রবন্ধটি দ্বিতীয়টির তুলনায় উৎকৃষ্ট। এখানে রজনীকান্ত গুপ্তের সাহিত্য-সাধনা বর্ণনার সূত্রে লেখকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় চিত্রিত। সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে রজনীবাবুর নিকট-সম্পর্কের কথা, রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেব-চরিতের সঙ্গে বালক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম-পরিচয় কাহিনী, রজনীকান্তের স্মরণীয় রচনা 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—প্রথম ভাগ পাঠ করে লেখকের আনন্দ ও উদ্দীপনা, এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ড পাঠের জন্য লেখকের ঐকান্তিক আগ্রহ, রজনীকান্তের প্রবন্ধ-সংকলন 'আর্য্যকীর্ত্তি' পাঠ করে লেখকের পরিতৃপ্তি, রজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর প্রথম-পরিচয় ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা এবং পরিশেষে রজনীকান্তের রোগভোগের ইতিবৃত্ত এ রচনাটিতে সুন্দরভাবে বর্ণিত।

রজনীকান্ত সম্বন্ধে লেখা দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথমটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত তথ্যবহুল। রচনাটির গোড়ার দিকে রজনীকান্তের পিতৃ-পরিচয়, বাল্যজীবন ও কলেজী-শিক্ষা, আয়ুর্বেদ-চর্চা ও বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রকাশের কথা তথ্যনিষ্ঠ ভাষায় বর্ণিত। প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে সাহিত্য-সেবাকে রজনীকান্তের জীবিকা হিসেবে গ্রহণের প্রসঙ্গ এবং দুঃখ-দৈন্য সত্ত্বেও সাহিত্য-চর্চায় তাঁর আন্তরিকতার কথা, 'এডুকেশন গেজেটে' প্রবন্ধ-রচনার কাহিনী, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা, তাঁর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ-রচনার ইতিবৃত্ত, রজনীবাবুর বন্ধুবাৎসল্য ও সারল্য, পরিষদের সেবা ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হিসেবে

তাঁর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং পরিষদকে ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষামূলক ও জনহিত-কর কার্যে তাঁর আত্মনিয়োগের কথা, রজনীকান্তের পরমতসহিষ্ণুতা, ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা এবং পরিশেষে তাঁর ভাষার ওজস্বিতা ও আন্তরিকতার কথা এবং ভাষা সম্বন্ধে তাঁর উদার মনোভাবের কথা আলোচিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আর একজন একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফীর চরিত-কথাও রামেন্দ্রসুন্দর লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদে আয়োজিত স্মৃতিসভায় তাঁর চরিত-কথাটি পাঠ করেন। পরে এই প্রবন্ধটি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' (বৈশাখ, ১৩২৩) পত্রিকায় 'স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী' নামে প্রকাশিত হয়। তবে ব্যোমকেশ মুস্তফীর এই জীবন-কাহিনী রামেন্দ্রসুন্দরের 'চরিত-কথা'য় স্থান পায় নি ; সাময়িক-পত্রে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে এই প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। এখানে অক্লান্ত-কর্মী এবং পরিষৎ-প্রেমিক ব্যোমকেশ মুস্তফীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবন-সাধনার ইতিবৃত্ত সশ্রদ্ধ ও আবেগস্পন্দিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর নিজে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। সে কারণেই দেখি, রজনীকান্ত গুপ্ত বা ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতো পরিষৎ-প্রেমিক যাঁরা, তাঁরাও রামেন্দ্রসুন্দরের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র। এই প্রবন্ধটিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ব্যোমকেশবাবুর নিবিড় ও অন্তরঙ্গ যোগাযোগের কথাই বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তা' ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে ব্যোমকেশবাবুর ব্যক্তিগত যোগসূত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার ফলে এই বর্ণনা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রামেন্দ্রসুন্দর যখন পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক তখন ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী। সে কারণেই ব্যক্তিগত যোগাযোগের সূত্রে ব্যোমকেশবাবুকে ভালভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন, পরিষদের সেবা করবার ক্ষমতাই শুধু নয়, ব্যোমকেশ মুস্তফীর সাহিত্য-রচনার ক্ষমতাও ছিল। ব্যোম-কেশবাবুর ঐ সাহিত্য-প্রতিভার কথা এবং তাঁর জীবন-ধর্মের বিশিষ্টতার কথা রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। বলেছেন, তিনি ছিলেন অযান্ত্রিক। সজীব হৃদয় ছিল তাঁর। ছিল কল্পনাশক্তি। আর কর্মে ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ। এই কর্মনিষ্ঠা, উদার কল্পনাশক্তি এবং সহৃদয়তাই রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। ব্যোমকেশবাবুর লোকান্তর রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে স্বজনবিয়োগের সামিল হয়ে উঠেছিল। সে কারণেই এই প্রবন্ধটির আদ্যন্ত স্বজনহারা, শোকাচ্ছন্ন রামেন্দ্রসুন্দরকে খুঁজে পাই আমরা।

উল্লিখিত রচনাটি যেমন, 'চরিত-কথা'র অন্যান্য কয়েকটি রচনাও তেমনি বরণীয় প্রতিভার তিরোভাবের অনতিকাল পরে রচিত হয়েছিল। মনীষীদের কর্মসাধনা ও চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই ছিল ঐ সব রচনার উদ্দেশ্য। এ দিক থেকে 'চরিত-কথা'র সর্বশেষ প্রবন্ধ 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' একটি ব্যতিক্রম। বলেন্দ্র-চরিত নিয়ে অতি অল্প কথাই এখানে আছে।

আসলে এটি হল বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনা। এ প্রবন্ধটি লেখাও হয়েছিল বলেন্দ্র-নাথের সাহিত্যপাঠের মুখবন্ধ হিসেবেই। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পরে তিনি ঐ ভূমিকাটিকেই 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নাম দিয়ে চরিত-কথায় সন্নিবিষ্ট করেন। এ রচনাটি আসলে বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-কথা, চরিত-কথা নয়। চরিত-কথার অন্যান্য রচনায় জীবনের যে উষ্ণ স্পর্শ আমরা অনুভব করি, এখানে তা' অনুপস্থিত।

বলেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গী কিভাবে লেখককে তাঁর রচনার প্রতি আকৃষ্ট করে, প্রবন্ধটির গোড়ার দিকে সে কথা আন্তরিকতার সঙ্গে বলা হয়েছে। তারপর আছে বলেন্দ্রনাথের ভাষা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা। বলেন্দ্রনাথ যে ভাবের উপযোগী ভাষা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর ভাষার যে একটি স্নিগ্ধ কোমল ঔজ্জ্বল্য ছিল, গদ্যের যে চিত্তাকর্ষক ঝঙ্কার ছিল এবং ভাবের সঙ্গে ভাষার মিলনে গড়ে ওঠা অপরূপ কলাকৌশল যে তাঁর রচনাকে কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করেছে, সে সব কথার সুন্দর ব্যাখ্যা আছে এই প্রবন্ধে।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বলেন্দ্রনাথের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব নিয়ে আলোচনা আছে। একদিকে কোনো-কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং অপরদিকে বাইরে দাঁড়িয়ে সমগ্রকে দর্শন করে নূতন নূতন সৌন্দর্য আবিষ্কারই যে বলেন্দ্রনাথের প্রধান কাজ ছিল, তা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে। এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক-ধর্মের মিলের কথা অতি সুন্দরভাবে বোঝান হয়েছে। সাহিত্যিক যেখানে সুন্দরের, বৈজ্ঞানিক যে সেখানে সত্যের আবিষ্কার করেন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দৃষ্টি যে একই দিকে, আবার উভয়েই যখন সেই সত্যকে ও সুন্দরকে শিবরূপে প্রতিপন্ন করেন, তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়ে যে তত্ত্ববিদ্যার পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়, সে কথা এখানে অতি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক-ধর্মের সাযুজ্য নিয়ে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, একদেশদর্শিতা, দৃষ্টিবিভ্রম ও দৃষ্টিবিকার থেকে মুক্ত হতে না পারলে এবং সাধনা ও সংযম অভ্যাস না করলে সত্য ও সুন্দরকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এই সাধনা ও সংযম ছিল বলেন্দ্রনাথের। তাঁর ভাষা ও ভাবগ্রাহিতাই তার প্রমাণ। ভাবের রাজ্য নিয়ে কারবার ছিল তাঁর ; অথচ তিনি যে অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন, এ কথা সাহিত্য-রসিকদের উদ্দেশ্যে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করেছেন।

প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে বলেন্দ্রনাথের রচনা বিশ্লেষণ করে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। যথার্থই বলেছেন, স্বাদেশিকতা ও সৌন্দর্যবোধই বলেন্দ্র-নাথের সাহিত্য-প্রতিভার সবচেয়ে বিশিষ্ট দিক। বালকবয়সেই প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন তিনি। আশৈশব তিনি বিদেশী শিক্ষার মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালীর ক্রিয়া-কর্ম ও সামাজিক প্রথায় যা' কিছু সত্য ও সুন্দর আছে, তার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি। তা' ছাড়া পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের নিকট-সন্নিধানে থেকেও তিনি নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাতে পেরেছিলেন। এখানেই তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতা। তবে রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় বলেন্দ্রনাথের নিজস্ব শক্তির স্পষ্টতর পরিচয়

মেলে। রামেন্দ্রসুন্দর দেখাতে চেয়েছেন, বলেন্দ্রনাথের কবিতার মূল্য গদ্য-রচনার সমান না হলেও কবিতায় তাঁর "নৈসর্গিক শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের অধিক স্ফূর্ত্তি আছে।" তবে বলেন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান ত্রুটি যে ভাবপ্রবণতা, রামেন্দ্রসুন্দর এ কথা অস্বীকার করেন নি।

প্রবন্ধটির শেষ দিকে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলেন্দ্র-চরিত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট দিক নির্লিপ্ততার কথাই লেখক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, বলেন্দ্রনাথের ভাষা, ভাব, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ পরিচয় এ প্রবন্ধে আছে।

৩

এই অবধি আলোচনা করা গেল 'চরিত কথা'র স্বদেশী মনীষীদের প্রসঙ্গ নিয়ে। এবার আমাদের আলোচ্য বরণীয় বিদেশী মনস্বীর জীবনকাহিনী। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'হর্ম্মান হেলম্‌হোলৎজ' (সাহিত্য, চৈত্র ১৩০১)। এ প্রবন্ধটি পূর্ববর্তী কয়েকটি চরিত-কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তুলনায় অনেক বেশী তথ্যবহুল। হেলম্‌হোলৎজের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ থেকে সুরু করে তাঁর শৈশব-শিক্ষা, ছাত্রজীবন ও উচ্চতর গবেষণা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান-জগতে তাঁর অবদানের কথা এখানে আলোচিত। সঙ্গত কারণেই হেলম্‌হোলৎজের বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার-প্রসঙ্গকে এখানে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিত ও মনোবিজ্ঞানে তাঁর অবদানের কথা এ প্রবন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। তবে এখানেও রামেন্দ্রসুন্দরের রচনারীতির বিশিষ্টতার নিদর্শন সুস্পষ্ট। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলোর মতো এখানেও দেখি, রামেন্দ্রসুন্দর চরিত-কথা লিখতে লিখতে বহু জায়গায় শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ-চিন্তার গভীরে অনুপ্রবেশ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে, হেলম্‌হোলৎজের শারীরবিজ্ঞান-চর্চার প্রসঙ্গ আলোচনার কালে অধঃপতিত ভারতবর্ষের দুরবস্থা দেখে লেখকের বেদনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়া জায়গায় জায়গায় সুন্দর উপমা ও কৌতুকরস প্রবন্ধটির দুরূহতা লাঘবে অনেকখানি সহায়তা করেছে। উদাহরণ হিসেবে একটি উপমার উল্লেখ করা যাক—

> স্নায়ুযন্ত্রের কার্য্য সংবাদ প্রেরণ; তবে এই সংবাদ প্রেরণে সময় আবশ্যক হয় কি না? তাড়িত প্রবাহযোগে বার্ত্তা প্রেরণেও কিছু-না-কিছু সময় দরকার; আলোকেরও সুদূরস্থ নক্ষত্র হইতে পৃথিবী পৌছিতে সময় দরকার হয়। স্নায়ুযন্ত্রের ভিতরে এই স্রোত কি বেগে প্রবাহিত হয়? হেলম্‌হোলৎজ প্রথমে দেখান, এই স্রোতের বেগ সেকেণ্ডে ষাটি হাত মাত্র; তাড়িতপ্রবাহ বা আলোকতরঙ্গের তুলনায় নগণ্য। অর্থাৎ কি না, একটি ষাটি হাত লম্বা তিমি মাছের লেজে বল্লমের খোঁচা বিঁধিলে মস্তিষ্কে তাহার খবর পৌছিতে অন্ততঃ এক সেকেণ্ড সময় লাগিবে; অথবা এক সেকেণ্ড পরে সে বুঝিবে যে, এত বড় একটা প্রাণঘাতক ব্যাপার উপস্থিত। আবার, আঘাতের পর মস্তিষ্ক হইতে আদেশ আসিয়া তাহার লেজ সরাইয়া লইতে অন্ততঃ আর এক সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হইবে।

শুনা যায়, ত্রেতা যুগের কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্ক হইতে কর্ণ দুই ক্রোশ তফাতে অবস্থিত ছিল। হে ত্রৈরাশিকজ্ঞ মানব, বল দেখি, কপিরাজ সুগ্রীব কর্তৃক উক্ত রক্ষঃপ্রবীরের কর্ণচ্ছেদন ব্যাপার সংঘটনের কতক্ষণ পরে তিনি টের পান?

কিন্তু কৌতুকরসাশ্রিত এই ধরনের বর্ণনার কথা স্মরণে রেখেও বলা চলে, জায়গায় জায়গায় এ প্রবন্ধটি একঘেয়েমিতার দোষে দুষ্ট। যেমন, শব্দবিজ্ঞান ও দৃষ্টিবিজ্ঞান সম্বন্ধে হেলম্‌হোলৎজের আবিষ্কারের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই সকল প্রসঙ্গে তথ্যকেই অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার ফলে মনে এরা বিশেষ কোনো রেখাপাত করে না। বরং হেলম্‌হোলৎজের জীবনের দু'টি একটি ঘটনার আলোকে বিষয়গুলো অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক হতে পারত। অবশ্য ঘটনা এ প্রবন্ধে একেবারেই নেই, এমন কথা বলা চলে না; কিন্তু যতটুকু আছে, তা' হেলম্‌হোলৎজ-চরিত্রের মহনীয়তাকে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। তবে এই ত্রুটির কথা স্মরণে রেখেও অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা চলে, বৈজ্ঞানিক-জীবন সম্বন্ধে এটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা। বর্ণনার প্রসাদগুণে অবৈজ্ঞানিক পাঠকরাও এ থেকে হেলম্‌হোলৎজের আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। ডাক্তারী থেকে জীববিদ্যা, তা' থেকে পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যা এবং তা' থেকে মনোবিজ্ঞান ও দর্শনরাজ্যে কিভাবে সত্যসন্ধানী হেলম্‌হোলৎজের বৈজ্ঞানিক-মানস অভিসারে বেরিয়েছিল, এ প্রবন্ধটি থেকে পাঠকরা তার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত পরিচয় পাবেন। জীবাণুর অবস্থিতিই যে পচনক্রিয়ার একমাত্র কারণ, এবং এই সত্যটির আবিষ্কারক যে হেলম্‌হোলৎজ; শারীর-বিদ্যায়, স্নায়ুযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে হেলম্‌হোলৎজের আবিষ্কার যে তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভা ও উদ্ভাবনশক্তির বিস্ময়কর উদাহরণ, তিনিই যে সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা, দৃষ্টিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক রহস্যের দ্বারও যে তিনি উন্মোচিত করেছেন, সৌন্দর্যতত্ত্বের মীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যে অতুলনীয়, তিনিই যে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মনস্তত্ত্বের জন্মদাতা, শক্তির অনশ্বরতাকে বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রতিপাদনের কাজে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সূর্যমণ্ডল থেকে সমাগত শক্তিকে জীবনপ্রবাহের কারণ বলে তিনিই যে প্রথম নির্দেশ করেছেন, জগদ্ব্যাপী ঈথরে জড়-পরমাণুর অস্তিত্ব যে তাঁরই আবিষ্কার এবং তিনিই যে প্রথম জ্যামিতি-স্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন, এ প্রবন্ধটি পাঠ করে তা' জানা যায়।

পরবর্তী প্রবন্ধ 'অধ্যাপক মক্ষমূলর' (ভারতী, মাঘ ১৩০৭) 'চরিত-কথা'র একটি বিশিষ্ট রচনা। মক্ষমূলরের খ্যাতির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট সম্বন্ধের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে।

মক্ষমূলর প্রধানতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার জন্যই আমাদের দেশে বিখ্যাত। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এই মনীষীকে দেখেছেন বৃহত্তর এক দৃষ্টিকোণ থেকে। সঙ্গত কারণেই তিনি মক্ষমূলরকে বহুভাষাবিদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তা' ছাড়া তাঁকে বলেছেন, ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তবে সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞতা লাভ করবার পর থেকেই যে তিনি নূতন ভাষাতত্ত্ব ও নূতন জাতিতত্ত্বের তথ্য-অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন, রামেন্দ্র-

সুন্দর তা' স্পষ্ট করেই বলেছেন। বলেছেন, কেমন করে তাঁর যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বিভিন্ন আর্য-ভাষার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ও বিচিত্র আর্যজাতিসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণে সাহায্য করেছিল। তা' ছাড়া আমরা যে আর্যবংশধর, এই পুরাতন সত্যটি নূতন করে জানবার জন্যেও আমরা মক্ষমূলরের নিকট ঋণী।

ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা হিসেবেও মক্ষমূলরের অবদান কতখানি গভীর ও সুদূরপ্রসারী, প্রসঙ্গতঃ তা' নিয়েও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। যথার্থই বলা হয়েছে, ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রচার মক্ষমূলরের জীবনের সর্বপ্রধান কাজ এবং ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য পাশ্চাত্য দেশে তিনিই প্রথম প্রচার করেন। ঋগ্বেদ-সংহিতার কালনির্ণয় করে ও প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করে কিভাবে তিনি আর্যসমাজের অবস্থা-নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং কেমন করে মানবজাতির অতীত ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন, তা' নিয়ে প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর দেখিয়েছেন যে, আমাদের বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করে এবং এদের সঙ্গে গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির প্রাচীন শাস্ত্রের তুলনা করে অধ্যাপক মক্ষমূলর "একটা অভিনব দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের স্থাপনায় প্রয়াসী" হয়েছিলেন। মক্ষমূলর দেখাতে চেয়েছিলেন যে, অতি প্রাচীনকালে আর্য জাতি যখন মধ্য-এশিয়ায় বাস করত, তখন তাদের একটা বিশিষ্ট ধর্মপ্রণালী ও উপাসনা-প্রণালী ছিল। পরবর্তী কালে আর্যদের বিভিন্ন শাখা যখন বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে প'ড়ল, তখন সেই প্রাচীন ধর্মপ্রণালীই ক্রমশঃ প্রাদেশিক বিকার ও পরিবর্তন সহকারে বিবিধ আর্য-ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। এইভাবে অধ্যাপক মক্ষমূলর আর্যদের দেবতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব অবলম্বন করে কিভাবে সমগ্র মানবজাতির ধর্মতত্ত্বের ইতিবৃত্ত নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর এ প্রবন্ধে তা' দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে মক্ষমূলরের বিশিষ্টতার কথাও আলোচিত। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখার আলোচনার কালেই যে মক্ষমূলর ভাষাতত্ত্বের সাহায্য নিতেন, রামেন্দ্রসুন্দর তা' বলেছেন। উদাহরণ হিসেবে মনোবিজ্ঞানের দুরূহ সমস্যার সমাধানে এই মনীষীর অবদানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্য-বিদ্যার পণ্ডিত হিসেবে মক্ষমূলরের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা নিয়ে আলোচনাতেই প্রবন্ধকারের সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি একান্ত অনুরাগই পণ্ডিত হিসেবে মক্ষমূলরের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ ইউরোপকে কী শিক্ষা দিতে পারে, তা' মক্ষমূলর দেখিয়েছেন। ভারতবাসীর প্রতি যে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং ভারতীয়রাও যে তাঁকে সত্যিকারের বন্ধু বলে মনে করত, কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর তা' বুঝিয়েছেন। প্রবন্ধটির একেবারে শেষদিকে মক্ষমূলর-চরিত্রের একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রবন্ধকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মক্ষমূলর যে ছোট কাজকে অবজ্ঞা করতেন না, সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখক এখানে তা' বুঝিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে প্রদত্ত মক্ষমূলরের উপদেশের কথাও মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্রুত মনীষী মক্ষমূলরের চরিত্র ও জীবনসাধনার একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতপ্রেমিক আনি বেসাণ্টও রামেন্দ্রসুন্দরের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিলেন। 'স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক অধ্যায়ে নানা-কথায় সংকলিত 'আনি বেসান্ট' নামক প্রবন্ধটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের রচিত বিভিন্ন 'চরিত-কথা'কে আলোচনা করলে একটি আদর্শ-চেতনা বিশেষভাবে নজরে পড়ে আমাদের। সেই আদর্শটি হল এই যে, ভারতের যাঁরা হিতৈষী, বাঙ্গালী জাতি এবং বিশেষ করে বাংলা ভাষার যাঁরা সেবক, রামেন্দ্রসুন্দর প্রধানতঃ তাঁদেরই জীবন-কথা রচনা করেছেন। 'আদর্শ জীবনী'র (১৩১৬) ভূমিকায় বাংলার সাহিত্য-সাধকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন,

> দৈনন্দিন জপমালা ঘুরাইবার সময় তাঁহাদের নাম স্মরণীয় ও উচ্চার্য্য। তাঁহাদের চারিত্র-পঞ্জিকা আমাদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিয়া আমাদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবে ; তাঁহারা যে নূতন ভাবের উৎস খুলিয়া দিয়া জাতীয় জীবনের স্রোতস্বতীকে তরঙ্গিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ভাবের আঘাত আমাদের জীবনের গতিতে বেগদান করিবে।

সাহিত্য-সাধকদের জীবন-সাধনা ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা যে আমাদের জাতীয়তা-বোধের উদ্বোধক হতে পারে, রামেন্দ্রসুন্দর তা' মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এই প্রসঙ্গে 'হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১০) শীর্ষক ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হয়েছে এখানে। এই কবির জাতীয়তাবোধের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক আমাদের জাতীয় ভাবের উদ্বোধন কামনা করেছেন।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয় স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের মহত্তর আদর্শ-প্রণোদিত হয়েই রামেন্দ্রসুন্দর চরিত-কথাগুলো রচনা করেছেন।

দশম অধ্যায়

ভাষাবিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দর

পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে দেখেছি, রামেন্দ্রসুন্দরের বহু রচনারই মূলে ছিল স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতি। এখানেও দেখব, এই স্বজাতি-প্রীতির বশেই তিনি মাতৃভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে সংস্কারের অভিলাষী হয়েছিলেন। বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের অবদানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। অপর অংশের আলোচ্য বিষয় হল বাংলায় বিজ্ঞানের পরিভাষা। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব এবং বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রধানতঃ ঐ সকল প্রবন্ধের মধ্যেই ভাষাবিজ্ঞানী রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা খুঁজে পাই। প্রবন্ধগুলিকে 'শব্দকথা' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে প্রায় সকল প্রবন্ধই রামেন্দ্রসুন্দর সংশোধন করেছিলেন। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় গ্রন্থটির একটি মাত্র সংস্করণই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত রামেন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে শব্দকথা সংকলিত হয়। শব্দকথায় দু' শ্রেণীর রচনা আছে। এক শ্রেণীর রচনায় বাংলা শব্দের ধ্বনি, কারক, প্রত্যয় এবং বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অপর শ্রেণীর রচনার আলোচ্য বিষয় হল বিজ্ঞানের পরিভাষা। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে ও পথে বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা' শীর্ষক অধ্যায়ে।

বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্বের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর কি অভিমত পোষণ করতেন, এখানে তা' নিয়ে আলোচনা করা যাক। শব্দকথার প্রথম প্রবন্ধ 'ধ্বনি-বিচার'-এ রামেন্দ্রসুন্দর কিছু নূতন কথা বলেছেন। এই প্রবন্ধটি রচনার মূলে ছিল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৭ম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতকে অনুসরণ করেই এই প্রবন্ধের লেখক বাংলায় প্রচলিত ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে সাজিয়েছেন। দেখিয়েছেন যে, "প্রত্যেক ধ্বনির একটা নৈসর্গিক তৎপরতা আছে—এই তৎপরতা প্রত্যেক ধ্বনির উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবিক গুণে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক ধ্বনি স্বভাবতঃ কাঠিন্য, তারল্য, কোমলতা, শূন্যগর্ভতা প্রভৃতি এক-একটা বস্তুধর্মের সম্পর্ক রাখে ও সহকারিতা রাখে ; এবং প্রত্যেক ধ্বনি শ্রুতিগত হইবামাত্র ঐ ঐ ধর্ম স্মরণ করায় বা ব্যঞ্জনা করে।" প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনিগুলির যে এক-একটা স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা আছে, রামেন্দ্রসুন্দর বহু উদাহরণ দিয়ে তা' বুঝিয়েছেন।

প্রত্যেক বর্গের অন্তর্গত ধ্বনির মধ্যে যে আবার অল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা, ঘোষবত্তা ও ঘোষহীনতার ভেদে সেই তাৎপর্যের যে ইতর-বিশেষ হয়ে থাকে, তা' নিয়েও এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তা' ছাড়া মূলে যা' ধ্বন্যাত্মক বা নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকৃতিজাত, তা'র অর্থ ও তাৎপর্য ক্রমে বিস্তারিত হয়ে ব্যঞ্জনার দৌড় ক্রমে বেড়ে যায়,—বাংলা ভাষা থেকে বহু দৃষ্টান্ত সংকলন করে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর এই বক্তব্যকে এখানে বুঝিয়েছেন। তবে সংস্কৃত ভাষা থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর মূল আকর্ষণের চেষ্টা তিনি করেন নি।

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব বিচারের এই প্রয়াস পরবর্তী প্রবন্ধ 'কারক-প্রকরণে'ও সুস্পষ্ট। ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশিয়ে বাংলা কারক-প্রকরণ রচনার প্রচেষ্টাকে তিনি অসঙ্গত মনে করতেন। বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্ধারণ করে কারক-প্রকরণের সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা কারক ও বিভক্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, বাংলা ব্যাকরণের কারক-প্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক। কারক তিনটি হবে কর্তা, কর্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক, যা'র বিভক্তি-চিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। করণ ও অধিকরণ এবং আর যে সকল পদের অর্থ ধরে কারক নির্ণয় দুরূহ, তা'রা এই তৃতীয় কাবকের অন্তর্গত হবে। সম্প্রদান কর্ম থেকে অভিন্ন, এ কথা প্রতিপন্ন করে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন যে, সম্প্রদান রেখে দরকাব নেই। তা' ছাড়া ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয়ের অভাবে অপাদান অস্তিত্বহীন এবং সম্বন্ধবাচক পদও কারক নয় বলে রামেন্দ্রসুন্দর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিভক্তি-চিহ্ন সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হল, বাংলায় বিভক্তি-চিহ্ন কেবল তিনটি,—'এ', 'র' এবং 'আ'। এই কয়টি বিভক্তি-চিহ্ন দরকারমত 'কে', 'তে' এবং 'দি'—এই ক'টি চিহ্নে যুক্ত হয়ে বাংলায় সমুদয় বিভক্ত্যন্ত পদ নিষ্পন্ন করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে বাংলা বিভক্তি-চিহ্নের বহু দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটির পরিশিষ্টে ঐ সকল দৃষ্টান্ত এবং বসন্তরঞ্জনবাবুর মন্তব্য সংকলিত হয়েছে।

শব্দকথার পরবর্তী প্রবন্ধ 'না' ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে একটি বিচিত্র প্রকৃতির রচনা। ব্যাকরণের শুষ্ক বিষয়কে অবলম্বন করেও যে অপূর্ব রসরচনা লেখা যায়, এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর তা' প্রতিপন্ন করেছেন। আর্যভাষায় 'না' একটি অতি প্রাচীন শব্দ। এই 'না' কে অব্যয় পদ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা এই শব্দটি কোনোরূপ বিভক্তি চিহ্ন গ্রহণ করতে চায় না। 'না' সাধারণ ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষণরূপে বসে। কিন্তু যে ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, সাধারণতঃ তাকে একেবারে উলটে দেয়। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, "এমন সর্ব্বনেশে বিশেষণ আর নাই।" ক্রিয়ার বিশেষণ হিসেবে তো বটেই, বস্তুর বিশেষণ এবং বিশেষণের বিশেষণ হিসেবেও 'না'-র ব্যবহার এখানে প্রচুর উদাহরণ সহযোগে বোঝান হয়েছে। এ ছাড়া 'না'-র নিকট-সম্পর্কের আরও তিনটি শব্দ 'নাই' 'নহে' ও 'নহিলে' নিয়ে এখানে সরস আলোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তী রচনা 'বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত' ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ নয়। কোনো একটি

প্রবন্ধের ভূমিকা হিসেবে এটি লেখা হয়। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র অষ্টম ভাগের তৃতীয় সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের আলোচনা করেছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় ব্যোমকেশ মুস্তফী এ নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক। ব্যোমকেশবাবুর প্রবন্ধের সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে তিনি যা' লিখেছিলেন, আলোচ্য রচনাটিতে সে কথাগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের মূল বক্তব্য, হল, খাঁটি বাংলা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি বিচারকালে কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলের উচ্চারণ ধরে বিচার করতে গেলে চলবে না। বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ একত্র মিলিয়ে মূল উচ্চারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক শব্দের যতগুলো আঞ্চলিক উচ্চারণ, ততগুলো প্রত্যয় নির্ধারণ করলে চলবে না। মূল উচ্চারণ বের করে মূল প্রত্যয় নির্ধারণ করতে হবে। তারপর সেই মূল বাংলা প্রত্যয় কোন্ প্রাকৃত বা সংস্কৃত প্রত্যয় থেকে এসেছে, তা' স্থির হবে।

শব্দ-কথার সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ।'[১] প্রবন্ধটিতে বাংলা সাহিত্যের-ভাষা ও লৌকিক-ভাষা নিয়ে আলোচনায় এবং বাংলা ব্যাকরণ-রচনার আদর্শ বর্ণনায় রামেন্দ্র-সুন্দর অপূর্ব মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের সমকালীন বাংলা সাহিত্য-সমাজের সুধীদের অনুরাগ ও অভিরুচির পরিপ্রেক্ষিতেই এই মননশীলতার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৬৩ বছর আগে। আমাদের সাহিত্য-সমাজের সুধীরা তখন দু' পক্ষ অবলম্বন করে দাঁড়িয়েছেন। এক পক্ষ সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী। তাঁরা সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় পার্থক্য বজায় রাখতে, এমন কি সেই পার্থক্য বাড়াতে চান। অপর পক্ষ সাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার মধ্যে এই পার্থক্য রাখতে চান না। তাঁরা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁদের মতে, ভাষার উদ্দেশ্যই যখন লোকশিক্ষা, তখন যে ভাষায় লোকশিক্ষা ভালভাবে সম্পাদিত হয়, তাকেই সার্থক ভাষা বলা চলে। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্র-সুন্দরের অভিমত হল, উভয় পক্ষের যুক্তিতেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে, এবং সে কারণেই উভয় পক্ষ ত্যাগ করে মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই মাঝামাঝি পথটা কেমন হবে, আমাদের সাহিত্যের ভাষা এবং লৌকিক বা কথোপকথনের ভাষা আলোচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর তা' দেখিয়েছেন। বলেছেন, উভয় প্রকার ভাষাতেই খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা শব্দ বিদ্যমান। উভয় ভাষাতেই কতক মিল আছে, আবার কতক পার্থক্যও আছে। সাহিত্যের ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দ লৌকিক ভাষার তুলনায় বেশী ব্যবহৃত হয়। আবার সংস্কৃতমূলক ও দেশজ, উভয় প্রকার খাঁটি বাংলা শব্দই লৌকিক ভাষায় দেখা যায়। এ ছাড়া প্রাদেশিক শব্দের ও প্রাদেশিক উচ্চারণের ভেদ লৌকিক ভাষায় যতটা বর্তমান, সাহিত্যের ভাষায় ততটা নয়। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, সাহিত্যের ভাষায় প্রাদেশিকত্বের বর্জনই প্রার্থনীয়। তাই বলে ইতর-জনবোধ্য সহজ ও সরল ভাষায় সাহিত্য-রচনার বিরুদ্ধতা করেন নি তিনি। আবার বাংলা সাহিত্যের ও

১। 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৩০৮ সাল।

কথাবার্তার ভাষায় অধিকতর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ গ্রহণে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। বরং সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারের দ্বারস্থ হলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে বলেই তাঁর ধারণা। তাই রামেন্দ্রসুন্দর এখানে স্পষ্টতঃই বলেছেন, আমাদের সাহিত্যের ভাষায় ও কথাবার্তার ভাষায় যখন এই দু' শ্রেণীর শব্দই প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, তখন বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ কোষগ্রন্থে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা, উভয়প্রকার শব্দকেই স্থান দেওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে তিনি যথার্থই বলেছেন, চেষ্টা করলে বরং খাঁটি সংস্কৃতকে কিছুটা পরিহার করা যেতে পারে, "কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালার সম্পূর্ণ পরিহার একেবারে অসাধ্য।" যাই হোক, সাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের সিদ্ধান্ত হল এই যে, এদের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। এই পার্থক্য বিলোপের চেষ্টা করা নিরর্থক। যে অংশের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, তা' লৌকিক ভাষার নিকটবর্তী হবে, আর যে অংশের উদ্দেশ্য শিক্ষিতের জন্য রসসৃষ্টি, তা' লৌকিক ভাষা থেকে দূরবর্তী হবে। কেবল এদেশে কেন, সকল দেশে ও সকল কালেই এই হল সাধারণ নিয়ম। সুতরাং এ বিষয়ে নতুন কোনো নিয়ম স্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক হবে বলেই রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা। নিজ নিজ রুচি ও উদ্দেশ্য অনুসারে, পাঠকের রুচি ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কেউ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের, আবার কেউ বা বাংলা শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী হবেন, এটাই স্বাভাবিক। সে কারণেই সংকীর্ণ কোনো নিয়ম জারি করলে কেউ তা' মানবে না বলেই রামেন্দ্রসুন্দরেব বিশ্বাস ছিল। তবে একটি সাধারণ নিয়ম স্থাপনের বাসনা ছিল তাঁর। সেই নিয়মটি হল এই—ভাষার মধ্যে শ্রুতিকটুতা ও অশ্রাব্যতা দোষ যথাসাধ্য পরিহার করে চলতে হবে, এবং অকারণে ভাষাকে দুর্বোধ্য করা চলবে না। আর যা' প্রকৃতই গ্রাম্য অর্থাৎ Slang, ভদ্র সমাজ যা'র উচ্চারণে কুণ্ঠিত, যা' প্রকৃতই অশ্লীল, তা' সর্বদা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধটির এ অবধি হল সাহিত্যের ভাষার গঠনপ্রণালী ও লৌকিক ভাষা নিয়ে আলোচনা। পরবর্তী অংশে এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়, বাংলা ব্যাকরণের গঠনপ্রণালী। 'ব্যাকরণ' বলতে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে বিশেষ একটি বিজ্ঞানশাস্ত্রকে বোঝাতে চেয়েছেন এবং শব্দটিকে তিনি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। Etymology ছাড়াও Syntax বা বাক্য-নির্মাণ-প্রকরণ, ছন্দঃ-প্রকরণ, এমন কি অলঙ্কার-প্রকরণকে পর্যন্ত তিনি ব্যাকরণেব মধ্যে স্থান দিতে চেয়েছেন। তিনি এখানে যে ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা'র উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নয়, উদ্দেশ্য নিজে শেখা, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে, তা' আলোচনার দ্বারা আবিষ্কার করা। সংস্কৃতের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যে অংশগুলোকে নিয়ে বাংলা ব্যাকরণ লেখা হত, রামেন্দ্রসুন্দর সেই সব আলোচনাকে বাংলা ব্যাকরণ বলেই স্বীকার করেন নি। বাংলার যে অংশ সংস্কৃত থেকে ধার করা নয়, যে অংশ খাঁটি বাংলা, সে অংশের ব্যাকরণ গড়ে তোলাই বাংলা ব্যাকরণ রচনার আদর্শ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অংশ বাংলায় প্রয়োগ হয় না, বাংলা ব্যাকরণে তার অনুবাদের প্রবণতা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কারণ তিনি যে ব্যাকরণের কথা ভাবতেন, তার উদ্দেশ্য নিয়ম আবিষ্কার। আর এই নিয়মের দিক থেকে বাংলা ভাষার বাক্য-রচনারীতি সব দিক দিয়ে সংস্কৃত বাক্য-রচনারীতির মত হতে

পারে না। কাজেই বাংলা ব্যাকরণের এই অংশে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে কিছু পার্থক্য থাকবেই। সাদৃশ্যও থাকবে, পার্থক্যও থাকবে। বাংলা ব্যাকরণে সেই সাদৃশ্য ও সেই পার্থক্য উভয়েরই বিচার করতে হবে। তা' যদি করা না হয়, তবে ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হবে না। বাংলা ভাষার অনাবিষ্কৃত নিয়মগুলো খুঁজে বের করতে না পারলে বাংলা ব্যাকরণ রচনার স্বপ্ন সফল হতে পারে না। এ ছাড়া বাংলা ব্যাকরণ রচনার আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তা' নিয়েও রামেন্দ্রসুন্দর এখানে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, অন্যান্য বিজাতীয় ভাষাতেই যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ গৃহীত হয়েছে, তখন বাংলা ব্যাকরণে সেই আদর্শ গ্রহণে কোনরূপ বাধা থাকতে পারে না। তবে সেই আদর্শ হবে প্রণালীগত। সে কারণেই ব্যাকরণ রচনার সময় বাংলা ও সংস্কৃতের তুলনা করে উভয় ভাষার মধ্যে প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও বৈষম্যের সূত্রগুলি খুঁজে বের করতে হবে। কেবলমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি বাংলায় তর্জমা করে দিলে চলবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলা ভাষার সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃত শব্দগুলোকে ব্যবহারকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন উচিত কি না? রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে বাংলা ভাষার প্রত্যেকটি শব্দকে কেটে, বিশ্লিষ্ট করে পরীক্ষা করতে হবে। কোনো শব্দকে অবহেলা করলে চলবে না। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে বাংলার তুলনা করতে হবে। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষাগুলোকেও পরস্পর তুলনা করতে হবে। পারিভাষিক শব্দরাশি সংকলন করে বিভিন্ন প্রদেশে এদের প্রচলন পরীক্ষা করতে হবে। এমন কি সমাজের অস্পৃশ্য সমাজের ভাষাকেও অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। এ সম্বন্ধে আবেগ-স্পন্দিত ভাষায় রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন,

> বাঙ্গালা ভাষার সমুদ্র আলোড়ন কর। ডুবুরির মত সাগরবক্ষে ঝাঁপ দাও। সমুদ্রগর্ভে শামুক ঝিনুক কঙ্কাল কঙ্কর মুক্তা প্রবাল যেখানে যাহা আছে, তুলিয়া আন। কাহাকেও বর্জন করিও না; কাহাকেও অগ্রাহ্য করিও না। কি জানি, কোন্ অবজ্ঞাত জঞ্জাল হইতে কি নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইবে; কি জানি, কোন্ অগ্রাহ্য কঙ্কর মাজিয়া ঘষিয়া দেখিলে কোন্ রত্নে পরিণত হইবে! ডুবুরির মত যাহা পাও, কুড়াইয়া আন। সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞের হাতে অর্পিত কর। জহুরি কোন্ উপলখণ্ড হইতে কি জহর বাহির করিবেন, কে জানে? যতদিন বিশেষজ্ঞের হাতে না পড়ে, ততদিন জাতীয় মিউজিয়মে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখ। সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে পার, উত্তম; তোমার পরিশ্রম বিশেষজ্ঞের সহায় হইবে। সাজাইতে না পার, রাখিয়া দাও। কিন্তু অবহেলা করিও না। অবহেলায় তোমার অধিকার নাই। 'অকিঞ্চিৎকর' বলিবার অধিকার তোমার নাই। 'গ্রাম্য ভাষা' বলিয়া অবজ্ঞার অধিকার তোমার নাই।

উপরে আলোচিত প্রবন্ধগুলো ছাড়াও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ভাষাবিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর মাঝে মাঝে আলোচনা করতেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অলঙ্কার শাস্ত্র' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬ ৩য় সংখ্যা) ও 'বাঙ্গালায় কর্তৃকারক' (মর্মবাণী, শ্রাবণ ১৩২২)। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা এখানে নেই। তবে বাংলা অলঙ্কার শাস্ত্রের রচনাপদ্ধতি সম্পর্কে

রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত কী ছিল, তা' এই রচনাটি থেকে জানা যাবে। এখানে আচার্য ত্রিবেদীর বক্তব্য হল, বাংলা সাহিত্যের জন্যে অলঙ্কার শাস্ত্র গঠন করতে হলে কেবল সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নির্ভর করে থাকলে চলবে না। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে বাংলা সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। আর দ্বিতীয় প্রবন্ধে·বাংলা ভাষায় 'কর্তৃক' শব্দটির ব্যবহার আলোচনা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, "ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বুঝাইবাব জন্য কর্তৃক এবং করণত্ব বুঝাইবার জন্য দ্বারা ব্যবহার করা উচিত।"

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, বাংলা ভাষার বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাকরণের সংস্কার রামেন্দ্রসুন্দরের কাম্য ছিল।

একাদশ অধ্যায়

সাহিত্য-সাধক রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দরের বহু-বিচিত্র মননশীল সাহিত্য-সাধনা নিয়ে আলোচনা করলে যে কথাটি বারবার মনে হয়, তা হল এই যে, সাহিত্য-সংসারে জানা এক জিনিস, জানানো আর এক; বোঝা এক কথা, বোঝানো অন্য এক। অনেকেই জানেন অনেক কিছু, কিন্তু জানাতে পারেন কই? ঠিক তেমনি বোঝেন অনেকেই, কিন্তু বোঝাতে পারেন ক-জন? ক-জন ৱপ্ত করতে পারেন জানার সঙ্গে জানানোর এবং বোঝার সঙ্গে বোঝানোর বিদ্যে? রামেন্দ্রসুন্দর পেরেছিলেন। তাঁর জ্ঞানের তরী ভারী ছিল। তাই ব'লে সে-তরীর গতি শ্লথ হয়নি কোনো দিন।

সাহিত্যের অনুকূল স্রোতে দর্শনের পাল খাটিয়ে বিজ্ঞান-রসিক রামেন্দ্রসুন্দর তরী বাইলেন চিরকাল—যে-নদী বহু বিচিত্র দেশ-দেশান্তরের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে প্রাণ ও জড়-জগতের শত-সহস্র বৈচিত্র্যকে পিছনে ফেলে দূরে বহুদূরে কোন এক নাম-না-জানা দেশের অনির্দেশ্য রহস্যময় লোকে চলে গেছে, সে-নদীতে তরী বাইলেন। সেই নদীপথের অভিজ্ঞতাকে লিখে গেলেন এমন সজীব ও সরস ভাষায়, বাংলার সাহিত্য-তীর্থের দেবমন্দিরে যার অকুণ্ঠ প্রবেশাধিকার। রামেন্দ্রসুন্দর তাই সাহিত্যিক—প্রথম শ্রেণীর মননশীল সাহিত্যিক। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও যশস্বী অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানী নন তিনি; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি দার্শনিক নন; সাহিত্যিকের রাজসম্মানই তাঁর প্রাপ্য। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলার চিন্তাশীল সাহিত্যরথীদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই। বিজ্ঞানের কুয়াসাচ্ছন্ন, রহস্যঘেরা জগৎ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর যে বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, সেখানে এমন কি রবীন্দ্রনাথও যেতে পারেন নি। তার কারণ, পথ-পরিক্রমার ময়ূরপঙ্খিতে বিজ্ঞানবিদ্যার যে-রসদ রামেন্দ্রসুন্দরের মজুত ছিল, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে দেখেছেন বাইরে থেকে, আর রামেন্দ্রসুন্দর দেখেছেন ভিতর থেকে। বিজ্ঞান-মহলের ভিতরে দাঁড়িয়ে অতি পরিচিতের অন্তরঙ্গ ও সন্ধানী দৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে দেখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এ দেখা শুধু নিজের জন্যে নয়, অপরকে দেখানোর জন্যেও বটে। এ জানা শুধু নিজের খাতিরে নয়, দেশের দশজনের খাতিরেও বটে। তাই বিজ্ঞান-মহলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা, যাঁরা বিজ্ঞানকে জানতে চান, অথচ জানবার মতো শিক্ষা নেই যাঁদের, তাঁদের জন্যে সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞান-রাজদরবারের খবর তিনি মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন।

স্বদেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি—স্বদেশের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা ও মাতৃভাষার

প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের এই সাহিত্য-প্রয়াস। এদেশের পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ, ধর্ম-কর্ম, বেদ-ব্রাহ্মণ সব-কিছু সম্বন্ধেই তাঁর এক সশ্রদ্ধ কৌতূহল ছিল। তাই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) লিখতে পেরেছিলেন তিনি। বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ দিয়ে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' (১৯১১) অনুবাদ করেছিলেন। জীবনের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে কর্মপ্রবৃত্তির মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন 'কর্ম-কথা'য় (১৯১৩)। ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে বেদপন্থীদের কু-সংস্কার দূর ক'রে বেদপন্থার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' (১৯১৪)। আর 'যজ্ঞ-কথা'য় (১৯২০) তিনি অনুপ্রবেশ করেছেন ভারত-সংস্কৃতির এক সুদুর্গম ক্রিয়াকাণ্ডে। মাতৃভূমির বরণীয় সন্তানদের প্রতি তাঁর যে কি গভীর শ্রদ্ধা, তার প্রমাণ মিলবে 'চরিত-কথা'য় (১৯১৩)। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে যে কি নিঃসীম নিষ্ঠা ছিল তাঁর, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতিকল্পে উপযুক্ত পরিভাষা-প্রণয়নে তিনি যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে 'শব্দ-কথা'য় (১৯১৭)। এ ছাড়া 'নানা-কথা'য় (১৯২৪) স্বদেশের বহু বিচিত্র সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এ দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।

স্বদেশপ্রেমিক ও বিজ্ঞান-রসিক রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-মানসে আগাগোড়া এক সংস্কার-বিমুক্ত বিজ্ঞান-চেতনা বর্তমান ছিল বলেই এগুলি সম্ভব হয়েছে। উদার ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে স্বদেশের ধর্ম-কর্ম ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দেখতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু মনে যেন রাখি, রামেন্দ্রসুন্দরের-জীবন ও সাহিত্যে দেখার চেয়েও বড় কথা দেখানো, জানার চেয়েও বড় সত্য জানানো। কোথায় দাঁড়িয়ে কিভাবে দেখলে সবটা দেখা যায় এবং কোথায় বসে কিভাবে বিচার করলে বিচারের সুবিধে হয়, তা তিনি জানতেন। আর জানতেন দেখাবার কৌশল, জানাবার পন্থা। রামেন্দ্র-সাহিত্য তাই রামেন্দ্র-দর্শনের দর্পণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিচারকের আসনে বসে বিজ্ঞানকে এমন ক'রে দর্শন করেন নি আর কেউ। বিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষমতা-অক্ষমতা দোষগুণ সত্য-মিথ্যা নিয়ে এমন চুলচেরা বিচার বাংলা সাহিত্যে আর কেউ কোনদিন করেন নি। তাই রামেন্দ্রসুন্দর শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার নন, বিজ্ঞানের ভাষ্যকারও বটে। শুধু ধর্ম-কর্মের লেখক নন, টীকাকারও বটে।

বিজ্ঞান-সূত্রের টীকা-টিপ্পনী-রচনায় তিনি অদ্বিতীয়। বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বরূপ-অন্বেষণের ক্ষমতায় তিনি অতুলনীয়। তাই ব'লে বিজ্ঞান নিয়ে গতানুগতিক প্রবন্ধ লেখেন নি তিনি। বৈজ্ঞানিক সত্যকে পাথেয় ক'রে তিনি বেরিয়েছেন জগৎ-রহস্যের মূল অনুসন্ধানে। বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁর কাছে শেষ কথা নয়, অশেষকে জানার উপকরণ মাত্র। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করছে বিজ্ঞান; কিন্তু কত রহস্য আজও অজানা থেকে গেল। প্রকৃতির আরও কত রহস্যের উত্তর-দানে বিজ্ঞান-বিদ্যা অক্ষম। তাই তাঁর প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'প্রকৃতি'তে (১৮৯৬) দেখি, বিজ্ঞানীদের সাধনায় বিশ্বজগতের রহস্য-যবনিকা কেমন ক'রে একে একে উন্মোচিত হচ্ছে এবং জগতের মূল রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞান-বিদ্যা কেমন ক'রে বিফল হচ্ছে, তারই কাহিনী। বিজ্ঞান-বিদ্যার এই

বিফলতা থেকেই 'জিজ্ঞাসা'র (১৯০৪) পরিকল্পনা। পরবর্তী রচনা 'বিচিত্র জগৎ'-এ (১৯২০) জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিসার।

জগৎ-রহস্যের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা যুগ যুগ ধরে বিশ্বের অনেক মনীষীই করেছেন ; কিন্তু সফল হননি কেউই। হয়ত কেউ কোনদিন সফল হবেনও না। এই অভিসার তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। রামেন্দ্রসুন্দরও ব্যর্থ হয়েছেন শেষ অবধি। কিন্তু জগৎ-রহস্যের গোড়ায় পৌঁছুতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন, বিশ্ব-প্রকৃতির যে রহস্যকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছেন, বাংলা-সাহিত্যের তা' এক অমূল্য সম্পদ্। বিষয়ের দুরূহতায় তাঁর রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয়নি। বৈজ্ঞানিক চিন্তার জটিলতায় তাঁর রচনা কোথাও দুর্গম হয়নি। বর্ণনার প্রসাদগুণ, জগৎ ও জীবনের প্রতি এক সহৃদয় দৃষ্টি এবং তার চেয়েও বড় কথা, এক আনন্দময়, সরস ও প্রফুল্ল বাগ্‌ভঙ্গিমা তাঁর রচনাকে এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক-গৌরবে অভিষিক্ত করেছে।

এই সাহিত্যিক-গৌরব ছাড়া আরও অনেক অনন্য-গৌরবের অধিকারী আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিজ্ঞানের তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, শিক্ষকও বটে। তাই দেখি, এদেশে যাতে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ঘটে সেজন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই। ছাত্রদের জন্য তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্য-বই লিখছেন। লিখছেন 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৯৩), 'ভূগোল' (১৮৯৮), 'বিজ্ঞান-পাঠ' (১৯০২) ও 'বিজ্ঞান-কথা'। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চিন্তার প্রসারের জন্য সরল বাংলায় লিখছেন 'জগৎ-কথা'র (১৯২৬) প্রবন্ধগুলি। রিপন কলেজের উঁচু ক্লাসে তিনি বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন বাংলা ভাষায়। সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করতে গিয়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার উপযোগিতার কথা বলছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানালোচনার উপযোগিতার কথা দেশবাসীকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

এক কথায় কর্মসাধক ছিলেন তিনি, জ্ঞান-তপস্বীও ছিলেন। কিন্তু এই কর্মসাধক বা জ্ঞান-তপস্বী নিজেকে দশজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি। জ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্যকে স্বার্থপরের মতো আপন চিন্তাজগতে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চাননি। তাই সাহিত্য-সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সাহিত্যের মাধ্যমে স্বীয় জীবনের সাধনালব্ধ সকল ঐশ্বর্যকে অকাতরে সকলের উদ্দেশ্যে দান ক'রে গেছেন এই পথিকৃৎ। আজ বাংলা সাহিত্যে তাঁর সেই দানের কথা আমরা যেন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কর্মযোগী, জ্ঞান-তপস্বী, সাহিত্য-সাধক ও বন্ধুবৎসল আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্দেশে অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি আজ এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন উপস্থাপিত করি—রামেন্দ্রসুন্দরের স্বপ্ন কবে সফল হবে? উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার কবে শুরু ক'রব আমরা? মনে-প্রাণে কবে আমরা পুরোপুরি ভারতীয় হব? কবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি আমাদের অবলুপ্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে আবার ফিরিয়ে আনব?

জীবন-কাহিনী

প্রথম অধ্যায়

গোড়ার কথা

জন্ম ও বংশ-পরিচয়, পিতা ও পিতৃব্য-কথা, জননী-প্রসঙ্গ

জন্ম ও বংশ-পরিচয়—১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে আগষ্ট) গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদীর ঔরসে এবং চন্দ্রকামিনী দেবীর গর্ভে জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে রামেন্দ্রসুন্দর জন্মগ্রহণ করেন।

এই জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণদের ইতিবৃত্ত আছে একটু। এখানে সংক্ষেপে সেটুকু বলা প্রয়োজন। জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণরা কনৌজিয়া বা কান্যকুব্জ শ্রেণীর একটি শাখা। পুণ্ডরীক গোত্রে উৎপন্ন ফতেসিংহ রাজবংশকে আশ্রয় করে কয়েক ঘর জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ ফতেসিংহ পরগনায় বাস করেছিলেন। জিঝোতিয়াদের আদি নিবাস হল মধ্যপ্রদেশের উত্তরে বুঁদেলখণ্ডের দক্ষিণাংশ। আর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি-মহকুমার অন্তর্গত সমগ্র কান্দি ও ভরতপুর থানা এবং বড়োঁয়া, গোকর্ণ ও খড়গ্রাম থানার অংশবিশেষ নিয়ে ছিল ফতেসিংহ পরগনা। বাঙ্গালা দেশে মোগল অধিকার স্থাপিত হবার সমসাময়িক কালে ফতেসিংহের জমিদারী পুণ্ডরীক বংশের সবিতা রায়ের অধীনে আসে।

এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেল। ১১৯৭ সালের ঘটনা। পুণ্ডরীক বংশের এক যশস্বী রাজা নীলকণ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ নামে দু'জন দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে নীলকণ্ঠ এই নাবালকদের দেখাশোনা করবার জন্যে সীতারাম ত্রিবেদী ও গদাধর ত্রিবেদী নামক দু'জন আত্মীয়কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। এই গদাধর ত্রিবেদী হলেন রামেন্দ্রসুন্দরের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ বৈদ্যনাথ ত্রিবেদীর অগ্রজ। গদাধরেরা চার ভাই ছিলেন। গদাধর সর্বজ্যেষ্ঠ। তারপর বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও রামনারায়ণ। চার ভাই একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত ছিলেন। এদের নিবাস ছিল জেমো থেকে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে টেঁয়া গ্রামে। জেমো হল কান্দি মিউনিসিপ্যালিটির একটি ওয়ার্ড। তখন মোট পাঁচটি ওয়ার্ড ছিল এই মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। ওয়ার্ড পাঁচটি হল কান্দি, জেমো, বাঘডাঙ্গা, রসোড়া ও ছাতিনাকান্দি। জেমো ও কান্দিকে একত্র করে অনেক সময় জেমোকান্দি বলা হয়। জেমোকান্দির পূর্বদিকে প্রায় চার ক্রোশ দূর দিয়ে ভাগীরথী নদী। ভাগীরথীরই তীরে হল উপরে উল্লিখিত টেঁয়া গ্রাম। এই গ্রামের প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন গদাধর ত্রিবেদী। বৈদ্যনাথ প্রমুখ অনুজদের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার অন্ত ছিল না।

বৈদ্যনাথের পিতার নাম ছিল দয়ারাম, পিতামহ হৃদয়রাম ও প্রপিতামহ মনোহররাম ত্রিবেদী। মনোহররাম অথবা হৃদয়রাম প্রথম বাঙ্গালা দেশে এসেছিলেন।

যাই হোক, গদাধব ও বৈদ্যনাথ ত্রিবেদীর কথা বলছিলাম। গদাধর অপুত্রক ছিলেন। বৈদ্যনাথের ঔরসে ও ত্রিপুরা দেবীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নবকিশোর ও বলভদ্র। বলভদ্রের জন্মকাল ১২০৫ সাল। এই বলভদ্রই হলেন রামেন্দ্রসুন্দরের প্রপিতামহ।

বলভদ্রের সঙ্গে পুণ্ডরীকবংশের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ীর বিবাহ হয়। শ্বশুর লক্ষ্মীনারায়ণের কাছ থেকে প্রচুর ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন বলভদ্র। সে কারণেই তিনি

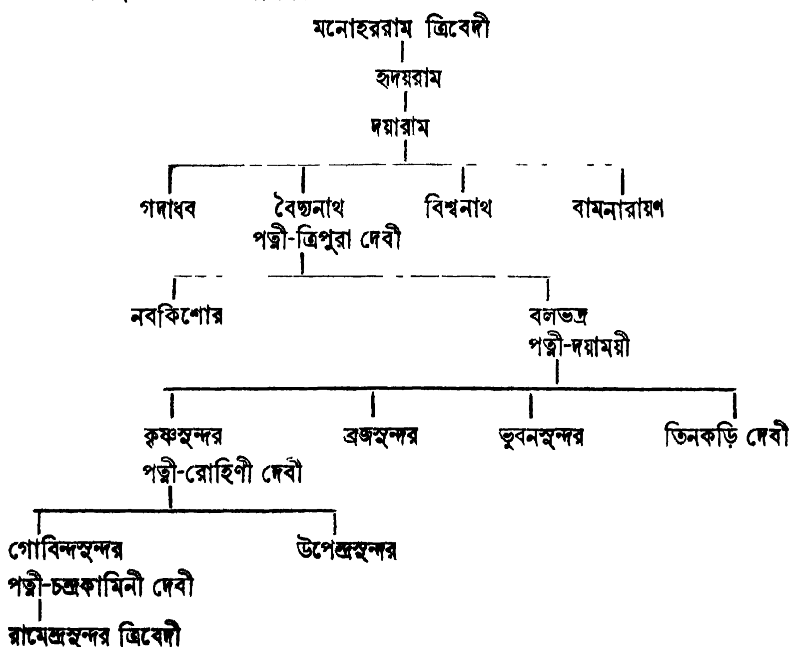
টেঁয়া গ্রাম ছেড়ে জেমোতে এসে বসবাস করতে থাকেন। এইভাবে বলভদ্র ত্রিবেদীর উদ্যোগেই জেমোর 'নূতন বাটী' স্থাপিত হয়েছিল।

বলভদ্র ত্রিবেদীর মৃত্যু হয় ১২৪৬ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ। তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদের নাম কৃষ্ণসুন্দর, ব্রজসুন্দর ও ভুবনসুন্দর। আর কন্যার নাম তিনকড়ি। কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনসুন্দর ও কন্যা তিনকড়ির অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণসুন্দর হলেন রামেন্দ্রসুন্দরের পিতামহ।

কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী জেমোকান্দি অঞ্চলে সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কৃষ্ণসুন্দর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর রোহিণী দেবীকে বিবাহ করেন। রোহিণীর দুই পুত্র,—গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর। এই গোবিন্দসুন্দরই হলেন রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা।

রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা, পিতৃব্য ও পিতামহ সকলেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। ছোট পিতামহ ব্রজসুন্দর ত্রিবেদী মাধব-সুলোচনা নামে একটি গদ্যপদ্যময় নাটক ও স্বর্ণসিন্দুর সিংহ বা গৌরলাল সিংহ নামে একটি বাঙ্গালা প্রহসন লিখেছিলেন। এ ছাড়া প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি-সংগ্রহেও তিনি অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্রজসুন্দরের জীবনের শেষ ছয় বৎসর পরিপূর্ণভাবে শাস্ত্রালোচনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। ১২৬৮ সালের ২রা চৈত্র তারিখে অগ্রজ কৃষ্ণসুন্দরের মৃত্যুতে তিনি নিদারুণ আঘাত পান। সেই সময় থেকেই সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন তিনি ; ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১২৭৪ সালের ২৩শে ফাল্গুন তাঁর মৃত্যু হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের বংশ-পঞ্জী নিম্নরূপ :



পিতা ও পিতৃব্য-কথা—রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য ও স্বজাতি-প্রেমিক ছিলেন। তিনি 'বঙ্গবালা' নামে একটি বাঙ্গালা উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসটির ভূমিকা পয়ার ছন্দে লেখা। এই ভূমিকাটি পাঠ করলে মনে হয়, আলস্য ও জড়তার মোহপাশে আবদ্ধ বাঙ্গালী জাতিকে তিনি দেশরক্ষার মুক্তিযজ্ঞে এবং কর্ম-কোলাহলের মধ্যে অবতরণের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তৎকালীন বাঙ্গালীর নিস্তরঙ্গ ও উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন জীবনকে তিনি প্রশস্তি জানাতে পারেন নি। যথার্থই দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি। সকল প্রকার সংকীর্ণতা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তির সাধনাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। পিতার অকৃত্রিম স্বদেশভক্তির ও মহত্তর জীবনসাধনার-সমুন্নত আদর্শ শৈশবকাল থেকেই পুত্র রামেন্দ্রসুন্দরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ ছাড়া গণিত, বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষে গোবিন্দসুন্দরের অনুরাগ ছিল। 'পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা'য় পিতার স্বদেশানুরাগ, জ্ঞান-স্পৃহা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,

> স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁর কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষ ঘটিত। স্বভাবপ্রদত্ত মেঘমন্দ্র স্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন। গণিতে, বিজ্ঞানে বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরক্তি ছিল। ইংরাজী না জানিয়াও জ্যোতিষশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অসাধারণ ধীশক্তি যথোচিত ফলোৎপাদনে অবকাশ পায় নাই। সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক শক্তির তিনি উপাসনা করিতেন। এই শক্তি যে আধারে অবস্থিত দেখিতেন, তাহার কোন দোষ সহজে তাঁহার চোখে পড়িত না। সর্ব্ববিধ ক্ষুদ্রতা ও কপটতা ও সঙ্কীর্ণতা ভয়ে তাহা হইতে বহু দূরে থাকিত। অসামান্য নির্ভীকতা ও সহিষ্ণুতা তাঁহার বন্ধুগণের নিকট কখন কখন গোঁয়াড়মি বলিয়া প্রতিভাত হইত।

ধর্মের ব্যাপারে গোবিন্দসুন্দর ছিলেন উদারপন্থী। তিনি নিজে শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলতেন। তাই বলে শাস্ত্রীয় আচারবিরোধী যারা, তাদের উপর কখনও বিরূপ হন নি। 'পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা'য় রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,

> পারমার্থিক বিষয়ে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ঈশ্বরের তুষ্টি বা রুষ্টির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন না। কোনরূপ কুসংস্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রসন্ন দৃষ্টি ছিল তাঁর। সে কারণেই কোনোদিন তিনি কারও নিন্দা করেন নি। তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। স্বদেশপ্রেমই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। একবার কান্দি দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির বিরাগভাজন হয়েছিলেন। প্রতিবাদের জন্যে বিরক্ত হয়ে ম্যাকেঞ্জি এমন কি তাঁকে শাস্তির ভয়ও দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিশৃঙ্খলা প্রতিপন্ন হল। সেই থেকে ম্যাকেঞ্জি গোবিন্দসুন্দরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন।

স্বদেশবাসীদের মধ্যেও তাঁর অনুরাগীর অভাব ছিল না। জেমো ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামবাসীরা বহুবিধ উপলক্ষ্যে তাঁর নিকটসম্পর্কে আসতেন। জেমোর নাট্যামোদী

লোকদের নিয়ে ১২৮৭ সালে তাঁরই উদ্যোগে একটি অভিনেতৃ সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল। অভিনয়ের জন্যে সাজ-সরঞ্জামও আনান হয়েছিল অচিরকালের মধ্যেই। ওখানে অভিনয়ের জন্যে গোবিন্দসুন্দর 'দ্রৌপদীনিগ্রহ' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটক লিখেছিলেন। এ ছাড়া অভিমন্যু-বধ অবলম্বন করে তিনি আর একটি নাটক লেখেন। কিন্তু এ নাটকটি অভিনীত হবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

গোবিন্দসুন্দরের মৃত্যুতে সমগ্র জেমোকান্দি অঞ্চল শোকাভিভূত হয়েছিল। কারণ, সে-অঞ্চলের সর্ববিধ সৎকার্যের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন। সদনুষ্ঠানে গোবিন্দসুন্দরের প্রধান সহযোগী ছিলেন পুণ্ডরীকবংশের এক মহিমময় পুরুষ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। নরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন মহীন্দ্রনারায়ণ রায়ের দত্তক-পুত্র। রূপে-গুণে, আচারে-আচরণে সব দিক দিয়েই তিনি আকর্ষণীয় ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে তিনি ছিলেন পিতৃ-প্রতিম। নরেন্দ্রনারায়ণ প্রসঙ্গে আচার্য ত্রিবেদী লিখেছেন,

> নরেন্দ্রনারায়ণ, গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দরকে লোকে তিন সহোদররূপে জানিত। আমিও জন্মাবধি তিন বাবা জানিতাম। নরেন্দ্রনারায়ণ জ্যেষ্ঠতাত, বড় বাবা; পিতা বাবা; খুল্লতাত ছোট বাবা।

অতএব দেখছি, আপন পিতৃব্য না হলেও এই নরেন্দ্রনারায়ণ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে পিতৃব্যের চেয়েও কিছু বেশি ছিলেন। পরে নরেন্দ্রনারায়ণের কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বিবাহ হয়।

আচার্য ত্রিবেদীর আপন পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দরও পরোপকারী ও সদাশয় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে জেমোর রাজবাড়ী থেকে প্রতিদিন শতাধিক দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। পিতৃব্যের চরিত্রাদর্শ ও সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন,

> পরকে আপনার করিবার ক্ষমতা তেমন আর কেহ দেখিবে না। তাঁহার অন্তঃকরণ বালকের ন্যায় সরল ও কোমল ছিল। তাঁহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রতিভা চন্দ্রমার ন্যায় পূত রশ্মি বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক সুধাসিক্ত করিত। সেই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের রশ্মিরাশিতে যে একবার অবগাহন করিয়াছে, আজীবন সে তাহা ভুলিবে না।
>
> সংস্কৃত শ্লোক রচনায় ছোট বাবার অসামান্য পটুতা ছিল। দ্রুতগতিতে মধুর পদ বিন্যাস করিয়া বিবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিতেন। স্বাস্থ্যাভাবে স্কুল পরিত্যাগে বাধ্য হওয়ার পরেও সংস্কৃত শিক্ষায় পরীক্ষার্থীর ন্যায় আগ্রহ ছিল। শেক্‌সপীয়ারের Pericles Prince of Trye অবলম্বন করিয়া একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস সংস্কৃত শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করেন।

জননী-প্রসঙ্গ—রামেন্দ্রসুন্দরের জননী চন্দ্রকামিনী দেবী রাশভারী প্রকৃতির ছিলেন। ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় লিখেছেন, "কম কথা বলেন, নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই চলাফেরা করেন, যাকে যেটা বলবেন সেটা তখুনি হওয়া চাই।" এ ছাড়া তাঁর চরিত্রে অন্য একটা দিকও ছিল। পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তিনি। ভক্তি ও প্রীতি ছিল তাঁর জীবনের মূল সুর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শৈশবকাল, ছাত্রজীবন ও বিবাহ

শৈশবকাল—বাল্যকালে রামেন্দ্রসুন্দর ক্ষীণকায় ও দুর্বল ছিলেন। অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকত। ঐ সময়ে এই ক্ষীণাঙ্গ শিশুটির নিত্য-সঙ্গী ছিলেন ছোট-পিতামহ ব্রজসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর তাঁর জন্মের দু'বৎসর পূর্বেই পরলোক-গমন করেছিলেন। কিন্তু ব্রজসুন্দর তাঁর অনুপম স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শে সেই অভাব পূরণ করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স যখন চার বৎসর তখন ব্রজসুন্দরের মৃত্যু হয়। এর পর থেকে বালক রামেন্দ্রসুন্দর পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দরের অনুগত হয়ে উঠলেন। উপেন্দ্রসুন্দর প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তাঁব এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে।

পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণ করার পর রামেন্দ্রসুন্দরের বিদ্যা-চর্চার আয়োজন হল। এই আয়োজন করলেন পিতা গোবিন্দসুন্দর ও পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর। পিতা ও পিতৃব্যের চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের বর্ণ-পরিচয় সমাপ্ত হল। বর্ণ-পরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ শেষ করবার পর গোবিন্দসুন্দর তাঁর পুত্রকে জেমোর পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। তখন ঐ পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন গোবিন্দসুন্দরের বন্ধু অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার।

স্নিগ্ধ ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন বালক রামেন্দ্রসুন্দর। সে কারণেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পাঠশালার সহপাঠী ও শিক্ষকদের ভালবাসা অর্জন করলেন। তা'ছাড়া শিশুকাল থেকেই গণিতে রামেন্দ্রসুন্দরের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। বয়স দশ বৎসর অতিক্রম করার পূর্বেই তিনি জ্যামিতি—১ম খণ্ডের যাবতীয় অনুশীলনী ও প্রতিজ্ঞার সমাধান করেছিলেন। এ ছাড়া পাটীগণিতেও তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। বালক রামেন্দ্রসুন্দর অনায়াসে পাটীগণিতের দুরূহ সমস্যার সমাধান করে দিতেন। শুভঙ্করী-বিষয়ক সমস্যা-সমাধানেও ছোটবেলা থেকেই তিনি সুপটু ছিলেন।

বালক রামেন্দ্রসুন্দরের মনে জ্ঞান-স্পৃহা উদ্রিক্ত করার পিছনে পিতা গোবিন্দসুন্দরের অবদান বড় কম নয়। গল্পের মাধ্যমে পুত্রকে ইতিহাস-শিক্ষা দিতেন তিনি। এদেশের বীরদের শৌর্যবীর্য ও আত্মত্যাগের কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করে বালক রামেন্দ্র-সুন্দরের প্রাণে স্বদেশানুরাগ সঞ্চারিত করতেন। আবার কখনও দূরের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে শিশু-পুত্রটির পরিচয় করিয়ে দিতেন তিনি। কার কি নাম এবং কেন তারা স্থান-পরিবর্তন করে তা' সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর তন্ময় হয়ে শুনতেন সে সব কথা। একবার যা' শুনতেন, কখনো তা' আর ভুলতেন না।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে ছয় বৎসর বয়সে রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম স্কুলে ভর্তি হন। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসরই প্রথম হতেন তিনি। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এগারো বৎসর বয়সে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন। ঐ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি গভর্নমেণ্ট-প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করেছিলেন।

শৈশবকাল থেকেই আশ্চর্য স্মরণ-শক্তির অধিকারী ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পাঠশালার পড়া তৈরি করতে বেশিক্ষণ সময় লাগত না তাঁর। বড় জোর একঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত প্রস্তুত হয়ে যেত। ছোটবেলা থেকেই একাগ্রচিত্ত ছিলেন তিনি। পড়াশুনায় তাঁর অভিনিবেশ ছিল অসাধারণ। বোধ করি সে কারণেই অপরের তুলনায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কোনো জিনিস আয়ত্ত করতে পারতেন।

খেলাধূলায়ও বালক রামেন্দ্রসুন্দরের উৎসাহ বড় কম ছিল না। তবে ক্ষীণজীবী ছিলেন বলেই দৌড়ঝাঁপে বড় একটা উৎসাহ পেতেন না তিনি। বসে বসে কড়ি খেলা অথবা খড়ি দিয়ে ঘর এঁকে বাঘবন্দী, ছক্কাপাঞ্জা প্রভৃতি খেলা তাঁর প্রিয় ছিল। আর প্রিয় ছিল নূতন নূতন বই পড়া। মনের মত কোন বই পড়তে পেলে সব কিছু ভুলে থাকতে পারতেন তিনি। এ ছাড়া ছোট বেলায় ফুলগাছের পরিচর্যা করেও রামেন্দ্রসুন্দর আনন্দ পেতেন। তবে তাঁর সবচেয়ে আনন্দের বস্তু ছিল বিদ্যা-চর্চা।

ইংরেজী স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী রামেন্দ্রসুন্দর কান্দি ইংরেজী স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। ঐ বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। যে শিশু বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করেছে তাকে দ্বিতীয় স্থানে নামতে দেখে পিতা গোবিন্দসুন্দর আঘাত পেয়েছিলেন; সেবার পুত্রকে বারবার করে বুঝিয়েছিলেন তিনি, "ক্লাসের পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই।" এর পর থেকে দ্বিতীয় স্থানে নামবার অগৌরব রামেন্দ্রসুন্দরের স্কুলজীবনে আর কোনদিনই ঘটে নি। সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হয়েছিলেন তিনি। তবে পাঠ্যবিষয়ই নয় শুধু, পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত বহু জ্ঞানগর্ভ বই পড়ে অল্প বয়সেই তিনি জ্ঞানজগতের অভিযাত্রী হয়েছিলেন। রামেন্দ্র-চরিতকার আশুতোষ বাজপেয়ী লিখেছেন, (রামেন্দ্রসুন্দর—পৃ: ৪১)

> এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়িবার সময় রামেন্দ্রসুন্দরের পাঠাভ্যাস-প্রবৃত্তি অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠে। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে তিনি নানা বিষয়ের নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া প্রভূত জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তখন তিনি এলফিনষ্টোন্, গ্রীন, হিউম, গিবন প্রভৃতি রচিত বড় বড় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর যখন কান্দি ইংরেজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর পিতা গোবিন্দসুন্দর পরলোকগমন করেন। পিতার মৃত্যুতে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দরের স্নেহস্পর্শে এই আঘাতের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠলেন তিনি। পরীক্ষায় সকলের উপরে থেকে পিতার মনোবাসনাকে পূর্ণ করার জন্য আবার তিনি একাগ্রচিত্ত হয়ে বিদ্যা-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কান্দি ইংরেজী স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলেন তিনি। পরীক্ষায় প্রথম হলেন। সেই সঙ্গে পেলেন গভর্নমেণ্ট প্রদত্ত মাসিক ২৫৲ বৃত্তি।

বিবাহ—১২৮৫ সালের ২৪শে বৈশাখ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বিবাহ হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স তখন ১৪ বৎসর। কান্দি ইংরেজী স্কুলের তখন তিনি বিদ্যার্থী।

কলেজ-জীবন ও উচ্চতর বিদ্যাচর্চা—এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে কলকাতায় এলেন ১২৮৮ সালের ২১শে মাঘ। প্রেসিডেন্সী কলেজে রামেন্দ্রসুন্দরের কলেজ-জীবন সুরু হল। আলাদা একটি বাড়ী ভাড়া করে উপেন্দ্রসুন্দর ভ্রাতুষ্পুত্রের থাকবার সুব্যবস্থা করলেন। ঐ বাড়ীতে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গী হলেন নৃসিংহপ্রসাদ ত্রিবেদী। নৃসিংহপ্রসাদ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দরের খুল্লতাত ছিলেন। তা' ছাড়া তিনি ছিলেন আচার্য ত্রিবেদীর বাল্যসঙ্গী। কলকাতায় মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন নৃসিংহপ্রসাদ। পরবর্তী কালে তিনি সুচিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কলেজ-জীবনের প্রবাসের দিনগুলি আনন্দময় হয়ে উঠল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে রামেন্দ্রসুন্দর বাইরের বই পড়ায় মেতে উঠলেন। পড়তে লাগলেন রাশি রাশি ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের বই। এইভাবে বাইরের বই পড়ায় অতিরিক্ত মনোযোগ দেবার ফলে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় তিনি প্রথম হতে পারেন নি; দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। যা'ই হোক, এ পরীক্ষায়ও বৃত্তি পেলেন রামেন্দ্রসুন্দর। ২৫৲ বৃত্তি এবং সেই সঙ্গে সুবর্ণপদক।

বি. এ. পড়বার সময় বিজ্ঞানের আনন্দসাগরে ডুব দিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এখন আর ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস-পাঠ নয়, বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যয়নে মেতে উঠলেন। সেই সঙ্গে সুরু করলেন বাংলা সাহিত্যের চর্চা। বি. এ পড়বার সময়েই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' ১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্য-চর্চা ও অধ্যয়নে বাধা পড়ল। প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দরকে হারালেন। পিতৃতুল্য পরম প্রিয় এই আত্মীয়ের লোকান্তরে রামেন্দ্রসুন্দর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। পড়াশুনায়ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি. এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এবার তিনি বৃত্তি পেলেন মাসিক ৪০৲ হিসাবে।

বৃত্তি পেলেন পরবর্তী পরীক্ষা এম্. এ-তেও। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে ঐ পরীক্ষা দিলেন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে (Natural & Physical Science) প্রথম স্থান অধিকার করে সুবর্ণপদক এবং ১০০৲ মূল্যের গ্রন্থ উপহার পেলেন। রামেন্দ্রসুন্দর যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখন সেখানে রসায়নবিজ্ঞান পড়াতেন পেড্‌লার সাহেব। তিনি রসায়নে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দেবার জন্য বারবার তাঁকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। বি. এ পরীক্ষায় রামেন্দ্রসুন্দরের রসায়নবিজ্ঞানের উত্তর-পত্র দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,—"আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি তন্মধ্যে এইখানি out and out the best."

এই পেড্‌লার সাহেবেরই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এম্. এ পরীক্ষার পর রামেন্দ্রসুন্দর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। বৃত্তির পরিমাণ ছিল ৮০০০৲। পরীক্ষকদের নির্দেশে ঐ বৎসর আর একজন ছাত্র ঐ বৃত্তি পেয়েছিলেন। তিনি হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন পরীক্ষা-নিয়ামক (Controller of Examinations) অবিনাশচন্দ্র বসু।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করার পর রামেন্দ্রসুন্দর কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটরীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঐ সময়ে প্রধানতঃ জীববিদ্যার গবেষণাতেই তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। এ ছাড়া কলেজের পাঠ শেষ করে রামেন্দ্রসুন্দর কিছুকাল আইনের ক্লাশও করেছিলেন। কিন্তু আইনের চর্চা কোনো-কালেই ভালো লাগে নি তাঁর। আইনের পরীক্ষাও তিনি দেন নি।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ : পারিবারিক জীবন

বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান—উচ্চতর বিদ্যা-চর্চার পর এবং ছাত্র-জীবন শেষ করে রামেন্দ্রসুন্দর গেলেন জেমোর পৈতৃক বাড়ীতে। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ এই দু' বৎসর কাটালেন সেখানে। পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুব পর থেকে তাঁদের জমিদারীর কাজে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। আচার্য ত্রিবেদী এবার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির শৃঙ্খলা-বিধানে তৎপর হলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান-প্রসঙ্গে আশুতোষ বাজপেয়ী লিখেছেন ,[১]

> লেখাপড়া শেষ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর বিষয়কর্মের শৃঙ্খলা-বিধানে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহাতে অনেকটা সুবিধাও ঘটে। এতদিন ধরিয়া ব্রজসুন্দর ত্রিবেদীর নামে যে উইল ছিল, তাহাব প্রোবেট লইবার আবশ্যক হয় নাই বলিয়া প্রোবেট লওয়া হয় নাই। রামেন্দ্রসুন্দর ঐ সময়ে (১২৯৪ সালে) উইল সৃষ্টির বিশ বৎসর পরে প্রোবেট লইয়া উইলের নির্দ্দেশমত কিঞ্চিৎ ভূ-সম্পত্তি খুল্লপিতামহী তিনকড়ি দেবীকে প্রদান করেন।
>
> রামেন্দ্রসুন্দর সপবিবারে কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিলে বিষয়ের অবস্থা পুনরায় পূর্ব্বের মত শোচনীয় হইয়া পড়ে। কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিবার পর তিনি আর কখন বৈষয়িক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবসর পান নাই, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টিও ছিল না।

কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ—রামেন্দ্রসুন্দর কর্মজীবন সুরু করেন, অধ্যাপক হিসাবে নয়, পরীক্ষক হিসাবে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ভূগোলেব পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি। জেমোতে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে রামেন্দ্র-সুন্দরের দিন কাটছিল তখন। পরীক্ষক নিযুক্ত হবার পর মাসখানেক তিনি এসে কলকাতায় রইলেন। তারপর পরীক্ষা-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম সেরে জেমোয় ফিরে গেলেন আবার। পরবর্তী বৎসর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দেও ভূগোলের খাতা-পরীক্ষার ব্যাপাবে কলকাতায় আসতে হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দরকে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্রটির কাছে কোন কোন জায়গা থেকে চাকুরীর লোভনীয় প্রস্তাব আসতে লাগল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। বাঙ্গালোর কলেজের অধ্যক্ষ ও তথাকার মানমন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের পদ খালি হল। শিক্ষাগুরু পেড্‌লার সাহেবের

১। রামেন্দ্রসুন্দর—আশুতোষ বাজপেয়ী ; চৈত্র ১৩৩০ ; পৃঃ ৫৮-৫৯।

ইচ্ছে ছিল, তাঁর প্রিয় ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ঐ পদটি গ্রহণ করেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বাংলার বাইরে যেতে রাজী হলেন না। কারণ, তিনি তখন তাঁর জীবনের পথ স্থির করে ফেলেছেন। বাঙ্গালীর শিক্ষা ও সাধনার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় থেকে বাঙ্গালা ভাষার সেবা করবেন, এই স্থির করেছেন। তাই দেখি, প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন তাঁকে নিযুক্ত করার প্রশ্ন উঠল, তখন জানালেন, কলকাতাতেই যদি তাঁকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়, তবে তিনি ঐ পদ গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। কর্তৃপক্ষ এতে রাজী হলেন না। সরকারী কলেজে চাকরী নেয়াও আচার্য ত্রিবেদীর পক্ষে সম্ভব হল না।

ওদিকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজে বি. এ ক্লাশে 'বি কোর্স' খোলা হল। বিজ্ঞান এই কোর্সের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত ছিল। রিপন কলেজের কর্মকর্তারা রামেন্দ্রসুন্দরকে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা করলেন। কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অমৃতচন্দ্র ঘোষ দেখা করলেন আচার্য ত্রিবেদীর সঙ্গে। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে রিপন কলেজে যোগ দেবার অনুরোধ জানালেন। রামেন্দ্রসুন্দর সম্মত হলেন এ প্রস্তাবে। অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ১২৯৯ সালের ৪ঠা আষাঢ় জেমো থেকে এলেন কলকাতায়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রিপন কলেজে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন।

পারিবারিক জীবন—রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-কথা বলতে বলতে অনেক দূর অবধি চলে এসেছি। এবার তাঁর পারিবারিক জীবনের প্রসঙ্গে আসা যাক। আগেই বলেছি, ১২৮৫ সালে ইন্দুপ্রভা দেবীর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের বিবাহ হয়েছিল। ইন্দুপ্রভার বয়স তখন আট বছর। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর চেয়ে বছর ছয়েকের বড় ছিলেন। ইন্দুপ্রভা বলতেন, "আমার বাবা ভোলা মহেশ্বরকে গৌরীদান করেছিলেন।"[১] ভোলা মহেশ্বর বলতে রামেন্দ্রসুন্দর। ঐ কিশোর বয়স থেকেই অনুক্ষণ বই-পত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। তাই বলে বালিকা-বধূর সঙ্গে খেলা-ধূলো যে একেবারেই হত না, তা' নয়। লুকোচুরি খেলা মাঝে মাঝে জমে উঠত। আর রামেন্দ্রসুন্দর খেলতে না চাইলে "কোমর বেঁধে ঝগড়া" করতেন ইন্দুপ্রভা।

এইভাবে দিন এগোতে লাগল ধীরে ধীরে। কৈশোরে যিনি ছিলেন ক্রীড়াসঙ্গিনী, যৌবনে তিনি স্থিতধী সহধর্মিণীর ভূমিকা নিলেন। সাংসারিক সকল দায়-দায়িত্ব ধীরে ধীরে এসে পড়ল ইন্দুপ্রভার উপর। পাকা গিন্নী ছিলেন তিনি। সংসারের সমস্ত দিকে তাঁর নজর থাকত। ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় লিখেছেন,

> তিনি ছিলেন পাকা গিন্নী, কে ঠিক সময়ে খেতে পেয়েছে, না-পেয়েছে, ঝিরা সব কোথায়, কাকে কোন্ সময়ে ওষুধ খাওয়াতে হবে, কার কাপড়-জামা হারিয়েছে—দিনের পর দিন দেখে চলেছেন।[২]

উদাসী রামেন্দ্রসুন্দর সংসারের কোনো খোঁজই রাখতেন না। ইন্দুপ্রভার উপর সমস্ত

১। ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর—ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। পৃঃ ১৪৩।
২। " " " " পৃঃ ৮৫।

ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। আর ইন্দুপ্রভা নিজে যেমন সুন্দরী ছিলেন, সংসারটিকেও তেমনি সুন্দর করে গুছিয়ে চলতেন।[১]

ইন্দুপ্রভা দেবীর গর্ভে রামেন্দ্রসুন্দরের দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। প্রথমা চঞ্চলা দেবীর জন্ম হয় ১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে। ১৩০২ সালের বৈশাখ মাসে বাঘডাঙা গ্রামের সৌরীন্দ্রগোপালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১২৯৬ সালের কার্তিক মাসে, অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দেবার পরের বছর ইন্দুপ্রভা দেবীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সন্তানটি এক বছর মাত্র জীবিত ছিল। ১২৯৭ সালের কার্তিক মাসে আচার্য ত্রিবেদীর দ্বিতীয়া কন্যা গিরিজা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। স্নেহ-প্রেমে, মায়া-মমতায় গিরিজা সকলের প্রিয় ছিলেন। ১৩০৯ সালের বৈশাখ মাসে যশোহর জেলার সামটা গ্রামের শীতলচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। গিরিজা দেবীকে না হলে রামেন্দ্রসুন্দরের চলত না। সে কারণে বিবাহের পরেও অধিকাংশ সময় তাঁকে পিতার কাছেই থাকতে হত। জামাতা শীতলচন্দ্রও প্রায়ই এসে শ্বশুরবাড়ীতে থাকতেন।

চঞ্চলা এবং গিরিজা উভয়েই কাব্যরসিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য উভয়েরই খুব প্রিয় ছিল। তবে উভয়ের প্রকৃতিতে পার্থক্যও ছিল প্রচুর। জ্যেষ্ঠা চঞ্চলা যথার্থই চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। আর গিরিজার স্বভাব ছিল শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির। চেহারার দিক থেকে পিতার সঙ্গে মিল ছিল চঞ্চলার। আর প্রকৃতির দিক থেকে মিল ছিল গিরিজার।

দীর্ঘকাল পরে ১৩১০ সালের শ্রাবণ মাসে রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি পুত্রসন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। কিন্তু জন্মের পরক্ষণেই তাঁর মৃত্যু হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের দেহত্যাগকালে একমাত্র জ্যেষ্ঠা কন্যা চঞ্চলা দেবী জীবিত ছিলেন। আর অনুক্ষণ তাঁর পাশে ছিলেন অনুজ দুর্গাদাস ত্রিবেদী। তাঁর শিক্ষা, বিবাহ, কর্ম-জীবন সব কিছুর সঙ্গেই রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল অন্তরঙ্গ যোগ। ১৩০০ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী গিয়ে তিনি দুর্গাদাসের এবং অপর এক ভাই রামকমলের বিবাহ দেন। পর বৎসর শরৎকালে রামেন্দ্রসুন্দর, ইন্দুপ্রভা ও ভাই রামকমল গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এঁদের বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন চিকিৎসকরা। ১৩০১ সালের মাঘ মাসের গোড়ার দিকে অসুস্থ স্ত্রী ও ভাইকে নিয়ে আচার্য ত্রিবেদী মুঙ্গের গেলেন। রামেন্দ্র-জননী চন্দ্রকামিনী দেবীও ছিলেন এঁদের সঙ্গে। মুঙ্গেরে প্রায় মাস তিনেক কাটল। এই দ্বিতীয়বার রামেন্দ্রসুন্দর বাংলার বাইরে গেলেন। এর আগে ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে অসুস্থা রাণী বিমলাসুন্দরীকে দেখতে তিনি কাশী গিয়েছিলেন একবার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রামেন্দ্রসুন্দর তৃতীয়বার বাংলার বাইরে যান ১৩১৩ সালের পূজার ছুটিতে। ঐবার পিতৃকৃত্য করতে গয়ায় গিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু মনে যেন রাখি, দেশভ্রমণ বা পারিবারিক দায়-দায়িত্বের খুঁটিনাটি নয়, সাহিত্য-চর্চা, দেশপ্রেম ও অধ্যাপনাই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মূল-মন্ত্র। পরবর্তী অধ্যায়ে আদর্শ শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্রসুন্দরকে নিয়ে আলোচনা করব আমরা।

১। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ১৩৬৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ ইন্দুপ্রভা দেবীর মৃত্যু হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্রসুন্দর

অধ্যাপনা, অধ্যক্ষতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

রামেন্দ্রসুন্দরের নেশা ছিল সাহিত্য-চর্চা, আর পেশা অধ্যাপনা। যৌবনের প্রারম্ভেই জীবনের লক্ষ্য-পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। কলকাতায় থেকে বঙ্গভারতীর সেবা করবেন, এই আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। সে কারণেই রিপন কলেজে যখন অধ্যাপনার প্রস্তাব এল, তখন তিনি সানন্দে রাজী হলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে রিপন কলেজে কাজ নিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। কলেজের ছাত্রদের হৃদয় জয় করে নিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গতানুগতিক পদ্ধতিতে তিনি কোনোদিনই শিক্ষা দেন নি। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বিশিষ্টতা ছিল। রসায়ন-বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে তিনি সরাসরি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন না। প্রথমে রাসায়নিক পরীক্ষা দেখিয়ে ছাত্রদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করতেন। তারপর পরীক্ষিত বিষয়-গুলো সরল করে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। এ ছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যায়ও তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। অনেক সময় গণিতের সাহায্য ছাড়াই এই শাস্ত্রের দুরূহ বিষয়গুলো তিনি ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। পড়াবার সময় তিনি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষারই সাহায্য নিতেন। তবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের দিকেই তাঁর প্রবণতা ছিল বেশী। এই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই একবার বলেছিলেন,[১]

> অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঙ্ঘমধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না।

অধ্যাপক হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্ব অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এফ্. এ. পরীক্ষায় রসায়নের পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি। ঐ বছরই সেনেটের সভ্য হলেন। সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল (১৮৯৪-১৯১৯) রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য ছিলেন। এ ছাড়া ১৮৯৯-১৯০৫ এই ৬ বৎসরকাল তিনি ছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গণিত, পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের "Mathematical & Experimental Board of Study"-র সভ্য। আচার্য ত্রিবেদী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts-এর সভ্য ছিলেন ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ অবধি। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতা

১। ১৩২০ সালের চৈত্র মাসে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত অভিভাষণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভূগোলের প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স তখন মাত্র ৩৫ বৎসর। এত অল্প বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরীক্ষকের সম্মান খুব অল্প লোকই লাভ করতে পেরেছেন।

এইভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যখন রামেন্দ্রসুন্দরের ডাক আসছিল তখন তাঁর কর্মক্ষেত্র রিপন কলেজ থেকেও উচ্চতর দায়িত্ব পালনের আহ্বান এল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর রিপন কলেজের অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ৬ মাসের ছুটি নিলেন। আচার্য ত্রিবেদীকে তখন ঐ কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল। ছুটি শেষ হবার পর অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য আর কাজে যোগ দিতে পারেন নি। তাই রামেন্দ্রসুন্দর এবার রিপন কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। সুদীর্ঘ ১৬ বৎসরকাল (১৯০৩-১৯১৯) তিনি রিপন কলেজে অধ্যক্ষতা করেছেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রিপন কলেজের Law এবং Art উভয় বিভাগেরই অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য ত্রিবেদী।

অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরের ঐকান্তিক চেষ্টায় কিভাবে রিপন কলেজের উন্নতি হয়েছিল এবার তা' নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। রিপন কলেজের সর্বপ্রধান কর্মকর্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এবং রামেন্দ্রসুন্দর উদ্যোগী হয়ে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজের পরিচালক সঙ্ঘ (Governing Body) প্রতিষ্ঠা করলেন। সুরেন্দ্রনাথ আর রামেন্দ্রসুন্দর ছাড়াও এই সঙ্ঘের সভ্য হলেন কয়েকজন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে কলেজের সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে আচার্য ত্রিবেদীর ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় রিপন কলেজে আই-এস্-সি শ্রেণী খোলা হয়। পর-বৎসর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে রিপন কলেজের Trust Deed বা ন্যাসপত্র সম্পাদিত হল। ন্যাসবক্ষী ছিলেন স্যার আশুতোষ প্রমুখ তৎকালীন বাংলার কয়েকজন মনস্বী। অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দব এই ন্যাসরক্ষী সমিতিব সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

এদিকে কলেজে স্থানাভাব-সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠল। তখনও নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না কলেজের। ভাডাটে-বাড়ীতে কলেজ বসত। প্রত্যক্ষদর্শী ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় লিখেছেন,

"তখন মির্জাপুব ষ্ট্রীটের ৬১ নং গোলাপী রঙের বাড়িতেই কলেজ বসত, তখনও রিপন কলেজের নিজস্ব বাডি হয় নি। কলেজে ঢুকেই ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক কোণে ছোট একটা ঘরে তিনি আর প্রফেসাররা বসতেন। অন্ধকার স্যাতসেঁতে চারদিকের নোনা-লাগা দেয়াল, একটি মাত্র জানালা, ঘরের তুলনায় খুব বড় হলেও তার মধ্যে সূর্যকিরণের যেন প্রবেশাধিকার নেই।" (ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর—পৃঃ ৯)।

সুরেন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর কলেজের নিজস্ব বাড়ী তৈরীর জন্য উদ্যোগী হলেন। প্রধানতঃ এঁদেরই অক্লান্ত চেষ্টায় কলেজের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে অর্থ সংগৃহীত হতে লাগল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট বাঙ্গালার গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড বেকার রিপন কলেজের নতুন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করলেন। বাড়ী তৈরীর কাজ এগোল অতি দ্রুতগতিতে। সঙ্গে সঙ্গে নির্মিত হতে লাগল রিপন কলেজ স্কুলের নতুন বাড়ীটি। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রিপন কলেজ নতুন বাড়ীতে উঠে এল। কলেজের চেহারারও হল আমূল পরিবর্তন। নতুন

বাড়ীতে দু'টি বড় বড় ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছিল। তা' ছাড়া গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ, ক্লাশঘর—কোনোদিক দিয়েই কলেজের স্থানাভাব সমস্যা আর রইল না। ছাত্রসংখ্যাও বেড়ে চলল দ্রুতগতিতে। ভাড়াটে বাড়ীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৬০। এখন তা' বেড়ে ১২০০-তে দাঁড়াল। রামেন্দ্রসুন্দরের অধ্যক্ষতার সময়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রায় দু' হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কলেজের নিজস্ব ভবনে বি. এ অনার্স ক্লাশে গণিত ও সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা হল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মূলতঃ রামেন্দ্রসুন্দরেরই উদ্যোগে রিপন কলেজে বি. এস-সি শ্রেণী খোলা হল। এতদিন রামেন্দ্রসুন্দর বি. এ ক্লাশে রসায়ন পড়াতেন। এবার তিনি রসায়ন পড়াবার ভার অন্য অধ্যাপকের উপর ছেড়ে দিয়ে বি. এস-সি ক্লাশে পদার্থবিজ্ঞান পড়াতে লাগলেন।

অধ্যক্ষ হিসাবে রামেন্দ্রসুন্দরের খ্যাতির কথা ছড়িয়ে পড়লে বহু জায়গা থেকে লোভনীয় সর্তে চাকুরীর প্রস্তাব এসেছিল। কাশিমবাজারের মহারাজা তাঁকে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ করেন। কলকাতার National College থেকেও উচ্চ মাইনেতে চাকুরীর প্রস্তাব এসেছিল। আর প্রস্তাব এসেছিল কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাছ থেকে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর সমস্ত প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ রিপন কলেজকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। ঐ কলেজ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি তিনি। রিপন কলেজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-বিধানই তাঁর কাম্য ছিল। আর কলেজ-পরিচালনাতেই নয় শুধু, ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ। আচার্য ত্রিবেদীর অধ্যাপনা সম্বন্ধে আশুতোষ বাজপেয়ী লিখেছেন,[১]

> অধ্যাপনার সময় তিনি কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস মত তিনি স্বমতে পড়াইবার একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। পড়াইতে আরম্ভ করিলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত, ৫০ মিনিটে ঘণ্টা, সময় পরিবর্ত্তনসূচক ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না, কোন কোন দিন এক ঘণ্টার স্থলে তিন ঘণ্টাও পড়াইতেন।

বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়কে রামেন্দ্রসুন্দর অনেক সময় গল্পের ছলে ব্যাখ্যা করতেন। অন্তরঙ্গভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিশে জানবার চেষ্টা করতেন, কার কোথায় অসুবিধা। তাই বলে অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দেন নি কোনোদিন। এমন কি, রিপন কলেজের কর্ণধার সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ভবশঙ্করও অন্যায় করে তাঁর কাছ থেকে রেহাই পায় নি। আবার ছাত্রদের মধ্যে যখন কলহ বাধত, তখন তিনি নিজে গিয়ে তা' মিটমাট করে দিতেন। ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহ ছিল তাঁর। সে কারণেই অফিসের মাধ্যমে আবেদন-পত্র গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। ছাত্রদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তিনি তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতিবিধান করার চেষ্টা করতেন। যথার্থই আচার্য ত্রিবেদী ছিলেন এক দরদী অধ্যক্ষ। ছাত্রদের জরিমানার টাকা কলেজ ফাণ্ডে

১। রামেন্দ্রসুন্দর—পৃঃ ১০১।

জমা না দিয়ে দরিদ্র ছাত্রদের ভাণ্ডারে জমা করে রাখতেন। কোমল ও কঠোরের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। দরিদ্র ছাত্র যাঁরা, যাঁরা আগ্রহ সত্ত্বেও লেখা-পড়ার ব্যয় বহনে অক্ষম তাঁরা তাঁর কুসুম-কোমল রূপটির পরিচয় পেত। বহু দরিদ্র ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতেন তিনি। কিন্তু কলেজে যে সব ছাত্র নৈতিক অপরাধ করত, তাদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর। ছাত্রদের উপদেশ দেবার সময় বারবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, তাঁরা ভারতীয় ছাত্র। তাঁদের উপরেই ভারতবর্ষের খ্যাতি-অখ্যাতি নির্ভর করছে।

ছাত্রদের অকৃত্রিম ভালবাসা লাভ করেছিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। ভিন্ন কলেজ থেকেও অনেক ছাত্র এসে নিয়মিতভাবে তাঁর ক্লাশ করত। এ ছাড়া উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে আচার্য ত্রিবেদীর ছাত্রদের বিশেষ একটা মর্যাদা ছিল।

অধ্যাপকদের প্রতিও তাঁর ছিল অপরিসীম স্নেহ-প্রীতি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্র-সুন্দরেরই উদ্যোগে রিপন কলেজে একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ ঐ সঙ্ঘের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ সমিতিতে অধ্যাপকরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনও বা করতেন প্রবন্ধ পাঠ। অধ্যাপকদের প্রবন্ধ-রচনায় অনুপ্রাণিত করতেন রামেন্দ্রসুন্দর। নতুন অধ্যাপকদের সাহিত্য-চর্চা ও অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করতেন। কোন্ অধ্যাপকের প্রবণতা কোন্ দিকে, সব সময় তিনি তা' লক্ষ্য করতেন। অধ্যাপকদের মধ্যে যা'তে জ্ঞানস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়, যা'তে তাঁরা "বাণীর সেবায়" আত্মনিয়োগ করতে পারে, সব সময় সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এবং নিজে যা' বলতেন তিনি, আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে তা' প্রতিষ্ঠিত করতেন। সে কারণেই দেখি, অধ্যাপক-সঙ্ঘে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ-পাঠ করছেন রামেন্দ্রসুন্দর। নিজে লিখে, আলোচনায় কার্যকরী অংশ গ্রহণ করে অন্য সবাইকে অনুপ্রাণিত করছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'বিচিত্র জগৎ'-এর অনুপম প্রবন্ধগুলো অধ্যাপক-সঙ্ঘেই প্রথম পাঠ করা হয়েছিল।

আজকের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের রামেন্দ্রসুন্দরের দিকে তাকাতে অনুরোধ করি একবার। এই অধ্যাপক কৃত্রিম গাম্ভীর্যের পরিমণ্ডল রচনা করে ছাত্রদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন না। এই অধ্যক্ষ সহকর্মী অধ্যাপকদের সঙ্গে ব্যবধান-সৃষ্টিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। অধ্যাপকদের ঘরই ছিল তাঁর ঘর। অধ্যক্ষের জন্যে নির্দিষ্ট আলাদা কোনো ঘরে বসবার পক্ষপাতী ছিলেন না রামেন্দ্রসুন্দর। সহকর্মীদের ঘরে বসে একসঙ্গে কাজ করেই তিনি আনন্দ পেতেন। আলোচনাও চলত বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে। আশুতোষ বাজপেয়ী লিখেছেন,

> কখনও বা বৈদিক যজ্ঞ, কখনও বা ইহুদী জাতির ইতিহাস, কখনও বা প্রাচীন গ্রীসের ব্যক্তিসর্বস্বতা, কখনও বা বৌদ্ধদর্শন, কখনও বা বৈষ্ণবতত্ত্ব, এইরূপ একটা না একটা বিষয় লইয়া সরস আলোচনা চলিত।[১]

১। রামেন্দ্রসুন্দর—পৃঃ ১১৯।

রিপন কলেজের গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যেও রামেন্দ্রসুন্দর অশেষ পরিশ্রম করেছেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে প্রধানতঃ তাঁরই প্রযত্নে কলেজ-গ্রন্থাগারের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। তিনি অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ ও দেবপ্রসাদ ঘোষকে গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনের জন্যে নিযুক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কলেজ-গ্রন্থাগারের জন্যে গ্রন্থ ক্রয় করবার সময় আচার্য ত্রিবেদী শুধুমাত্র নিজের অভিরুচিকেই গুরুত্ব দিতেন না ; সকলের রুচি ও প্রবণতার দিকেই লক্ষ্য রাখতেন।

এ ছাড়া ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রিপন-কলেজ-পত্রিকাও অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরেরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ছাত্র ও অধ্যাপকদের লেখা বহু সুলিখিত প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় স্থান পেল। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই রচনাদি প্রকাশিত হ'ত।

এই ভাবে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরের সুযোগ্য পরিচালনায় বিভিন্ন দিক দিয়ে রিপন কলেজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। অপরিণত অবস্থা থেকে ঐ কলেজকে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে গেছেন তিনি। কিন্তু মনে যেন রাখি, কলেজের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্রসুন্দরের কর্মসাধনা আবদ্ধ ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যের সঙ্গেও তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ যোগাযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগেরই পাঠ্যসূচী নির্বাচন, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে, যেখানে শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্র-সুন্দরের শিক্ষক-জীবনের প্রাথমিক পর্ব নিয়ে আলোচনা আছে, সেখানে তার আভাস দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রবীণ শিক্ষাব্রতীকে নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথা আরও একটু খোলসা করে বলা যাক।

রামেন্দ্রসুন্দর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন নি বটে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানেব বিভিন্ন কল্যাণকর ও গঠনমূলক কার্যের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৯০ থেকে ১৯১৯ সাল—এই ত্রিশ বৎসর কাল তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক, বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষার মর্যাদাকে স্বীকার করুক, এই ছিল তাঁর আদর্শ। কী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান শাখার (Faculty of Arts and Science) সভ্য থাকবার সময় (১৯০৭-১৯১৯), কী সংস্কৃত ও ভূগোল-পাঠচক্রের (Board of Study) সভ্য হিসাবে, আবার কী গাণিতিক ও পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের পাঠচক্রের (Board of study—Mathematical and Experimental Physics) সভাপতি থাকাকালীন—সকল সময়েই তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এ ছাড়া পরীক্ষক হিসাবেও তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা ছিল অসাধারণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক হিসাবে চরম দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তিনি। এফ. এ পরীক্ষার পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান পরীক্ষকরূপে (১৯০৮, ১৯১০-১২) এবং এফ্. এ (১৯০৯) ও বি. এ পরীক্ষার (১৯১৯) বাংলা ভাষার প্রধান পরীক্ষকরূপেও তিনি কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া বি. এ ও বি. এস্ সি পরীক্ষায় (১৯১৩-১৯১৭) পদার্থবিদ্যার

(অনার্স) ও রসায়নবিত্তায় (১৯১৪) এবং এম্. এ ও এম্. এস্ সি পরীক্ষায় (১৯১৭) রসায়নশাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন তিনি। ১৯১৫ থেকে ১৯১৬ এই দু' বৎসর আচার্য ত্রিবেদী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের পরীক্ষক-মণ্ডলীর (Board of Examiners) সভাপতি।

রামেন্দ্রসুন্দর কেমন ন্যায়নিষ্ঠ পরীক্ষক ছিলেন, তার এক হৃদয়স্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন লালগোলারাজ ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।[1] একবার এক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক নম্বর জানবার প্রত্যাশায় আচার্য ত্রিবেদীর কাছে উপঢৌকন পাঠিয়ে কিভাবে অপদস্থ হয়েছিলেন, সেই বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, "রামেন্দ্রসুন্দর দলিত ভুজঙ্গের মত ফোঁস করে উঠলেন।" বললেন,

> "আপনারা কী ভেবেছেন, বলুন তো ? এই সব ঘুষ দিয়ে কার্য্যসিদ্ধি করতে চান ? আমি তো কারও কাছে মস্তিষ্ক বিক্রয় করি নি। ·· ·যান, এখুনি চলে যান, চোখের সামনে থেকে এগুলো বিদায় করুন"।

শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্রসুন্দরের স্বরূপ বুঝতে হলে বিশ্ববিত্যালয় কমিশনের প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করতে হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠিত হয়। মাইকেল স্যাড্‌লার ছিলেন ঐ কমিশনের সভাপতি। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর রিপন কলেজ পরিদর্শনে আসেন। আচার্য ত্রিবেদী তখন ঐ কলেজের অধ্যক্ষ। স্যাড্‌লার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের বিত্যাবত্তা ও কর্মকুশলতায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কমিশন তাঁর কাছে কতকগুলো প্রশ্ন পাঠিয়ে বিশ্ববিত্যালয়ের সংস্কার ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত পোষণ করেন, তা' জানতে চান। ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর যে মতামত লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছিলেন, তার মর্মকথা হল এই যে, জাতীয় ভাবধারার বিশিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মহত্তর আদর্শসমূহের মধ্যে সম্মিলন ঘটাতে পারলেই বিশ্ববিত্যালয়ের শিক্ষার সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব। রামেন্দ্রসুন্দরের সুদীর্ঘ মন্তব্যে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিশিষ্টতা কোথায়, তা' অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হলে মনুষ্যত্ব কিভাবে সংকুচিত হয়, তা' নিয়েও এখানে গভীর ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা আছে।[2] ভারতের সনাতন শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করে দেশীয় ভাবধারায় শিক্ষিত ভারতীয় বিত্যার্থী সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে লাভবান হতে গিয়ে আমাদের যে মূল্য দিতে হয়েছে সে সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর উপসংহারে লিখেছিলেন,

> His education hardly makes him fit for struggle for life ; the branches of learning, that form the subjects of his study

১। ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর : পৃঃ ১০৭-১০৮।

২। রামেন্দ্রসুন্দরের সুদীর্ঘ মন্তব্যটি আশুতোষ বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

are perhaps barren and fruitless and narrow according to modern standards. But his course of training moulds his character, his learning gives him a position of honour and esteem in Society. Above all, he represents an ideal—an ideal associated with a high standard of culture, a course of self-imposed discipline and a series of voluntary self-denial and sacrifice. Western education has given us much, we have been great gainers; but there has been a cost, a cost as regards culture, a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life.

এ থেকেই বোঝা যাবে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার বিশিষ্টতাব দিকে লক্ষ্য রেখে এমন এক আদর্শ ও অকৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন বামেন্দ্রসুন্দব যা' সত্যিকারেব মানুষ তৈরি করে। যা' নিজেকে ও অপরকে শ্রদ্ধা করতে শেখায় এবং যা' জীবনের মহত্ত্বব আদর্শচেতনা ও সম্ভ্রমবোধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। স্বদেশেব ধ্যান-ধারণা ও স্বজাতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর পরিষদ-প্রীতির মূলে। পরবর্তী অধ্যায়ে আচার্য ত্রিবেদীর সঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গভীর ও অন্তরঙ্গ যোগসূত্রের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

পাখির সঙ্গে পাখার সম্বন্ধ যেমন, যেমন সম্বন্ধ রথের সঙ্গে রথীর, সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধও ঠিক তেমনি। প্রধানতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের নিষ্ঠার বলেই সাহিত্য-পরিষৎ প্রথম কর্মক্ষমতা অর্জন করেছিল। মূলতঃ তাঁরই ঐকান্তিক সাধনায় পরিষৎ একটি স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল এবং চলৎশক্তি যদি জীবনের অন্যতম লক্ষণ হয়, তবে বলব, রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম পরিষদের ধ্যান-ধারণাকে চলৎশক্তি সম্পন্ন করেছিলেন। চলার গতিবেগ দিয়ে পরিষদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই। তাই সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে যেমন গোড়াতেই আসেন রামেন্দ্রসুন্দর, রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-কাহিনীতেও তেমনি সাহিত্য-পরিষদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে।

সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ নয়; সচল ও সজীব একটি প্রাণ-পদার্থ। এই প্রাণের দুঃখে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণ কাঁদে, আবার আনন্দে আনন্দিত হয়। এর গৌরবে গৌরবান্বিত হন তিনি, আবার অগৌরবে বেদনা অনুভব করেন। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সাহিত্য-পরিষদের নিত্য-সঙ্গী তিনি। জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি যেন পরিষদের উদ্দেশ্যেই সমর্পণ করেছেন। এমন নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কর্মী, এমন আদর্শবান ও দেশপ্রেমিক সহযোগী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আর একটিও লাভ করে নি। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের অভিনন্দন-পত্রে যথার্থই লিখেছিলেন,

> সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি, এই রথটিকে নিরন্তর বিজয় পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।

গোড়া থেকেই সুরু করা যাক; রথ ও রথীর প্রথম-পরিচয় থেকে। রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সভ্যপদ গ্রহণ করেছিলেন ১৩০১ সালের ১৪ই শ্রাবণ তারিখে। এর মাত্র দু' মাস পূর্বে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হয়। ১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করে নাম দেওয়া হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হবার পরমুহূর্ত থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৩০১ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ তিনি পরিষদের অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। তখন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুসাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্ত। রামেন্দ্রসুন্দরকে পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করার পিছনে তাঁরই অবদান সবচেয়ে বেশী।

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম কার্যালয় ছিল শোভাবাজারের মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের বাড়ীতে। পরাশ্রয়ী এই প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রমে ক্রমে আত্মনির্ভরশীল করার বাসনা রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনে বরাবরই ছিল। ধীরে ধীরে এই মনোবাসনা বাস্তবে রূপান্তরিত হল। ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটি ভাড়া বাড়িতে পরিষদের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। এদিকে ক্রমেই পরিষদের সভ্যসংখ্যা ও আয় বাড়তে লাগল। কিন্তু সে আয় এমন কিছু নয়, যা' দিয়ে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হতে পারে। এদিকে ভাড়া বাড়িতে পরিষদের কুলিয়ে উঠছে না। কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাই পরিষদের নিজস্ব জমি-সংগ্রহ ও ভবন-প্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্যোগী হলেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ পরিষদের কয়েকজন হিতার্থীকে নিয়ে গেলেন কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে। মহারাজার সহযোগিতা পাওয়া গেল। সারকুলার রোডের উপর পরিষদকে ৭ কাঠা জমি দান করলেন তিনি। এতদিনে পরিষদের নিজস্ব জমি সংগৃহীত হল। এবার চলল গৃহ-নির্মাণের উদ্যোগ-আয়োজন। এদিকে অর্থের একান্ত অভাব। পরিষদের কর্মীরা এক এক সময় হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর হাল ছাড়লেন না কিছুতেই। অর্থের অভাবে সাহিত্য-পরিষদের গৃহ নির্মাণের কাজ পণ্ড হবে, এত বড় একটা পরাজয় তিনি কিছুতেই মেনে নিলেন না। ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নিজে বেরোলেন পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের জন্য। সাহিত্য-পরিষদকে যথাসাধ্য সাহায্যের জন্যে দেশবাসীকে জানালেন উদাত্ত আহ্বান। সে আহ্বান কেমন মর্মস্পর্শী ও আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি থেকে তা' কিছুটা স্পষ্ট হবে। পরিষদ্-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রার্থনা,—

> চাই এখন বঙ্গবাসীর সহানুভূতি—লোকবল চাই, আর অর্থবল চাই। গরিবের দেশের গরিব সভা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া স্বদেশীর নিকট দাঁড়াইয়াছে; বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহার অনুরাগ আছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, বাঙ্গালীর ইতিহাস যিনি জানিতে চাহেন, তিনি সেই ঝুলিতে মুষ্টিভিক্ষা অর্পণ করুন। পরিষৎ সকলকেই সমাদরে আহ্বান করিবেন। ভিক্ষাভাণ্ডে মাসে মাসে আট আনা প্রদান করিয়া তাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের সাধু সঙ্কল্পে সহায়তা করুন।
>
> [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : ভারতী, বৈশাখ, ১৩১২]

পরিষদের তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দরের যে কী পরিমাণ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল, তারই এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন আচার্য ত্রিবেদীর দৌহিত্র-সম্পর্কীয় লালগোলার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। সার্কাস দেখবার জন্যে ভগ্নীপতি রজনীকান্ত ত্রিবেদী-প্রদত্ত একটি টাকা সার্কাসের কাউন্টারে জমা না পড়ে কেমন করে সাহিত্য-পরিষদে জমা পড়ল, ধীরেন্দ্রনারায়ণ তা' বর্ণনা করেছেন।[১]

যা'ই হোক, পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল এবং

১। ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর (১৮৮৪ শক, পরিবর্ধিত সংস্করণ) পৃঃ ২৩।

একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দরেরই প্রচেষ্টায় লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়ের কাছ থেকে পরিষদ-মন্দিরের দ্বিতল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ পাওয়া গেল।[১]

১৩১৫ সালের ২১-এ অগ্রহায়ণ সাহিত্য-পরিষদের নিজস্ব গৃহের দ্বারোদঘাটন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন, পরিষদের ইতিহাসে তা' স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কলেজ থেকে প্রায়-দিনই বাড়ি ফিরতেন না তিনি। সোজা চলে যেতেন সাহিত্য-পরিষদে। বাড়িতেও অনুক্ষণ ঐ পরিষদেরই চিন্তা। গৃহিণী ইন্দুপ্রভা দেবী রসিকতা করে বলতেন, সাহিত্য-পরিষদ হল তাঁর সতীন। এই 'সতীন'—নামকরণটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। নামটিকে মনে ধরেছিল ইন্দুপ্রভা দেবীর। বলতেন, সতীনই যদি না হবে তো ঘরের কাজে যে এত উদাসীন, ওর কাজে তাঁর এত আগ্রহ হবে কেন? বস্তুতঃই তাই। সাহিত্য-পরিষৎই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যান-জ্ঞান। "সাহিত্য-পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের সম্মিলনকেন্দ্রস্বরূপ হবে," সাহিত্যসেবীরা এখানে মিলিত হয়ে সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ-আলোচনা করবেন, পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ হবার সুযোগ পাবেন, জিজ্ঞাসুরা এখানে এসে নব নব তত্ত্বের অনুসন্ধান করবেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার করে স্বদেশের উন্নতি-বিধান করবেন, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে কী যে কঠোব পরিশ্রম করেছেন তিনি, আদর্শের অনির্বাণ শিখাটিকে চিরদিন প্রদীপ্ত বেখে কত যে প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেছেন, তা' ভাবলে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। লাভ-লোকসানের বশে নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তির মোহে নয়, নিষ্কাম কর্মসাধনার অনুপ্রেরণাতেই তিনি যেন সাহিত্য-পরিষদের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। পবিষদের সমৃদ্ধি ও বিকাশের জন্যে রামেন্দ্রসুন্দবের বিপুল আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে প্রখ্যাত দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছেন, "তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষদের জন্য নিজেকে বলিস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন।"[২]

১৩০১ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২৬ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ—এই প্রায় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি পরিষদেব 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন। কখনও তিনি পরিষদের অন্যতর সম্পাদক, কখনও আবার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, কখনও আয়ব্যয়-পরীক্ষক, কখনও বা পরিষদ-পত্রিকার অধ্যক্ষ। এ ছাড়া পরিষদের সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি হিসাবেও অক্লান্ত কর্মীর মত কাজ করে গেছেন তিনি। মৃত্যুর মাত্র ৬ দিন পূর্বে তিনি পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অসুস্থ শরীরে সভাপতির কার্যভার তিনি আর গ্রহণ করতে পারেন নি। আমাদের মনে হয়, পারেন নি বলে তাঁর অগৌরব হয় নি কিছু; আর পারলেও গৌরব কিছু বাড়ত না। সভাপতিব চেয়েও বড় যে পদ, যে পদে নির্বাচন করে কাউকে কোনদিন বসান যায় না, যে পদ মান-সম্মানেরও অনেক উর্ধ্বে, সেই প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে গড়া পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুর পদে চিরকাল তিনি অধিষ্ঠিত থাকবেন। আজকেব দিনে যেমন, আগামী দিনেও তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শুভাকাঙ্ক্ষীরা

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (কার্তিক, ১৩৫৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: পৃঃ ৪৯।
২। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৫২।

পরিষদের এই অকৃত্রিম সুহৃদের উদ্দেশ্যে যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্ঘ্য প্রদান করবেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের সভাপতির উদ্দেশে কোনোদিন তা' বর্ষিত হয় না। পরিষদের প্রতিটি মঙ্গলকর্মের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল অন্তরঙ্গ যোগ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

"পরিষদের অনুষ্ঠিত প্রায় সকল সৎকর্মের মূলেই রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা প্রবর্তনে ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্ণয়ে পরিষদের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা প্রধানত রামেন্দ্রসুন্দরেরই চেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের আলোচনার প্রবর্তনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, সে সফলতার মূলেও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।"[১]

কিন্তু কেবলমাত্র প্রভাবের কথা বললে অনেক কিছু বলাই বাকী থেকে যায়। প্রভাব নয় শুধু, রামেন্দ্রসুন্দরের পরিষদ্-প্রীতিই আমাদের বেশী মুগ্ধ করে। পরিষদ্ যেন তাঁর পারিবারিক জীবনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কর্মক্ষেত্র রিপন কলেজকে তিনি তত ভাল-বাসতেন না, যত ভালবাসতেন সাহিত্য-পরিষদ্‌কে। শরীর অসুস্থ। কলেজে যেতে পারেন না। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে একবার যাওয়া চাই। আম এল লালগোলা থেকে। সেই আম পাঠান হল সাহিত্য-পরিষদে। কর্মীরা খাবেন, এই আনন্দে রামেন্দ্রসুন্দর বিভোর। পরিষদের কর্মী যাঁরা, তাঁদের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের ভালবাসার অন্ত নেই। পরিষদ্-কর্মী রামকমল সিংহ ও ব্যোমকেশ মুস্তফী এলে তিনি অন্য সমস্ত কাজ ফেলে রেখে এঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুতে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন। এককথায় পরিষদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল বলেই পরিষদ্‌কে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরাও ছিল তাঁর প্রিয়পাত্র।

রামেন্দ্রসুন্দরের এই পরিষদ্-প্রীতির মূলে ছিল দেশপ্রেম। পরিষদের মধ্য দিয়ে তিনি মাতৃভূমির বর্তমান আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অতীত গৌরব-ঐশ্বর্যকে প্রমূর্ত করতে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন, জাতির ধ্যান-ধারণাকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে। পরাধীন জাতির অন্তরে এই ঐক্যবোধ উদ্বুদ্ধ করার বাসনা থেকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আয়োজন হল। ১৩১২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। ঐ জাতীয় ভাবকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের লোককে জাগাবার উপযোগিতা অনুভব করলেন রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ মনস্বীরা। এই জাতীয়তাবোধ থেকেই ১৩১৪ সালের ১৭ই ও ১৮ই কার্তিক রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কাশীমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হল। সেই সম্মেলনে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির পটভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের আদর্শকে ব্যাখ্যা করে বললেন,

যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।...কিন্তু আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চনা করিব? আমরা যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্তন্যপানে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তাহা বলিতে

১। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃঃ ৫০-৫১ ;

পারি না। যে দিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সে দিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা আরম্ভ হয় নাই; আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সফল মনে করিব।

১৩১৫ সালের ১৮ই মাঘ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও জাতীয়তাবোধের মহত্তর পাদপীঠের উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্য-পরিষদের আদর্শের কথা প্রকাশ করলেন তিনি। জাতীয় ইতিহাস সংকলনে সকলের সাহায্য প্রার্থনা করে বললেন,

সকলের সমবেত চেষ্টায় আমাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দমান বাঙ্গালী জাতির, জাতীয়তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও ইহার মূল ভিত্তি প্রকাশিত হইবে। সেই উৎস হইতে ধারাসেচনে ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিয়া আমাদের জাতীয়তা কলনাদিনী স্রোতস্বতী তরঙ্গিণী পদ্মার প্রাবৃট্‌কালের বিপুল কায় ধারণ করিবে, সেই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের জাতীয় ভাবের সুরম্য হর্ম্ম্য গগনমূলে উঠিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিবে।

১৩১৬ সালে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনেও পরিষদ-সম্পাদকের কণ্ঠে এই একই প্রকার দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির বাণী উচ্চারিত হল। আচার্য ত্রিবেদী বললেন,

আমরা আমাদের বঙ্গভূমির সহিত পরিচিত হইতে চাহি। যাঁহার অঙ্কে আমাদের সূতিকাগৃহ ও যাঁহার ক্রোড়ে আমাদের শ্মশান, যাঁহাকে জননী বলিয়া ডাকিয়া আমরা প্রাণের তিয়াষ মিটাইতেছি, তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে আমরা পরিচিত হইতে চাহি।

জন্মভূমির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হবার বাসনা থেকেই 'রমেশ-ভবনের' পরিকল্পনা। এই রমেশ-ভবনই হল রামেন্দ্রসুন্দরের সংকল্পিত সারস্বত ভবন বা 'মাতৃমন্দির'। বাঙ্গালী জাতির আত্মদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই রামেন্দ্রসুন্দর এই মন্দির-স্থাপনের জন্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে এ সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন,

সকল দর্শনের উচ্চে অবস্থিত আত্মদর্শন। আমাদের বাঙ্গালী জাতির এই আত্মদর্শনের সময় উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশে কোথায় কি আছে, বাঙ্গালী জাতির কবে কি ছিল, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাতই আমাদের এখন আত্মদর্শন। দেশে যে হাওয়া উঠিয়াছে, এই আত্মদর্শন তাহার অনুকূল। এমন একটি স্থান চাহি, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গালা দেশের অতীতের পর্য্যালোচনা করিব, বর্তমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিব, ভবিষ্যতের বিষয়ে ধ্যান করিব ও স্বপ্ন দেখিব। যে স্থানে বসিয়া এই কাজ করিতে হইবে ইহাই সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত ভবন;...

সাহিত্য-পরিষৎ ইচ্ছা করেন যে, সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত ভবন রমেশ-ভবন নামে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-নিদর্শনরূপে এই রমেশ-ভবনের ভিত্তি বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।

এই সারস্বত-ভবনের স্বরূপ ও প্রকৃতি কেমন হবে, তার একটি বিস্তারিত পরিচয়

রামেন্দ্রসুন্দর তুলে ধরেছিলেন কাশীমবাজারে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে। বলেছিলেন,

সাহিত্য-পরিষদ্ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, সেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গালা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব। সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাস সম্যক্রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব।

সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত, মুদ্রিত, অমুদ্রিত, প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে। বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতে-লেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তূপাকৃতি হইবে। সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কিছু ফসল জন্মিয়াছে, তাহা আমরা এক স্থানে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত দেখিতে পাইব। গ্রীক ও রোমান হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক মার্কিন ও জাপানী পর্য্যন্ত যে কোন বৈদেশিক আগন্তুক বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।···
মন্দিরের অন্য স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব।·······
আর এক স্থানে বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গালার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে।···
আর এক স্থানে বাঙ্গালার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। বাঙ্গালার বিখ্যাত জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত আমরা সেখানে জানিতে পারিব। বাঙ্গালার ফুল-ফল, লতা-পাতা, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, শিল্পসম্ভারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব।···
এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি ও এই মন্দির মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্য-সম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পারি।

অতএব দেখছি, রামেন্দ্রসুন্দরের পরিষদ্-প্রীতি ও রমেশ-ভবনের পরিকল্পনার মূলে ছিল মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা। এই ভালবাসায় প্রণোদিত হয়েই তিনি অবিলম্বে রমেশ-ভবন বা মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হলেন। ১৩১৬ সালে সাহিত্যপরিষদের একটি ঘরে তিনি বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রক্ষার জন্য একটি চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা করলেন। ধীরে ধীরে সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলল। ১৩২১ সালে ভবন-নির্মাণের জন্য পরিষদের পার্শ্বেই সাত কাঠা জমি পাওয়া গেল। জমি দান করলেন কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। অর্থ সাহায্যের জন্যও অনেকেই এগিয়ে এলেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর মাতৃমন্দিরকে দেখে যেতে পারেন নি। ১৩৩১ সালে রমেশ-ভবনের একতল নির্মিত হয়। এর পাঁচ বছর আগেই রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়।

কিন্তু মনে যেন রাখি, মৃত্যু সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের অচ্ছেদ্য বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারে না। সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে যে প্রতিষ্ঠানকে তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, সেই প্রতিষ্ঠান যতদিন থাকবে, তিনিও ততদিন থাকবেন। সাহিত্য-পরিষদের চিরন্তন সারথি তিনি। মহাকালের যাত্রাপথে এই সারথির কল্যাণদৃষ্টি ও অমৃতস্পর্শ চিরকাল বাঙ্গালীর এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানকে নব নব সত্য ও মঙ্গল-প্রভায় প্রদীপ্ত করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আদর্শ ও উন্নয়নকে কেন্দ্র করে মহিমময় রামেন্দ্রসুন্দরকে খুঁজে পেয়েছি আমরা। এখানে রবীন্দ্রালোকে সেই মহিমময় মানুষটিরই অন্য এক পরিচয় নেব। তবে তার আগে একটু ভূমিকা দরকার।

লক্ষ্য যদি এক হয়, তবে পথ আলাদা হলেও মিলনের উপলক্ষ খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। আদর্শের মিল থাকে যেখানে, হৃদয়ের মিলও সেখানে আপনা থেকেই এসে যায়। মিলের এই বিশেষ ধর্মটি মনীষীদের জীবনে বোধ করি সবচেয়ে বেশি করে সত্যি। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নয়, ক্ষুদ্র লাভ-লোকসানের জমা-খরচ নয়, মহত্তর জীবনাদর্শই সেখানে মিলন ও বন্ধুত্বের সেতু রচনা করে। এই ধরনের সেতু মনীষীদের পারস্পরিক যোগসূত্রের সহায়ক নয় শুধু, মানব-সমাজের বহু-বিচিত্র ভাবনালোকের সংযোজকও বটে। এরই উপর ভর করে সাধারণ মানুষ অনেক সময় অসাধারণ মনীষার যাত্রা-পথের নিশানা পায়; মহিমময় চিন্তানায়কদের জীবন-রহস্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করে। মনীষী জীবনের যে বিস্ময়টুকুকে এমনিতে কোনদিনই জানা যেত না, বন্ধুত্বের ঐ সেতুর উপর নির্ভর করে অনেক সময় তা' অতি সহজেই জানা যায়। এ ছাড়া প্রতিভাদীপ্ত জীবনের একটি যখন অপরটির খুব কাছে এসে পড়ে, তখন একের আলোকে অপরকে দেখবার সুযোগ হয়। একজন অপরজনের অস্পষ্টতাকে উন্মোচিত করেন তখন। তখন একের আলোকে অপরের অবগুণ্ঠিত বিশিষ্টতা আলোকময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর একে অপরকে আলোকিত করেছিলেন। এঁদের বন্ধুত্বের সেতুপথ ধরে এই আলোকদীপ্ত দুই চিন্তানায়কের দিকে তাকাব আমরা। একের প্রীতি-ভালবাসা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনের মধ্য দিয়ে অপরকে বুঝবার চেষ্টা করব।

তবে গোড়াতেই বলে রাখি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গভীর প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল অথবা ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-নিবেদনের সম্পর্ক—শুধুমাত্র এ কথা বোঝাব বলে এ প্রসঙ্গ নিয়ে লিখতে বসি নি। তেমন সম্পর্ক তো অনেকের মধ্যেই থাকে। কিন্তু শ্রদ্ধা ও প্রীতির সমন্বয় ঘটে ক'জনের মধ্যে? ক'টি বন্ধুত্ব শ্রদ্ধা ও প্রীতির যুক্তস্পর্শে নির্মল ও অকলঙ্ক হয়? এক্ষেত্রে তা' হয়েছিল। এঁরা একে অপরকে দেখেছিলেন প্রীতি ও শ্রদ্ধার সমুন্নত পাদপীঠ থেকে। তাই কোনোদিন কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বন্দ্ব এঁদের বন্ধুত্বকে ম্লান করতে পারে নি, কোনো মতান্তর কোনোদিন এঁদের মনান্তর ঘটাতে পারে নি। চিরকাল এঁরা পথ চলেছেন দেশপ্রেম ও সাহিত্যসেবার অম্লান আদর্শকে সামনে রেখে। এঁরা চিরকাল একে অপরের মধ্যে এই আদর্শের ধ্রুবজ্যোতিকে খুঁজে পেয়েছেন। সে কারণেই বন্ধুত্বের জন্যে

অন্য কোনো উপকরণের দ্বারস্থ হতে হয় নি এঁদের। শ্রদ্ধার ও প্রীতির মণিকাঞ্চন যোগেই এঁদের সৌহৃদ্য অক্ষয় ও অমর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখে-ছিলেন,

"আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বলিলে কম বলা হয়—আপনার প্রতি আমার প্রীতি গভীর।"

জ্ঞানতাপস রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধা ও প্রীতির মূলে কি ছিল? আচার্য ত্রিবেদীর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, এর মূলে ছিল তাঁর উদার ও মহনীয় চরিত্র, ছিল সাহিত্যসেবা ও পরিষদ্‌-প্রীতি এবং সর্বোপরি ছিল তাঁর দেশ-প্রেম। রামেন্দ্রসুন্দরকে 'খাঁটি মানুষ' মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'চিরপ্রসন্ন মুখ' কবিকে প্রসন্ন করত। এ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যেরও তিনি ছিলেন পরম অনুরাগী। তাই বলে এমন কথা বলব না যে, সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের কখনও মত-বিরোধ হয় নি; বরং বলব, মতবিরোধ হয়েছে, তবে তা' মূল কোনো আদর্শ বা বৃহত্তর কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নয়।

মননশীল সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের ছিল বিস্ময়কর মৌলিকতা। কী বিজ্ঞান ও দর্শন, কী ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ও ভাষাতত্ত্ব সর্বত্রই তিনি বিভিন্ন বিষয়কে নিজস্ব চিন্তার আলোকে বিচার করেছেন। দুঃসাহসী পথিকৃতের মতো বহু ক্ষেত্রেই মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে 'নানা কথা'র একটি প্রবন্ধ 'রাষ্ট্র ও নেশন'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন তা' হল এই যে, ভারতবর্ষে কোনো দিন রাষ্ট্র ও নেশনের অস্তিত্ব ছিল না। রাজায়-প্রজায় যে সহযোগিতা ও সহানুভূতির সম্পর্ক রাষ্ট্র গড়ে তোলে, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজা-সাধারণের মধ্যে যে ঐক্যবোধ নেশনের জন্ম দেয়, ভারতবর্ষে চিরকালই তার একান্ত অভাব। ভারতীয় ইতিহাসের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের এই সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথের সমর্থন লাভ করেছিল। কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমাদের দেশে 'নেশন' ছিল না ও নাই, সে কথা সত্য—তাহার পরিবর্তে কি আছে বা ছিল সেইটাই ভাল করিয়া বিচার্য।" রামেন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন, এই 'কি আছে বা ছিল'র উত্তর রামেন্দ্রসুন্দর দিয়েছেন। কী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদে, কী কর্ম-কথায়, বেদ-কথায় ও বিচিত্র প্রবন্ধে সর্বত্রই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বেদপন্থীর বিশিষ্টতাকে আশ্রয় করেই ভারতবর্ষ আজও টিকে আছে; এবং পূর্বেও টিকে ছিল।

উদাহরণ হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দরের ভিন্নধর্মী আর একটি প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবন্ধটির নাম 'ধ্বনি বিচার'। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর এখানে একটি নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর বক্তব্য হল, 'প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা বিশেষ মূর্তি আছে এবং সেই জন্যই সেই সকল ধ্বনির সমবায়ে অনুভূতিমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দ অন্তত বাংলা ভাষায় রচিত' হয়েছে। ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে রচিত আচার্য ত্রিবেদীর এই অভিনব প্রবন্ধটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন,

"ধ্বনি বিচার পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এই ভাবে আলোচনা করিব বলিয়া একদিন স্থির করিয়াছিলাম, সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আমি কেবল একটা আভাসমাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম।"

এ ছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে কেন্দ্র করে এই দুই মনীষী পরস্পরের নিকটে এসেছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের স্বপ্ন ও সাধনার বস্তু। এই প্রতিষ্ঠানটিকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে দীর্ঘকাল তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন। অপরদিকে পরিষদের প্রতি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল 'অন্তরের শ্রদ্ধা'। পরিষদের কাজে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তিনি। কখনও বা বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের সাহিত্য-পরিষদের কাজে লাগাবার প্রস্তাব করেছেন, কখনও বা পরিষদ্‌কে পুঁথি উপহার দিয়েছেন আবার কখনও বাংলার মফস্বল অঞ্চলে পরিষদের শাখা-অফিস স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করেছেন। এ ছাড়া অন্যভাবেও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষদের কার্যে রামেন্দ্রসুন্দরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ যখন পরিষদের সহকারী সভাপতি, রামেন্দ্রসুন্দর তখন সম্পাদক। পরিষদের কর্মাদর্শ নিয়ে উভয়ের মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনা হত। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ একদিন জানালেন, বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির যা' কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, সাহিত্য-পরিষদ্‌ যদি সেগুলো কেন্দ্রীভূত করতে পারে, তবে পরিষদের জীবন সার্থক হবে। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতায় না হয়ে বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন সহরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হলে এ কাজের সুবিধা হতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সদুপদেশ রামেন্দ্রসুন্দরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৩১২ সালের পরিষদের কার্যবিবরণীতে তিনি লিখেছিলেন, ..."বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-সেবীদিগের মিলনসাধন এবং বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে।" বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এর পর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কয়েকটি অধিবেশন মফস্বল সহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩১৪ সালের ১৭-১৮ কার্তিক কাশীমবাজারে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরিষদের গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি। আবার পরিষদই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। উপলক্ষ ছিল, রবীন্দ্র-জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি। প্রধানতঃ পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উদ্যোগেই ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ এই অভিনন্দনের আয়োজন হয়। স্মরণে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি। দেশের অপর কোনো পাব্লিক প্রতিষ্ঠান তখনও তাঁকে সম্বর্ধনা জানান নি। এমন দিনে সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী গুণী সম্বর্ধনার

আয়োজন করে একদিকে যেমন দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অপর দিকে তেমনি রেখেছিলেন দূরদর্শিতার প্রমাণ। তবে এ নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে নিন্দা-বাণ সহ্য করতে হয় নি, তা' নয়। রবীন্দ্রবিরোধীদের অনেকেই এজন্যে তাঁকে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত বিরূপতা, বিদ্রূপ ও ঈর্ষার প্রতিবন্ধককে রামেন্দ্রসুন্দর অতিক্রম করেছিলেন শেষ অবধি। বাঙ্গালীর সারস্বত তীর্থ সাহিত্য-পরিষদের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশে রবীন্দ্র সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রটি রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই লিখেছিলেন। পরিষৎ-সম্পাদক হিসেবে সেটি পাঠ করার দায়িত্বও ছিল তাঁর উপর। এই অভিনন্দন পত্রটি আলোচনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্র প্রতিভার বিশিষ্টতা বহু আগেই সত্যদ্রষ্টা রামেন্দ্রসুন্দর মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের এই উপলব্ধির আলোকে আমরাও যেন পঞ্চাশ বছরের কবি-সার্বভৌমকে নতুন করে খুঁজে পাই, রামেন্দ্রালোকে রবীন্দ্র প্রতিভার দিগ্-দর্শন করি।

অভিনন্দন পত্রের এক জায়গায় আচার্য ত্রিবেদী লিখেছেন,

"কবিবর, পঞ্চশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গলার মাটি ও বাঙ্গলার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নব জীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দনপ্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধ নেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল। অনুগামিগণের মুগ্ধ নেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাট দেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীকে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতা-ভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে।"

একদিকে প্রগাঢ় প্রজ্ঞা এবং অপরদিকে প্রীতি ও ভালবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধার ত্রিবেণী-সঙ্গম অভিনন্দন লিপিটিকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে।

ঠিক এই রকম আর একটি অভিনন্দন বছর তিনেক পরে সাহিত্য-পরিষদে দেখা গেল। এবার অভিনন্দিত হলেন রামেন্দ্রসুন্দর; আর অভিনন্দন জানালেন রবীন্দ্রনাথ। উপলক্ষ রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি। ১৩২১ সালের ৫ই ভাদ্র। আচার্য ত্রিবেদীর জন্মদিবসে সাহিত্য-পরিষদে এক সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন হল। সম্বর্ধনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন,

হে মিত্র, পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ সাহিত্যের মধ্য-গগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। যখন নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চির সঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

অভিনন্দন-পত্রের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে কত সুগভীর ছিল, এ থেকেই তা' পরিস্ফুট হবে।

আজ অবধি অনেক প্রশস্তি রচিত হয়েছে রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্দেশ্যে। অনেকেই এই মনস্বী সাহিত্য-সাধকের জীবন-চরিত ও সাহিত্য-সাধনার ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনাকে এত অল্প কথায় আর কেউ দেখাতে পারেন নি। কথার রেখায় রামেন্দ্রসুন্দরের পরিপূর্ণ মূর্তি এমন জীবন্ত করে আঁকতে পারেন নি আর কেউ। রবীন্দ্রনাথ যে পেরেছিলেন, তার মূলে হু'টি কারণ। বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে আসল মানুষটিকে জানতে পেরেছিলেন তিনি; সে মানুষটির মহত্তর জীবনসাধনা ও বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন।

এই গেল একের আলোকে অপরকে দেখার কথা। কিন্তু স্মরণে রাখি যেন, মনীষীরা যখন পরস্পরের খুব কাছে আসেন, তখন একের অবরুদ্ধ অনেক কথাও অপরের কাছে অকপটে প্রকাশ পেয়ে থাকে। অসমতলে অবস্থিত মানুষের কাছে যে কথা কোনোদিনই প্রকাশ করা চলে না, সমধর্মার একই সমতলে দাঁড়ালে অনেক সময় তা' আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে এই প্রকাশ প্রায় ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে আপন আপন সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে দশ জনের কাছে যে কথা বলতে সাহিত্যিকরা সংকোচ বোধ করেন, অনেক সময় সে কথাই তাঁরা প্রিয়জনের কাছে অসংকোচে প্রকাশ করে থাকেন। একবার রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সাধনার গোড়ার কথা প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী, এই বিশ্বের জল-স্থল, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত, অণু-পরমাণু সব কিছুর সঙ্গে যে তাঁর একটা নাড়ীর যোগ আছে এবং এই নিগূঢ় যোগসূত্রের উপলব্ধিই যে তাঁকে সাহিত্য-সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে, এ সত্যটি এই চিঠি থেকে যেমন স্পষ্টভাবে জানতে পারি, তেমন আর কোনো জায়গা থেকে নয়। সুহৃদ্ রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে কবি-বন্ধু রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

আমার প্রাণের মধ্যে গাছের প্রাণের গূঢ় স্মৃতি আছে, আজ মানুষ হইয়াছি বলিয়াই একথা কবুল করিতে পারিতেছি। শুধু গাছে কেন, সমস্ত জড় জগতের স্মৃতি আমার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দন আমার সর্বাগ্রে আত্মীয়তার পুলক সঞ্চার করিতেছে—আমার প্রাণের মধ্যে তরুলতার বহু যুগের মূক আনন্দ আজ ভাষা পাইয়াছে —নহিলে আজ গাছে গাছে যখন আমের মুকুলের উচ্ছ্বাস একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন আমি কোন্ নিমন্ত্রণে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করিতে যাই!

আমার মধ্যে একটা বিপুল আনন্দ আছে সে এই জল স্থল গাছপালা পশুপক্ষীর আনন্দ—

আমি আমার বোটের খোলা জানলায় বসিয়া এই পুরাতন পৃথিবীটার গৈরিক-রঙের মাটির উপরে যখন সূর্যের আলো পড়িতে দেখিয়াছি তখন আমার সমস্ত দেহটা যেন বিস্তীর্ণ হইয়া ঐ ধূলা এবং ঘাসের মধ্যে দিকপ্রান্ত পর্যন্ত অবাধে আতত হইয়া গিয়াছে। আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভ মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব। এই স্বভাব হইতেই আমি কবিতা লিখিয়াছি, গান লিখিয়াছি, গল্প লিখিয়াছি।...

আমি মানুষ, এইজন্যই আমি ধূলা মাটি জল গাছপালা পশুপক্ষী সমস্তই—ইহাই আমার গৌরব—আমার চেতনায় জগতের ইতিহাস দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে—আমার সত্তায় জড় ও জীবের সমস্ত সত্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

কবির এই উক্তি যে কত বড় একটি সত্য, রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকদের তা' অজানা থাকবার কথা নয়। অনেকেই হয়তো জানেন, একদিকে ভুবনসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেমন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধকে প্রভাবিত করেছে, অপরদিকে তেমনি জ্যোতির্ময় বিশ্বলোক সমৃদ্ধ করেছে কবির চরাচরবিস্তারী কল্পনাকে। সোনার তরীতে, চৈতালিতে, উৎসর্গে, বলাকায়, শেষ সপ্তকে, পত্রপুটে এবং সবশেষে রোগশয্যায়, আরোগ্যে ও জন্মদিনে কাব্যের বহু কবিতায় এই সুরটি বহু-বিচিত্র রাগ-রাগিণীর মধ্য দিয়ে অনুরণিত হয়েছে। আর শুধু কবিতার কথাই বা বলি কেন, গানে-গল্পেও তো এই বিশ্বাত্মবোধকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আস্বাদ করি। অতএব দেখছি, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরাট ও বিপুল ক্ষেত্রে যা' একটি ধ্রুব সত্য, এই ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে তা' অতি সহজেই আত্মপ্রকাশ করেছে। আত্মপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে রামেন্দ্রসুন্দরের বেলায়ও। অতটা ব্যাপকভাবে না হলেও রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সাহিত্যের অংশবিশেষ নিয়ে আপন মনোভাব কবিগুরুর কাছে অকপটে ব্যক্ত করেছেন। কর্মকথা সম্বন্ধে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

কর্ম্মকথার স্থানে স্থানে হিন্দুব সমাজতন্ত্রের প্রতি এক আধটু পক্ষপাতের কথা আছে—কিন্তু ওগুলা নিতান্তই অবান্তর কথা—প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল মাত্র। কর্ম্মকথার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন—মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিটা স্বভাবের নিয়মে—বাহির হইতে ঘাত-প্রতিঘাতে মানব-সমাজে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে—কতটা গজাইতে পারে অধিকাংশ প্রবন্ধে আমি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। Natural Selection-কে নিংড়াইয়া কতটা ধর্ম্মরস আদায় করা যাইতে পারে, তাহাই দেখান আমার মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। বিলাতে Evolution-তন্ত্রীরা যে পথে Ethics ছাত্র গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই আমি দেখাইয়াছি। Evolution হইতে সবটুকু পাওয়া যায় না;

রামেন্দ্রসুন্দরের একটি বিশ্রুত গ্রন্থ কর্মকথা। এই গ্রন্থটি রচনার পিছনে লেখকের মূল অভিপ্রায় কী ছিল এবং কী বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লেখককে এটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে,

উল্লিখিত মন্তব্যটি পাঠ করলে তা' জানা যায়। অবশ্য 'কর্মকথা'র বিষয়বস্তু ও বক্তব্য সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব সে গ্রন্থের ভূমিকায়ও কতক পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু তা'তে লেখকের মূল অভিপ্রায়টি এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় নি।

তাই বলছিলাম, একজন মনীষী অপরকে প্রকাশে সাহায্য করেন। একের হৃদয়-দুর্গের রুদ্ধ দুয়ার অপরের প্রভাবে উন্মুক্ত হয়। উন্মুক্ত যে হয়, রামেন্দ্রসুন্দরের ক্ষেত্রে তার আর একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। প্রমাণটি রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তিম মুহূর্তকে ঘিরে। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন রামেন্দ্রসুন্দর। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছেন। এমন সময় সংবাদপত্রে খবর বেরোল, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্যার উপাধি ত্যাগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে বড়লাটের কাছে চিঠি লিখেছেন তিনি। এ সংবাদ শোনামাত্রই রামেন্দ্রসুন্দর কবিকে দেখবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলেন। প্রিয় বন্ধুকে শেষবারের মতো অন্তরের অকুণ্ঠিত প্রীতি-শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অস্থির হলেন আচার্য ত্রিবেদী। সঙ্গে সঙ্গেই কবির ডাক পড়ল। অনুজ দুর্গাদাস ত্রিবেদী ছুটে গেলেন কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ আচার্য ত্রিবেদীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলেন। রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠিটি তিনি কবির নিজের মুখ থেকে শুনতে চান। আর শেষবারের মতো কবির পায়ের ধূলি নিতে চান তিনি। এখানে একটু ভূমিকা প্রয়োজন। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনে চরমতম সত্যটি যখন আত্মপ্রকাশ করে, যখন পরম আকাঙ্ক্ষিতকে শেষ-বারের মত প্রত্যক্ষ করার জন্যে মানুষ উতলা হয়, তখন আর অভিনয় চলে না, একেবারে সাধারণ মানুষের বেলায়ও জীবনের চরমতম সত্যটি তখন স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। তখন যা'কে ভালবাসে মানুষ, তা'কে কাছে পেতে চায়, যে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে জীবনের পথ চলে সে, তার একটা হিসাব-নিকাশের চরম মুহূর্ত উপস্থিত হয়। তখন আর মিথ্যে নয়, আর লোক-দেখানো ভড়ংও নয়, জীবনের মহিমময় সত্য ও ধ্রুব বিশ্বাস একেবারে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন, আর মনীষীদের বেলায় মিথ্যার আসন তো একেবারেই সংকুচিত। তাই অন্তিম মুহূর্তে সত্যদ্রষ্টা মনীষীরা অনেক সময় মহত্তর সত্যের জ্যোতির্ময় লোকে উত্তরণ করেন। সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে যে কথাটি বলতে চেয়েছিলেন, যে আদর্শকে বিজয়ী করার জন্যে জীবনের শিক্ষাটিকে এতকাল অনির্বাণ রেখেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে সেই শিক্ষা যখন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, সারা জীবনের সত্যাদর্শের বাণীটিও তখন আরও উজ্জ্বল হয়ে আরও স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক এই রকমটি হয়েছিল রামেন্দ্রসুন্দরের ক্ষেত্রে। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি দেশপ্রেমের আদর্শটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথকে সেই চিঠি পড়ার অনুরোধের মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধূলি নেবার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে এই ভাবটিই ব্যক্ত হয়েছে। বন্ধু রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ও স্যার উপাধি ত্যাগ তো উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে রামেন্দ্রসাধনার আসল লক্ষ্যটিই ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন। সেদিন চিঠি পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের তৎকালীন বড়লাট

লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের কাছে লেখা মূল চিঠিটি প্রিয় বন্ধুকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। ওতে ছিল,

YOUR EXCELLENCY

The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote.[১]

এই অগ্নিগর্ভ চিঠিটি শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে লাগলেন রামেন্দ্রসুন্দর। রবীন্দ্রনাথ পত্রপাঠ শেষ করলেন এই বলে,

And these are the reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency to relieve me of my title of knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the king at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

চিঠি পড়া শেষ হল। রামেন্দ্রসুন্দরও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সেই তন্দ্রা আর ভাঙে নি।

১. বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের কাছে লেখা মূল চিঠিটি 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থে অমল হোম উদ্ধৃত করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ—পৃঃ ৬৯-৭১।

সপ্তম অধ্যায়

শেষ-জীবন

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের শেষ আট বছর রোগ-শোকের মধ্য দিয়ে কেটেছিল। প্রাণপ্রতিম কন্যা গিরিজার মৃত্যু, স্নেহময়ী জননী চন্দ্রকামিনী দেবীর লোকান্তর এবং সর্বোপরি ব্যাধির উপর্যুপরি আক্রমণ তাঁকে জর্জরিত করেছিল।

১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। পূজার ছুটি উপলক্ষে জেমোর বাড়ীতে এসেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। আহারের সময় হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর সংজ্ঞা লোপ পেল। সকলেই বুঝলেন, পুরনো রোগ নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। শিরোরোগ আবার নতুনভাবে এবং আরও প্রবল আকারে আক্রমণ করেছে তাঁকে। বহুকাল আগে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হবার সময় রামেন্দ্রসুন্দর এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এবার রোগের লক্ষণ দেখা দিল আরও প্রকটভাবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল উপসর্গ। ১৩১৮ সালের শীতকালে যকৃতের রোগে আক্রান্ত হলেন আচার্য ত্রিবেদী। অজীর্ণতায় ভুগতে লাগলেন। চিকিৎসকরা নির্দেশ দিলেন, হাওয়া বদলান দরকার।

১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে হাওয়া-বদলান উপলক্ষ করে সমুদ্রদর্শন করলেন রামেন্দ্রসুন্দর। পুরী গেলেন। চৌদ্দ দিন ছিলেন সেখানে। কিন্তু স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হল না। বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন আবার। এদিকে রোগের আক্রমণ দিন দিন বেড়েই চলল। কলকাতায় ফিরে এসে প্রায় মাস পাঁচেক শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি।

১৩১৯ সালের শীতকালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের বাসনায় আবার বেরোলেন। কিন্তু এবার আর বাঙ্গলার বাইরে নয়; সমুদ্র-সৈকতেও নয়। এবার বেরোলেন বাঙ্গলাদেশেরই গঙ্গাপথে জল-বিহারে। গঙ্গার উপর কিছুদিন বোটে থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হল।

পর বৎসর ১৩২০ সালের গ্রীষ্মকালে জেমোয় গিয়ে তিনি মোটামুটি ভালই ছিলেন। আষাঢ় মাসে কলেজ খুলবার পর কলকাতায় ফিরে এলেন আচার্য ত্রিবেদী। কিন্তু মাসখানেক না যেতেই আবার রোগের আক্রমণ শুরু হল। ভাদ্রমাসে মারাত্মক আকারে কলিক পেইন (Colic-pain) দেখা দিল। চিকিৎসকরা জানালেন, যকৃতের উপর বিস্ফোটক হয়েছে; অস্ত্রোপচার দরকার। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর এই ধরনের চিকিৎসায় রাজী হলেন না। তিনি স্মরণ নিলেন হোমিওপ্যাথির। সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত হোমিও-চিকিৎসক ডাঃ ডি. এন. রায়কে ডাকা হল। তাঁর চিকিৎসায় আচার্য ত্রিবেদীর ব্যাধির কিছুটা উপশম হয়েছিল। কিন্তু দুর্বলতা তখনও কাটে নি। তাই ঐ বছর শীতকালে আবার জলপথে ভ্রমণে বেরোলেন

তিনি। স্বাস্থ্যেরও কিছুটা উন্নতি হল। কিন্তু এ উন্নতি নেহাৎ-ই সাময়িক। কয়েকমাস পরেই আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। ১৩২১ সালের ভাদ্রমাসে আবার কলিক পেইন দেখা দিল। আগের বছর শীতকালে জলপথে ভ্রমণ করে রামেন্দ্রসুন্দর কিছুটা আরোগ্যলাভ করেছিলেন। সে আশায় এ বছরও শীতকালে আবার জলপথ ধরে ভ্রমণে বেরোলেন। ইচ্ছে ছিল, গঙ্গা ধরে নবদ্বীপ অবধি যাবেন। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠল না। পথে শিরোরোগ ও বহুমূত্র রোগের লক্ষণ প্রকটভাবে প্রকাশ পেল। অগত্যা নবদ্বীপ অবধি না গিয়ে অসুস্থ শরীরে কলিকাতায় ফিরে এলেন আচার্য ত্রিবেদী।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের পরবর্তী তিন-চার বছর আরোগ্য ও অসুস্থতার আলো-আঁধারির মধ্য দিয়ে কাটল। ১৩২৫ সালের গ্রীষ্মকালে দুরন্ত ম্যালেরিয়ার আক্রমণে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। মাস তিনেক ভুগলেন এবার। ঐ সময়ে রামেন্দ্র-জননী চন্দ্রকামিনী দেবীরও স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। তীর্থভ্রমণের বাসনা হল তাঁর। রামেন্দ্রসুন্দর জননীর তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করলেন। বৃদ্ধা চন্দ্রকামিনীর সঙ্গী হলেন আচার্য ত্রিবেদীর দুই ভাই দুর্গাদাস ও নীলকমল এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়স্বজন।

এদিকে ঐ বছরেরই আষাঢ় মাসে রামেন্দ্রসুন্দরের কনিষ্ঠা কন্যা গিরিজা দেবী গুরুতর অসুস্থ হযে কলকাতায় এলেন। চন্দ্রকামিনী দেবীও তীর্থ থেকে ফিরে এসে শয্যাশায়ী হলেন। উভয়েরই রোগ দিন দিন বাড়তে লাগল। ১৩২৫ সালের ১৭ই পৌষ গিরিজা দেবীর মৃত্যু হয়। প্রাণাধিক কন্যার লোকান্তরে রামেন্দ্রসুন্দর একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। অসুস্থ রামেন্দ্রসুন্দরের দেহ-মনে শোকের পাণ্ডুব ছায়া নেমে এল। কিছু দিনের মধ্যেই আর এক আঘাত পেলেন আচার্য ত্রিবেদী। ঐ বছরেরই মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন চন্দ্রকামিনী দেবী পরলোক গমন করলেন। পর পর দু'টি আঘাত রোগজীর্ণ রামেন্দ্রসুন্দবকে আরও জীর্ণ ও নিরুদ্যম কবে দিল। জেমোয় গিযে কোনোক্রমে মাতৃকৃত্য সম্পন্ন করলেন তিনি। এদিকে রোগের আক্রমণ দিন দিনই তাঁকে অসহায় ও দুর্বল করতে লাগল। বহুমূত্র রোগ প্রবল হয়ে উঠল আবার। সর্বাঙ্গ তাঁব ফুলে গেল। সঙ্গে নতুন উপসর্গ জুটল জ্বর। ১৩২৬ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর জেমো থেকে কলকাতা যাত্রা করলেন।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসেও অবস্থার উন্নতি কিছু হল না। রোগ দিন দিন বেড়েই চলল। চিকিৎসার জন্যে এবার ডাকা হল ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও প্রাণধন বসুকে। রামেন্দ্রসুন্দরকে নিরাময় করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন এঁরা। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল শেষ অবধি। আচার্য ত্রিবেদীর জীবনপ্রদীপ ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। কয়েকদিন পরে শুরু হল হিক্কা; এবং সেই সঙ্গে বমি। রোগের যন্ত্রণায় এক এক সময় ছটফট করতেন রামেন্দ্রসুন্দব। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এলেন। প্রিয় বন্ধুকে শেষবারের মত শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানালেন রামেন্দ্রসুন্দর। ঐ দিনই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। সেই সংজ্ঞা আর ফিরে আসে নি। ১৩২৬ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রাত দশটার সময় তিনি পরলোক গমন করেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মহাপ্রয়াণ-কালে মনস্বী সাহিত্য-সাধক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।"[১]

কিন্তু আমরা অন্য কথা বলব। আমরা বলব, রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যার যে জাহাজের যাত্রী, সে জাহাজ কোনোদিন ডোবে না; মহাকালের যাত্রা-পথে অসীম অনন্ত যুগ ধরে ধ্রুবতারার মত প্রদীপ্ত থাকে। আর বলব, রামেন্দ্রসুন্দরের ক্ষণকালের জীবন-প্রদীপ নিভল বটে, কিন্তু চিরকালের আকাশ প্রদীপ হয়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তিনি বেঁচে রইলেন।

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (প্রথম সংস্করণ, কার্তিক ১৩৫৫) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃঃ ৮৩।

অষ্টম অধ্যায়

চরিত্র

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-চরিতের দিকে তাকালে বার বার যে চিত্রটি আমাদের মানসলোকে ভেসে ওঠে, তা' হল ঋষিকল্প এক মহিমময় জ্ঞান-তাপসের। মনে হয়, বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে সনাতন ভারতবর্ষের স্থিত-প্রাজ্ঞ কোনো মনীষী এ যুগে ছিটকে পড়েছেন বুঝি। আর মনে হয়, এত পুরাতন যুগের ধ্যান-ধারণার প্রবক্তা হয়েও তিনি নূতন যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন। তাঁর জীবনে অতীত ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনচিন্তার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-চেতনার মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-সাধনার বিশিষ্টতাকে সার্থকভাবে আত্মসাৎ করতে পেরেছেন তিনি।

এজন্যে সারা জীবন ধরে মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। জ্ঞানের আনন্দময় রাজ্যে দিনের পর দিন ধরে নিজেকে নির্বাসিত করতে হয়েছে। সস্তা আমোদ-প্রমোদ, সুপ্রচলিত বিলাস-ব্যসন থেকে যেতে হয়েছে অনেক দূরে সরে। সাংসারিক কোনো কাজেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। পড়েছেন কখনও, কখনও লিখেছেন, আবার কখনও বা ভাবনার জগতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন। যখন যা' কিছু করতেন তিনি, তন্ময় হয়ে করতেন। তদ্গতচিত্ত হয়ে আপন জৈবিক সত্তার কথা ভুলে যেতেন। সে কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর চির-উদাসী। লেখা-পড়ার সময় বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন তিনি। কলকাতার বাড়ীতে আগুন লেগেছে। ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। ছোটবেলায় তাঁরই পড়ার ঘরের ঠিক সামনে নাটক অভিনীত হয়ে গেল। অথচ তিনি টের পেলেন না। ১৩১৮ সাল। নাতনীর 'ঘি'-এর বিয়ে। সেদিনও একমনে জ্ঞান-চর্চায় ডুবে ছিলেন তিনি। এমন একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী, এমন নিবিষ্ট-চিত্ত সাহিত্যসাধক সকল দেশেই দুর্লভ। সাধনায় উৎসর্গিতপ্রাণ ছিলেন বলেই অনেক সময় অন্য সব কাজে ভুল হয়ে যেত তাঁর। খাবার হুঁস থাকত না। পৈতে হারিয়ে যেত কখনও। কখনও বা চশমা খুঁজে পেতেন না। ঘড়ি দু' ঘণ্টা এগিয়ে না রাখলে তাঁর চলত না।

সত্যিকারের অনাড়ম্বর ও নিরহঙ্কারী মানুষ ছিলেন তিনি। নিজের ডিগ্রী নিজের নামের পাশে লেখেন নি কোনোদিন। কাশীর পণ্ডিতরা একবার তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিলেন। কিন্তু কোনোদিন তিনি সেই উপাধি ব্যবহার করেন নি। বলতেন বিদ্যাসাগর একজনই আছেন ; এবং তিনি ঈশ্বরচন্দ্র।

পোষাক-পরিচ্ছদের দিক থেকেও আশ্চর্যরকম সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। কলেজে যেতেন মোটা ধুতি আর মোটা চাদর পরে। 'কপ শার্টে'র গলার বোতাম কোনো-দিন থাকত আবার কোনোদিন বা থাকত না। গ্রীষ্মকালে বাড়ীতে সাধারণতঃ খালি গায়েই থাকতেন। বিশিষ্ট কেউ এলে জামা পরতেন।

তাঁর রুচিজ্ঞান ছিল অত্যন্ত মার্জিত। হাল্কা রসিকতা সইতে পারতেন না। চাটুকারিতা বরাবরই অপছন্দ করতেন। ভদ্র ব্যবহার করতেন সকলের সঙ্গে কিন্তু তাই বলে কারও অভদ্রতা বা অন্যায় কোনোদিন সহ্য করতেন না।

রামেন্দ্রসুন্দরের মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। এমনিতে সাঁতার কাটতেন না কখনো। কিন্তু মায়ের নির্দেশে গাঁয়ের পুকুরে নেমে সাঁতার কেটেছেন। তাস খেলতেন না। কিন্তু মায়ের নির্দেশে বাজী রেখে তাস খেলেছেন। তাই বলে ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ গোঁড়ামিকে তিনি কোনোদিন প্রশ্রয় দেন নি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করবার পর তিনি ধর্মের কোনো সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতেন। কিন্তু যাঁরা ধর্মান্ধ, তাঁদের তিনি বিদ্রূপ করেন নি কখনও। ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরোধী মতবাদের মধ্য থেকে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে বের করে তিনি আনন্দ পেতেন। স্বধর্ম সব সময়েই তাঁর কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। কিন্তু তাই বলে পরধর্মকে তিনি কোনোদিন খাটো করার চেষ্টা করেন নি। তিনি ছিলেন চতুর্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদপন্থী সমাজের অনুরাগী। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন হিন্দু। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ত্যাগ, সংযম ও শিষ্টাচার ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যথার্থই লিখেছিলেন, "রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার।...প্রতীচ্য শিক্ষা রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রাচ্য ভাবে প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর, প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধক রামেন্দ্রসুন্দর, 'আহেলে বিলাতী' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া সেকালের বাঙ্গালার সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া থাকা সৌভাগ্য মনে করিতেন।" পারতপক্ষে কারও মনেই দুঃখ দিতে চাইতেন না তিনি। অপরের দুঃখ দেখলে সাধ্যমত তা' দূর করবার চেষ্টা করতেন। বহু ছাত্রকে গোপনে অর্থসাহায্য করতেন আচার্য ত্রিবেদী। কোনো সাহিত্য-সাধকের দুরবস্থা দেখলে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন তাঁকে সাহায্য করতে। মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন যখন চরম অর্থাভাবের মধ্য দিয়ে অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে সকলের আগে এগিয়ে আসেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র জানিয়েছেন,

> তিনি আমার সে সময়ের দুরবস্থা দেখিয়া দ্বারে দ্বারে আমার জন্য ভিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কী করিয়াছেন, তাহা আমাকে জানিতে দেন নাই।...আমি যে কয় বৎসর রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য ও জড়বৎ পড়িয়াছিলাম সে কয় বৎসর আমি তাঁহাকে ঘন ঘন আমার বাড়ীতে পাইয়াছি। আজ অমুক এত টাকা দিয়াছেন, কাল কোন্ সদয় ব্যক্তি আমার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, রামেন্দ্রবাবু প্রফুল্লমুখে আমাকে আসিয়া প্রায়ই এই সংবাদ দিতেন। তখন মনে-হইত, রামেন্দ্রবাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান আমাকে সহায়তা করিতেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, ছোটবড় নির্বিশেষে তাঁদের সকলেই তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ বরণীয় বাঙ্গালীরাও রামেন্দ্রসুন্দরকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে

দেখতেন। শুধু বাঙ্গালীর কথাই বা বলি কেন, সুদূর জাপান থেকে আগত পণ্ডিত ডাঃ কিমুরা[১] ও রামেন্দ্রসুন্দরের বিদ্যাবত্তা ও চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

রামেন্দ্র-চরিত্রের স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, পোষাকে-পরিচ্ছদে আলাপে-আচরণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিধানই ছিল তাঁর জীবন-সাধনার মূল লক্ষ্য। ভাষা হিসাবে বাংলার কোথাও বিন্দুমাত্র অমর্যাদা দেখলে তিনি নিদারুণ আঘাত পেতেন। তাই দেখি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবন্ধ পাঠ করবার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইংরেজীতে প্রবন্ধ পাঠ করতে রাজী হন নি তিনি। দু'বার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছিলেন, বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করবার অনুমতি পেলেই তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন। রামেন্দ্রসুন্দরেরই জয় হয়েছিল শেষ অবধি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ লিখবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা ছিল বলেই রামেন্দ্রসুন্দর এক-জন আদর্শ দেশপ্রেমিক।

সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলে মনে হয় সব দিক দিয়েই এক আদর্শ ও উন্নত চরিত্রের মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর। আদর্শ তাঁর চরিত্র, তাঁর জীবন-সাধনা, তাঁর সাহিত্য। সাহিত্যিক কল্যাণ-দৃষ্টির সঙ্গে চারিত্রিক শুদ্ধ-দৃষ্টির সম্মিলন ঘটেছে তাঁর মধ্যে।

১ ডাঃ কিমুরার প্রচেষ্টারই রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকটি গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল।

নির্দেশিকা

[রামেন্দ্রসুন্দরের বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম বিশেষ অক্ষরে নির্দেশিত]
